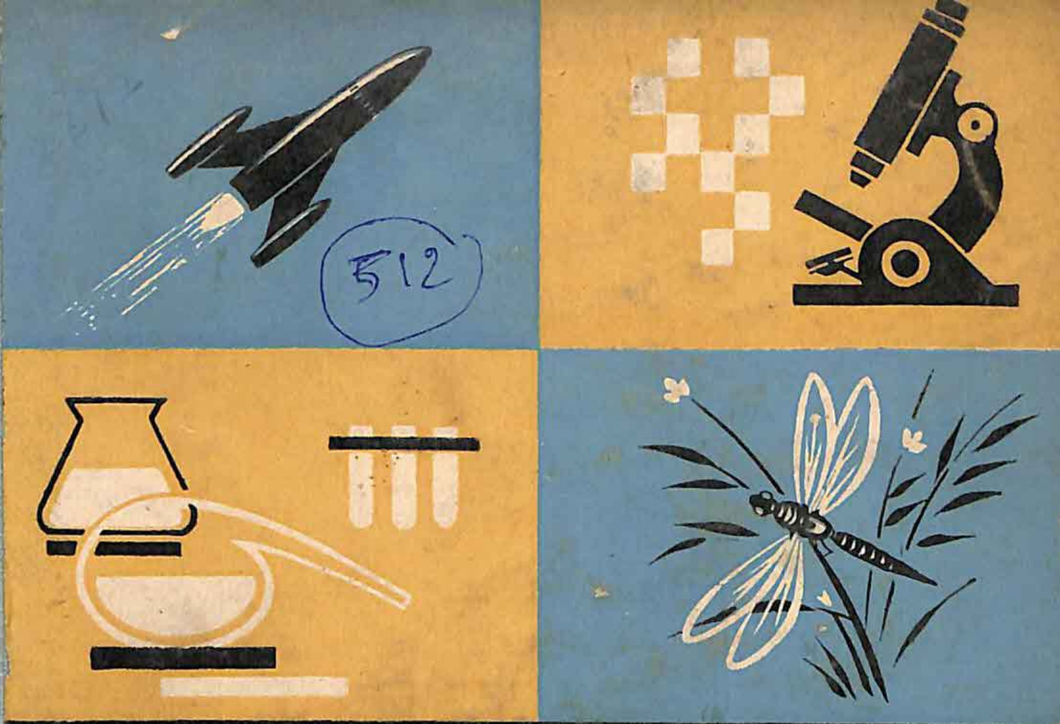
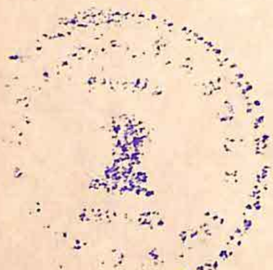


বিজ্ঞান চেতনা





বিজ্ঞান চেতনা ৩

সম্পাদক
কুঞ্জবিহারী পাল

পদার্থ বিজ্ঞানের কথা

কুঞ্জবিহারী পাল

●

রসায়নের কথা

কুঞ্জবিহারী পাল

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ

মহালয়া, ১৩৭২

সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

প্রকাশ করেছেন

অমিয়কুমার চক্রবর্তী

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির

৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ এঁকেছেন

গণেশ বসু

ছেপেছেন

দুলালচন্দ্র ভূঞা

শ্রীময়ী প্রিন্টার্স

২৪, তারক প্রামাণিক রোড

কলকাতা-৬

৪·০০

সৃষ্টির সেই আদিম যুগের অবস্থাটা ভাবলে আজও অবাক হতে হয়। তখন মানুষ ছিল, যাকে বলে একেবারেই অসহায়, সহায়সম্বলহীন। তার দেহে না ছিল কোন আচ্ছাদন, ক্ষুধা মেটাবার জন্যে হাতের কাছে না ছিল কোন খাদ্য, আর নিজেকে রক্ষার জন্যে না ছিল একটু নিরাপদ আশ্রয়।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, মানুষ যতই অসহায় হোক না কেন, প্রকৃতির ভয়াল ভীষণ ভ্রূকুটিতে সে ভয় পায় নি। প্রকৃতির সেই বুক-কাঁপানো অবস্থার মধ্যেও মানুষ নিজেকে টিকিয়ে রাখবার জন্যে চেষ্টা করেছে আপ্রাণ। প্রতিকূল পরিস্থিতির কাছে হার স্বীকার করেনি সে।

প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইয়ে মানুষের এই যে জয়, এ সম্ভব হয়েছিল মানুষের ধারালো বুদ্ধি, অন্তরের জ্ঞান আর আশ্চর্য সৃজন-প্রতিভার জন্যেই।

সুতরাং প্রকৃতি-মানুষের সংগ্রামে মানুষের হাতেই আজ জয়-পতাকা। এই জয়-পতাকা বড় সহজে আসেনি। পদে পদে বাধা, ক্ষণে ক্ষণে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষ তার বুদ্ধি বিবেচনা জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে, দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরো দেবে।

এমনিভাবেই মানুষ নিজে জেনেছে প্রকৃতির রহস্যের কথা, সেই জ্ঞান ছড়িয়ে দিয়েছে সকল মানুষের মধ্যে। বিজ্ঞানের নবজন্ম তো এইভাবেই সম্ভব হয়েছে।

বিজ্ঞানের জন্মলগ্নে প্রয়োজনের তাগিদ থাকলেও, মানুষ শুধু যে প্রয়োজনের দাস —এ কথা ভাবলে ভুল হবে। প্রয়োজনের সীমানা ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে সে এগিয়েছে অপ্রয়োজনের সীমাহীন উদার ক্ষেত্রে। জানার আনন্দে, জানার কৌতূহলে তার অভিযানের বিরাম নেই। তাই বিজ্ঞানের যাত্রা অশ্রান্ত, বিজ্ঞানীর সাধনা অতন্দ্র। নতুন নতুন আবিষ্কারে, নব-নব উদ্ভাবনে বিজ্ঞান-সাধকের দল আজও অনলস। আজও শ্রান্তিক্লান্তিহীন।

এবং সেই কারণেই জলে-স্থলে-নভোদেশে বিজ্ঞান আজ এঁকে দিয়েছে তার পদ-চিহ্ন। দূরকে সে করেছে নিকট, অদৃশ্যকে করেছে দৃশ্যমান। মানুষ আজ আর তাই অসহায় নয়, ভীত নয়। পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা মানুষের সৃষ্টিশীল প্রতিভার দীপ্তিমান উদাহরণ। এক কথায়, মানুষ এগিয়ে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরে, সৃষ্টি থেকে নতুন সৃষ্টিতে।

এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান তাই এ যুগে অপরিহার্য। স্কুলে বিজ্ঞান অবশ্য-পাঠ্য বিষয় হিসেবে আজ স্বীকৃত।

আজ ব্যক্তি এবং সমাজ-জীবনের পদে পদে বিজ্ঞানের এত বেশি প্রয়োগ রয়েছে যে, এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকার দরুন নিজেকে বড়ই অসহায় মনে হয়। যাঁরা বয়স্ক অথচ বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না তাদেরও যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জানা চলবে না এমন কোন কথা নেই। বরং আমরা মনে করি, বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলক জ্ঞান একান্তই আবশ্যিক ও সর্বজনীন হওয়া দরকার।

এ সব উদ্দেশ্য নিয়েই 'বিজ্ঞান চেতনা'র প্রকাশ। 'বিজ্ঞান চেতনা'র ভাষা যতটা সম্ভব সহজ এবং সরল করার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ একেই তো বিজ্ঞানের তথ্যগুলো কঠিন বলে সাধারণের ধারণা, তার উপরে যদি ভাষা হয় কঠিন এবং আলঙ্কারিক তবে এ বিষয়ে আকর্ষণের চেয়ে বিকর্ষণের সম্ভাবনাই বেশি। অনেক জায়গায় বোঝবার সুবিধের জন্যে ছবির প্রয়োজন হয়েছে; সে ব্যাপারেও কোন কার্পণ্য করা হয় নি।

পরিভাষা সম্বন্ধে এইটুকু আমাদের বক্তব্য যে, পুস্তকগুলিতে যেমন কষ্টকল্পিত বাংলা পরিভাষার উপর জোর দেওয়া হয়নি, তেমনি যে-সব বৈজ্ঞানিক শব্দের সহজ সুন্দর এবং সর্বজনস্বীকৃত বাংলা পরিভাষা চালু আছে তাও কোনক্রমে এড়িয়ে যাওয়া হয় নি।

এ পুস্তকগুলি সম্পাদনা করতে গিয়ে বহু সুযোগ্য ব্যক্তির নিকট থেকে নানাভাবে সহযোগিতা পেয়েছি। বিভিন্ন খণ্ডগুলি যাঁরা লিখেছেন তাঁরা সকলেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি। তাছাড়া লেখক হিসেবেও এঁদের পাঠক মহলে বিশেষ সুনাম আছে। এঁদের পূর্ণ সহযোগিতা না পেলে এ পুস্তকগুলির প্রকাশই সম্ভব হত না। এঁদের সকলকেই বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে 'বিজ্ঞান চেতনা'র বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করে লাভবান হয়েছি। তাঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ করে উৎসাহী তরুণ সাহিত্যিক পলাশ মিত্রের নাম উল্লেখ করছি।

পরিশেষে এই বলে শেষ করি যে, 'বিজ্ঞান চেতনা' গল্পের বইয়ের মতই পাঠককে আকর্ষণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই সিরিজ পাঠে যদি পাঠকের বিজ্ঞান চর্চার ভিত্তি সুদৃঢ় হয় ও বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ জাগে তবেই এ আয়োজন সার্থক।

'বিজ্ঞান চেতনা'র তৃতীয় খণ্ডের প্রথম অংশে 'পদার্থ-বিজ্ঞানের কথা' এবং দ্বিতীয় অংশে 'রসায়নের কথা' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অংশ দুটি লিখেছেন কুঞ্জবিহারী পাল, বি. এস্- সি, এ. আই. সি.।

আধুনিক বিজ্ঞানের দুটি প্রধান শাখাই হল পদার্থ-বিজ্ঞান এবং রসায়ন বিজ্ঞান। এ দুনিয়ায় আমরা যা কিছু দেখি বা ইন্দ্রিয়-সাহায্যে অনুভব করি তা হয় পদার্থ, নয় শক্তি। শক্তি আর পদার্থ নিয়েই মানুষের কাজ-কারবার। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, বর্তমান কালে বিজ্ঞানের যত বিভাগ গড়ে উঠেছে তার প্রতিটি শাখাকেই শক্তি বা পদার্থেরই অন্তর্ভুক্ত করা চলে। শক্তি ও পদার্থ নিয়ে দুটি বিজ্ঞানের আলাদা শাখা গড়ে উঠলেও এদের কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে ভাবতে পারা যায় না, কারণ পদার্থকে আশ্রয় করেই হয় শক্তির প্রকাশ। কাজেই শক্তি ও পদার্থের মধ্যে রয়েছে এক গভীর সম্পর্ক।

শক্তি, তার বিভিন্ন রূপ, তার প্রকাশ, এক শক্তি থেকে অন্য শক্তিতে রূপান্তর ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় যে শাখাটিতে তাকেই আমরা বলি পদার্থ-বিজ্ঞান বা পদার্থবিদ্যা। আর বিভিন্ন ধরনের পদার্থ, এক পদার্থের সঙ্গে অন্য-পদার্থের সম্পর্ক, তাদের গঠনবিধি, তাদের ভিতরে নানা ধরনের মিলন ইত্যাদি নিয়ে যে শাখাটি, তার নাম রসায়ন বিজ্ঞান। অবশ্য আধুনিক কালে এ দুটি শাখার মধ্যে চুলচেরা বিভাগ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। পদার্থ-বিজ্ঞান এবং রসায়ন বিজ্ঞানকে তাই আমরা একই খণ্ডে আলোচনা করেছি। এ দুটি শাখার মূল তত্ত্বগুলিই আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান খণ্ডটিতে।

পদার্থ-বিজ্ঞান এবং রসায়ন বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক শিল্প। এ-সব শিল্প আমাদের সুখ সুবিধে বাড়িয়ে দিয়েছে নানাভাবে। বিজ্ঞান চেতনার চতুর্থ খণ্ডে আমরা 'শিল্প ও বিজ্ঞান' নিয়েই আলোচনা করব।

মহালয়া ১৩৭২
কলকাতা

কুঞ্জবিহারী পাল

এই সিরিজে

প্রথম খণ্ড : আকাশের কথা
পৃথিবীর কথা

দ্বিতীয় খণ্ড : গাছপালার কথা
জীবজন্তুর কথা

তৃতীয় খণ্ড : পদার্থ-বিজ্ঞানের কথা
রসায়নের কথা

চতুর্থ খণ্ড : শিল্প ও বিজ্ঞান

পঞ্চম খণ্ড : মানবদেহের কথা
রোগজয়ের কথা

ষষ্ঠ খণ্ড : মানুষের কথা
মানব-সভ্যতার কথা

সূচীপত্র

পদার্থ-বিজ্ঞানের কথা

রসায়নের কথা

পদার্থবিজ্ঞানের কথা

কুঞ্জবিহারী পাল

পদার্থ আর শক্তি

আমাদের পাড়ার রামবাবু একখানা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মোটর গাড়ি কিনেছেন। গাড়িখানা দেখতে ভালই, একেবারে একখানা নতুন গাড়ির মতই। তাছাড়া সম্প্রতি গাড়িখানা রঙ করা হয়েছে। গাড়ি দেখে রামবাবু তো মহা খুশি। তিনি বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন গাড়িখানা। গাড়িখানার শরীরটা স্টীলের তৈরি, সিলিণ্ডারগুলো লোহার। পিস্টনগুলো অ্যালুমিনিয়ামের, কোন অংশে তৈরি করা হয়েছে প্ল্যাস্টিক দিয়ে, টায়ারগুলো হল রবারের। এর উপর আবার তারগুলো তামার। না, বেশ মজবুত গাড়িখানা, ভাবেন রামবাবু। কিন্তু গাড়িখানা যদি না চলে, তবে লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, রবার আর প্ল্যাস্টিকের ঐ জগাখিচুড়ি কোন কাজ উদ্ধার করতে পারে কি ? নিশ্চয়ই নয়।

তোমরাও আশা করি আমাদের সঙ্গে একমত। মোটরগাড়ি যদি না চলে, অকেজো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যদি তা এক জায়গায়, তবে সে গাড়ি দিয়ে আমাদের কোন উপকারই হবে না। অথচ দেখ, গাড়িখানার বিভিন্ন অংশ কত দামি দামি আর প্রয়োজনীয় পদার্থ দিয়ে বানানো হয়েছে। তুমি সোজা কথায় বলতে পার, শুধু নানা পদার্থ দিয়ে তৈরি হলেই চলবে না, গাড়িখানাকে চলতে হবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। তবেই না গাড়ি রাখার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে !

বিজ্ঞানী বললেন, হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই। গাড়িখানা যখন চলে তখন সেখানা কাজ করবার ক্ষমতা পায়। কিছুটা দূরত্বের মধ্যে একটা বল প্রয়োগ করলেই সে কাজ করে।

একটা হাতুড়ির কথাই ধরা যাক না। টেবিলের উপর একটা হাতুড়ি পড়ে আছে বেশ কয়েকদিন ধরে। তার কি কোন কাজ করবার ক্ষমতা আছে ? নিশ্চয়ই নেই। দেয়ালে একটা পেরেক

পোতা দরকার। হাতুড়িটা তুলে হাতে নিয়ে ঠুকে ঠুকে অনায়াসে পেরেকটা পোতা চলতে পারে। এখানেও আমরা বলতে পারি যে, হাতুড়িটা কাজ করছে। কাজ করবার ক্ষমতা পেল সে কোত্থেকে? পেয়েছে আমার বা তোমার শরীরের জোর থেকে। সোজা কথায়, তোমার শরীরের বলই হাতুড়িটাকে চালাতে সাহায্য করেছে।

তাহলে আমরা বলতে পারি, আমাদের শুধু নানা রকমের পদার্থ দিয়েই কাজ চলে না। নানা রকমের জিনিস-পত্তরের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আরও একটি ব্যাপারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তা হল বল বা শক্তি। এখানে বল বা শক্তি কথাদুটি ব্যবহার করা হল বটে, কিন্তু এ দুটি কথা আলাদা। কিন্তু সে সব কথায় আমরা পরে আসছি।

আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে হাজারো রকমের জিনিস। ইট, কাঠ, পাথর, টেবিল, চেয়ার, গাছপালা, মাটি, আরও কত কি। এত সব জিনিস নিয়েই আমাদের কারবার। সবার উপরে রয়েছে অবশ্য মানুষ। বিজ্ঞানীরা কিন্তু একটিমাত্র কথা দিয়ে এত সব জিনিসকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কথাটি হল বস্তু, ইংরেজিতে বলে ম্যাটার। বস্তু প্রাণবস্তুও হতে পারে, আবার প্রাণহীন অচেতন পদার্থ হতেও পারে। ইট, কাঠ, পাথর, টেবিল, চেয়ার —এরা প্রাণহীন জড় পদার্থ; আর গাছপালা, জীবজন্তু এরা সচেতন অর্থাৎ এদের চেতনা আছে। আমরা বলতে পারি, বস্তুমাত্রই খানিকটা জায়গা জুড়ে থাকে, আর বস্তুর ওজন আছে। বস্তুর এ দুটিই প্রধান গুণ।

নানা রকম বস্তু ছাড়াও আমাদের আরও কয়েকটি ব্যাপারের সঙ্গে কিন্তু হামেশাই সাক্ষাৎ মেলে। আমি আলো, উত্তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতির কথাই বলছি। আলো বা উত্তাপকে আমরা নিশ্চয়ই বস্তু বলতে পারি না। কারণ কী? না, আলোর তো ওজন নেই, তাছাড়া আলো বা উত্তাপ খানিকটা জায়গা জুড়েও

থাকে না। ইলেকট্রিক বা বিজলি বাতির সুইচ টিপলেই ঘরখানা আলোয় ভরে যায়। সুইচ বন্ধ করে দাও, সমস্ত ঘরখানা ঘুট-ঘুটে অন্ধকার। কাজেই আলো বা উত্তাপকে বস্তু বলি কোন্ হিসেবে? বিজ্ঞানীরা কিন্তু এদের বোঝাবার জন্যেও একটিমাত্র কথা ঠিক করেছেন। কথাটি শক্তি, ইংরেজি করে বললে বলতে হয় এনার্জি। আলোই বল, উত্তাপই বল, এরা সকলেই হল ঐ শক্তি। তবে, আলো-শক্তি, বিদ্যুৎ-শক্তি, উত্তাপ-শক্তি—এসব বলতে অবশ্য বাধা নেই।

আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়—চোখ, কান, নাক, জিভ আর ত্বক। চোখ দিয়ে আমরা দেখি, কান দিয়ে শুনি, নাক দিয়ে কোন কিছুর গন্ধ টের পাই, জিভ দিয়ে কোন কিছুর আস্বাদ গ্রহণ করি, আর ত্বক দিয়ে আমাদের স্পর্শানুভূতি জাগে। আমাদের চারদিকের যেসব জিনিসের কথা বলেছি তার সবই আমরা বুঝতে পারি আমাদের এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। আলো আর অন্ধকারের পার্থক্য আমরা বুঝি আমাদের চোখ দিয়ে, উত্তাপটা চোখে না দেখলেও অনুভব করতে পারা যায়, শব্দ দেখিও না অনুভবও করি না, শব্দ শুনি আমরা কান দিয়ে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বস্তুই বল, আর শক্তিই বল, আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় অচল হলে সবই অচল হয়ে যাবে।

এবারে আমরা বলতে পারি, প্রকৃতির দিকে দিকে যা কিছু আমরা দেখছি বা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করছি সবই ঐ বস্তু বা শক্তির বিভিন্ন রূপ মাত্র। মানুষের দুনিয়া এসব নিয়েই। এ দুনিয়াকে ভালভাবে বোঝবার জন্যে, সব কিছু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে মানুষের সুখ সুবিধে বাড়াবার জন্যেই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের আসল উদ্দেশ্য এখানেই।

আবার আমাদের পুরোনো কথায় একটু ফিরে আসা যাক। বস্তু আর শক্তি কিন্তু একে ছাড়া অন্যে তেমন কাজে লাগে না। তেমনই বা বলি কী করে। বস্তু ছাড়া শক্তির কোন প্রকাশই নেই

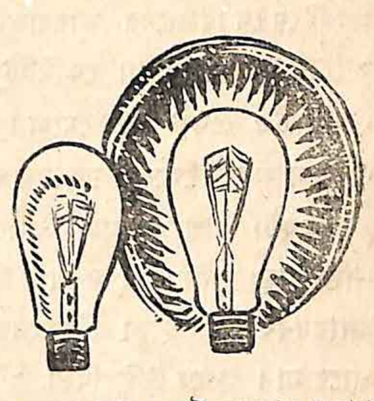
যে। রামবাবুর সেই গাড়িখানার কথাই ধরা যাক। গাড়িখানা নানা বস্তু দিয়ে তৈরি। কিন্তু রামবাবুর কোন কাজে লেগেছিল কি সেখানা? হ্যাঁ, কাজে লাগত যদি সেখানা স্টার্ট নিত—বাড়ি থেকে রামবাবুকে তাঁর আফিসে পৌঁছে দিতে পারত। বিজ্ঞানের ভাষায়, যদি গাড়িখানার কাজ করবার ক্ষমতা থাকত। বিজ্ঞানীরা আবার কাজ করার ক্ষমতাকে শক্তি বলেছেন। কাজেই পেট্রোল বা ডিজেল তেল দিয়ে যদি গাড়িখানার উপর কিছু বল প্রয়োগ করা যেত তবেই গাড়িখানা চলত। আমরা তখন অনায়াসেই বলতে পারতাম, গাড়িখানার কাজ করবার ক্ষমতা বা শক্তি আছে। কিন্তু রামবাবুর কপাল মন্দ। তাঁর গাড়িখানার যে কাজ করবার ক্ষমতা আছে তা আমরা বলতে পারি না।

পেট্রোল থেকেই তাহলে মোটর গাড়ি শক্তি পায়। বেশ, ভাল কথা। একটা টিনে খানিকটা পেট্রোল ভরে রেখে দাও। দেখ সে চলে কি না। তোমরা হাসছ, ভাবছ, এ আবার কোন্ গাঁজাখুরি কথা রে বাবা?

পেট্রোলের মধ্যে শক্তি আছে লুকিয়ে। রামবাবুর গাড়িখানা পেট্রোল দিয়েই চালানো যেতে পারে। তাহলে অসম্ভব কথাটা কোথায় বলা হল? তোমরা বলবে, পেট্রোলের মধ্যে কাজ করবার ক্ষমতা আছে ঠিকই, কিন্তু সে কাজ পেতে হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা করার দরকার। অর্থাৎ উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে পেট্রোল থেকে সে শক্তি বের করে নিয়ে তবেই না গাড়িখানা চালানো যাবে। রামবাবুর গাড়ির এঞ্জিনখানা ঠিক ঐ কাজের উপযুক্ত করেই তৈরি করা হয়েছিল।

তবেই দেখা যাচ্ছে যে, পদার্থকে আশ্রয় করেই শক্তির প্রকাশ। শক্তি যেমন আপনা-আপনি প্রকাশ পায় না, তেমনি আবার শুধু কিছু বস্তুর সমাবেশও বিজ্ঞানের ভাষায় আমাদের কোন কাজে লাগে না। বিজলি বাতিটার কথাই ধর না। কাচের তৈরি বাল্‌ব্‌টার ভিতরে রয়েছে ধাতুর সরু সরু তার। কোন কাজে লাগছে কি? না। কিন্তু সুইচ টিপে দিলে তড়িৎ বা

ইলেকট্রিসিটির প্রবাহ চলবে ঐ সরু তারের ভিতর দিয়ে। তারটা খুব গরম হবে। তারপর তা থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসবে আলো। সমস্ত ঘরখানা ভরে যাবে সে আলোর প্রবাহে। বিদ্যুৎ থেকে আলোর প্রকাশের জন্যেই এত সব ব্যবস্থা। বলতে পারি, বাল্‌ব্‌ নামক বস্তুটিকে আশ্রয় করেই আলো-শক্তির প্রকাশ ঘটেছে আমাদের কাছে।



বাব্‌ল্‌কে আশ্রয় করেই আলোর প্রকাশ

বস্তু আর শক্তি—এ নিয়েই বিজ্ঞানের দুটি প্রধান শাখা গড়ে উঠেছে। শক্তি এবং শক্তির বিভিন্ন রূপ নিয়ে যে বিজ্ঞান তাকে আমরা অনায়াসে 'শক্তি-বিজ্ঞান' বা 'এনার্জি সায়েন্স' বলতে পারি। এরই নাম ফিজিক্‌স্‌। অবশ্য এর বাংলা করা হয়েছে পদার্থ-বিজ্ঞান। নামকরণটা কতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে সে সব প্রশ্ন তোলা আমাদের ব্যাপার নয়। দীর্ঘদিন ধরেই এ নাম চলে আসছে। শক্তি-বিজ্ঞান বা ফিজিক্‌স্‌ বা পদার্থ-বিজ্ঞানের কারবার শক্তি এবং শক্তির নানা ব্যাপার স্যাপার নিয়ে। পদার্থ-বিজ্ঞানের আবার অনেক উপবিভাগ আছে। যেমন, বল-বিদ্যা, তাপ-বিদ্যা, আলো-বিজ্ঞান, শব্দ-বিজ্ঞান, তড়িৎ-বিজ্ঞান—আরও কত কি।



পদার্থ বিদ্যার একটি পরীক্ষাগার

বস্তু এবং বস্তুর গঠন, এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে রূপান্তর —এ সব নিয়ে যে বিজ্ঞানের কারবার তাকে আমরা বলি বস্তু-বিজ্ঞান বা ম্যাটার সায়েন্স বা কেমিস্ট্রি। বাংলায় বলি রসায়ন-বিজ্ঞান। এ নামটিও একটু গোলমেলে। পারা বা পারদের এক নাম রস। এই রস কথাটি থেকেই রসায়ন কথাটি চালু হয়েছে।

একটা প্রশ্ন তোমরা এখানে অবশ্যই করতে পার। বস্তু এবং শক্তি ছাড়া দুনিয়ায় যখন আর কিছু নেই, তখন পদার্থ-বিজ্ঞান এবং রসায়ন-বিজ্ঞান ছাড়া বিজ্ঞানের অন্য কোন বিভাগ তো থাকতে পারে না। তবে উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা—এসব এল কোত্থেকে ?

কথাটা ঠিকই। কিন্তু আমরা এর উত্তর দেব এভাবে। বিজ্ঞানের এমন কোন শাখাই নেই যেখানে বস্তু এবং শক্তি ছাড়া অন্য কিছু সম্বন্ধে বলা হয়েছে। জ্যোতির্বিদ্যা বা আকাশের তারা নক্ষত্রের সম্বন্ধে যে বিজ্ঞান তার কথাই ধর না। আকাশের তারা নক্ষত্রের মধ্যে কী সব বস্তু আছে, মহাশূন্যে চলবার সময় তাদের ভিতরে কী পরিমাণ শক্তির প্রকাশ পায়—এ সব নিয়েই জ্যোতির্বিদ্যা। জীববিদ্যা বা উদ্ভিদবিদ্যার চর্চা করা হয় সচেতন পদার্থ নিয়ে। কাজেই যে কোন বিজ্ঞানের কথাই বল না কেন সে ঘুরে ফিরে ঐ বস্তু আর শক্তিরই অংশবিশেষ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমরা এবারে শক্তি এবং তার নানারূপ প্রকাশ নিয়েই আলোচনা করব।

কাজ করা

বল-প্রয়োগ করে কোন একটা জিনিসকে খানিকটা সরিয়ে দিতে পারলে তাকেই কাজ করা বলে। ঘরের ঐ আলমারিটার কথাই ধরা যাক। দেয়ালের ধারে আলমারিটা রয়েছে অনেকদিন ধরে। এবারে তুমি ওটাকে অনায়াসে ঠেলে সরিয়ে দিতে পার, এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়ালের ধারে নিয়ে যেতে পার। বিজ্ঞানের ভাষায়

আমরা বলব, তুমি বল-প্রয়োগ করে আলমারিটাকে খানিকটা দূরত্বে সরিয়ে দিয়েছ। দুটো ব্যাপার এখানে লক্ষ্য করবার। বল-প্রয়োগ আর দূরত্ব। এক কথায় আমরা বলতে পারি, আলমারিটা খানিকটা কাজ করেছে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে তাহলে, বল-প্রয়োগের ফলে কোন জিনিস যদি সরে যায় তবেই সে কাজ করে। রামবাবুর সেই গাড়িখানার কথাই ধরা যাক। যতক্ষণ গাড়ি চলল না ততক্ষণ গাড়ি কাজ করে নি ; যদি কখনো সে চলে তবে আমরা বলব সে কাজ করছে। একটা হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠোকা হচ্ছে, খোকার



ছোট্ট বলটা সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নেমে আসছে, রমেন টেনিস খেলছে, বাদলবাবু বেহালা বাজাচ্ছেন, তুমি গুলতি ছুঁড়ছ—এ সব ক্ষেত্রেই আমরা বলতে পারি এরা কাজ করছে। একটা ফড়িং লাফিয়ে চলে গেল, পুকুরে মাছ সাঁতার কাটছে—এ সব ? হ্যাঁ, এসবও ঐ কাজ করারই উদাহরণ।

কাজ করার ক্ষমতাই শক্তি

কাজ করার ক্ষমতাকে বিজ্ঞানীরা বলেন শক্তি বা এনার্জি। পাড়ার সুরেশদাকে চেন তো। বিকেলে আপিস থেকেই সুরেশদা ছোটেন টিউশনি করতে। সেখান থেকে ফিরবার পথে বাজারটা

সেরেই আসেন। সকালেও সময় কোথায়? ছেলে পড়ানো আছে যে! বাড়ি এসেই আবার বড় মেয়েকে নিয়ে পড়াতে বসে যান। মেয়ে এবার প্রাইভেটে বি. এ. পরীক্ষা দেবে। কোন-কোন দিন আবার সুরেশদাকে দেখা যাবে পাড়ায় ব্যাডমিণ্টন খেলতে। আমরা তো বলি সুরেশদার এনার্জি অফুরন্ত। বিজ্ঞানী বলবেন, সুরেশবাবুর কাজ করার ক্ষমতা অফুরন্ত।

শক্তি আবার প্রধানত দু-রকম হতে পারে—গতিশক্তি আর স্থিতিশক্তি। একটা বন্দুকের গুলি অমনি-অমনি কোন ক্ষতি করতে পারে কি? না। কিন্তু একটা বন্দুকে পুরে ওটাকে ছুঁড়ে দাও, শোঁ-শোঁ করে ছুটে চলবে সে গুলিটি। তখন তার তেজ দেখে কে! তোমার জানলার কাঁচ ফুটো করে, আলমারির কাঁচ ভেঙে একাকার কাণ্ড করে তবে ছাড়বে। এহেন অপকাজ করবার ক্ষমতা সে পেল কোত্থেকে? ঐ যে তুমি বন্দুকে ভরে ছুঁড়ে দিয়েছিলে, সেজন্যে সে একটা গতি পেয়েছে। গতির জন্যেই গুলিটার ভিতরে একটা কাজ করবার ক্ষমতা বা এনার্জি সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এ-জাতীয় শক্তিকেই গতিশক্তি বলতে পারি। ইংরেজিতে বলে কাইনেটিক এনার্জি। কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'কেনিন' থেকে। কেনিন কথাটির মানে হল 'চলা'। গরু বা মোষ লাঙল টেনে জমি চাষ করছে, বায়ুর ভিতর দিয়ে একটা বোমা নেমে আসছে মাটির বুকে, পাহাড়ের গা বেয়ে একটা পাথরের চাঁই নেমে আসছে—এ সবই হল গতিশক্তির উদাহরণ।

ছাদের ধারে একখানা ইট পড়ে আছে বেশ কিছুদিন ধরে। কোন কাজ করবার ক্ষমতা নেই। ভিজে বেড়ালটি আর কি! কিন্তু যদি ওখানা কোনক্রমে ছাদ থেকে পড়ে যায় তবে কত অনর্থেরই না মূল হতে পারে ওখানা! তোমার মাথা ফাটিয়ে তোমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে পারে (ভগবান করুন সেরকমটি যেন কোনকালেই না হয়), আরও কত ক্ষতিই না করতে পারে ঐ

ইটখানা! এত ক্ষমতার অধিকারী হল ওখানা কী করে? বিজ্ঞানী বলবেন, স্থিতিশক্তির জন্যে। ইটখানা ছিল মাটিতে। কেউ না কেউ ওখানাকে ছাদের উপর তুলে দিয়েছে। নিজের স্বাভাবিক অবস্থান থেকে কোন উচ্চতর অবস্থানে নেওয়ার জন্যে ঐ ইটখানার মধ্যে একটা কাজ করবার ক্ষমতার সৃষ্টি হয়েছে। একেই বলা হয় স্থিতিশক্তি বা পোটেনশিয়াল এনার্জি।

পাইল ড্রাইভার দেখেছ কখনো? বড় বাড়ি তৈরি করবার আগে মাটির ভিতরে ঠুকে ঠুকে গভীর গর্ত করে সিমেণ্ট কনক্রীট এবং লোহার রড বসিয়ে জমিটাকে বিরাট বাড়িটার ভার বহন করবার উপযুক্ত করে নেওয়ার জন্যে যে যন্ত্রের সাহায্যে গর্ত করার কাজ করা হয় তাকে বলে পাইল ড্রাইভার। পাইল-ড্রাইভারের শক্তি আসলে স্থিতিশক্তিরই একটি ভাল উদাহরণ। ভারি একটা লোহার ডাণ্ডাকে টেনে খানিকটা উপরে তোলা হয়, তারপর সেটাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। নিচে নেমে এসে সেটা জোরে আঘাত লাগায় একটা খোঁটার উপর। এ আঘাতে খোঁটাটির খানিকটা মাটির মধ্যে ঢুকে যায়। বারে বারে এমনি আঘাত করে করেই খোঁটাটাকে পুরোপুরি মাটির ভিতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। লোহার ডাণ্ডাটা যখন উপরে তোলা হয়েছে তখন তার মধ্যে একটা স্থিতিশক্তির সৃষ্টি হয়েছে। যখন ওটা ছেড়ে দেওয়া হল তখন স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে বদলে যাবে। এ শক্তির জন্যেই খোঁটাটা খানিকটা মাটির মধ্যে ঢুকে যাবে।

ঘড়িতে দম দিতে হয়। তা না হলে ঘড়ি চলে না। ঘড়িতে যখন দম দেওয়া হচ্ছে তখন ব্যাপার কী ঘটছে দেখা যাক। দম দিলে ঘড়ির স্প্রিংটা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় এসে যায়; ফলে তার মধ্যে একটা স্থিতিশক্তি জমা পড়ে। এই স্থিতিশক্তিই ঘড়িটাকে চালায়।

শক্তির রূপান্তর

ছাদের উপরকার ইটখানার কথায়ই আর একবার ফিরে আসা যাক। ইটখানা যখন ছাদের উপর ছিল তখন তার মধ্যে ছিল স্থিতিশক্তি। নেমে আসতে আসতে স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে বদলে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল ইটখানা। এখানে একটা প্রশ্ন তোমরা করতে পার। ইটখানার ভিতরকার গতিশক্তিই বল বা স্থিতিশক্তিই বল তা গেল কোথায়? মাটিতে পড়ে বা কারুর মাথা ফাটিয়েই কি শক্তির কাজ শেষ হয়ে গেল? ভাববার মত কথা নিশ্চয়ই।

ধরা যাক, ইটখানা মাটিতে পড়ে কারুর মাথা ফাটায় নি। স্রেফ দুম করে মাটিতেই পড়েছে। আর কোন কাজ করে নি। ইটখানার মধ্যে প্রথমে ছিল স্থিতিশক্তি। পড়বার সময় ইটখানার মধ্যে গতিশক্তির সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে বলা ঠিক হচ্ছে না। ভিতরকার স্থিতিশক্তিই গতিশক্তিতে বদলে গেছে মাত্র। যখন ইটখানা মাটিতে পড়ল তখন একটা শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। তার উপর মাটিতে যেখানটায় ইটখানা আঘাত করেছে সেখানে খানিকটা তাপেরও সৃষ্টি হয়েছে। শব্দই বল, তাপই বল, এরাও শক্তি—এদেরও আছে কাজ করবার ক্ষমতা। কাজেই ইটখানার গতিশক্তি তাপশক্তি এবং শব্দশক্তিতে বদলে গেছে বা রূপান্তরিত হয়েছে—একথা আমরা অনায়াসেই বলতে পারি। হাতে হাত ঘসে দেখ, দেখবে বেশ উষ্ণ হয়ে উঠেছে হাত। এখানে তোমার শরীরের শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে বলা চলে।

নানা ধরনের শক্তি

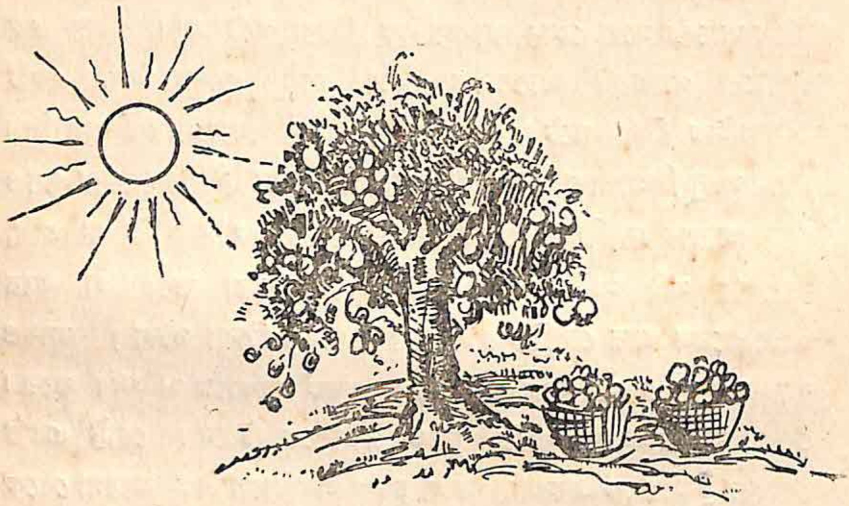
তাপও একরকম শক্তি, একথা বললাম। কিন্তু কেন? তাপ দাও জলে, জল বাষ্পে পরিণত হবে। বাষ্পের শক্তি দিয়ে ষ্টীম এঞ্জিন চলে—বিরাট রেলগাড়িখানাকে টেনে নিয়ে যায় স্টীম এঞ্জিন। কিন্তু স্টীম এত শক্তি পেল এই তাপ থেকেই তো। কাজেই তাপেরও

আছে কাজ করবার ক্ষমতা। শব্দেরও তাই। খুব জোর শব্দ হলে কানে তালা লাগে, বাড়ির দরজা জানলা কাঁপতে থাকে। শব্দের মধ্যে যদি কাজ করবার ক্ষমতা না থাকবে তবে এটি কী করে সম্ভব হচ্ছে! ঠিক এমনিভাবে আমরা বলতে পারি, আলো, চুম্বক, বিদ্যুৎ এরাও শক্তি—গতিশক্তি বা স্থিতিশক্তির বিভিন্ন রূপ মাত্র। হাইড্রোজেন একটি গ্যাস, ক্লোরিন একটি রঙিন গ্যাস। খানিকটা হাইড্রোজেনের সঙ্গে সমপরিমাণ ক্লোরিন মিশিয়ে অন্ধকারে রেখে দিলে তাদের মধ্যে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে না। কিন্তু এই মেশানো গ্যাসদুটি আলোতে নিয়ে এলেই ওদের মধ্যে একটি রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে। আমরা পাই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নামে সম্পূর্ণ আলাদা একটি জিনিস, যার মধ্যে হাইড্রোজেনের গুণও নেই, আবার ক্লোরিনের গুণও নেই। আলো যদি শক্তি না হবে, আলোর যদি না থাকবে কাজ করার ক্ষমতা তবে কী করে হাইড্রোজেন আর ক্লোরিনের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটল? আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যায় এ সম্বন্ধে। চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। সোজা কথায় বলতে পারি চুম্বক লোহাকে টানে। ছোট্ট একটি লোহার টুকরোকে একখানা ভাল চুম্বক অনায়াসে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দিতে পারবে। কাজেই আমরা বলতে পারি, চুম্বকও একপ্রকার শক্তি—এরও আছে কাজ করবার ক্ষমতা।

বিজলি বাতির সুইচ টিপলে আলো জ্বলে। জলের সঙ্গে সামান্য একটু সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে তার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালালে জল রাসায়নিক উপায়ে ভেঙে যায়। আমরা পাই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামে দুটি গ্যাস। এ থেকে আমরা অনায়াসে বলতে পারি, বিদ্যুৎও একপ্রকার শক্তি। জলকে ভেঙে সে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে পরিণত করে দিয়েছে।

সূর্যই সব শক্তির মূল

তবে, যতরকম শক্তি আছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বিকিরণ-শক্তি। ইংরেজি করে বললে বলা যায় 'র‍্যাডিয়্যাণ্ট এনার্জি।' এ শক্তির প্রধান উৎস হল সূর্য। সূর্যের শক্তিকে আমরা সৌরশক্তি বা সোলার এনার্জি বলতে পারি। সৌরশক্তির খুব সামান্য একটুখানি আমরা, মানে এই পৃথিবীর অধিবাসীরা পেয়ে থাকি। কিন্তু যে অতি



সামান্য অংশটুকু আমরা পাই তার পরিমাণ শুনলেও তোমরা অবাক হবে সন্দেহ নেই। পৃথিবীর উপর সূর্য থেকে আলো ও উত্তাপ রূপে আমরা যে শক্তি পাই তা যদি এক জায়গায় জমা করা যায় তবে তা দিয়ে কয়েকশো টন জল মুহূর্তমধ্যে বাষ্পে পরিণত করে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

যে যাই হোক, সূর্যের এই শক্তি আমাদের পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রেখেছে, ফলে ফুলে সাজিয়ে রেখেছে পৃথিবীর বুক। সূর্যের আলোর সাহায্য নিয়েই গাছপালারা তাদের খাদ্য তৈরি করে নেয়। বিজ্ঞানীরা বলেন, ফোটো-সিনথেসিস। প্রাণীজগৎ বেঁচে আছে গাছপালার সাহায্যে। কাজেই সূর্য বিনা প্রাণীই বল আর গাছপালাই বল, কারুরই বাঁচবার উপায় ছিল না।

সূর্য থেকে আমরা উত্তাপ পাই। উত্তাপও একপ্রকার বি-কিরণ শক্তি, সৌরশক্তিরই একটি অংশ। তাপশক্তির সাহায্য নিয়েই নদী ও সমুদ্রের জল বাষ্পে পরিণত হয়, উঠে যায় আকাশে, তৈরি হয় মেঘ, মেঘ থেকে তা আবার নেমে আসে পৃথিবীর বুকে বৃষ্টির আকারে। পৃথিবীর প্রাণী এবং উদ্ভিদ জগৎকে প্রয়োজনীয় জলীয় বাষ্প সরবরাহ করে।

নানারকম বস্তু বা পদার্থের কথা আগেই বলেছি। পদার্থের মধ্যে নানারূপ পরিবর্তন, পদার্থের গঠন, এসব নিয়েই রাসায়নিকের কারবার। পদার্থের মধ্যে যখন কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তখন তা থেকে পাওয়া যায় আলো, উত্তাপ এবং আরও নানা ধরনের শক্তি। কাজেই আমরা বলতে পারি, রাসায়নিক ক্রিয়ায়ও শক্তির সৃষ্টি হয়। এ জাতীয় শক্তিকে বলা হয় রাসায়নিক শক্তি বা কেমিক্যাল এনার্জি।

কয়লা পুড়িয়ে তাপ পাওয়া যায়, পাওয়া যায় আলো। এ তাপ দিয়ে জলকে বাষ্পে পরিণত করে আমরা স্টীম এঞ্জিন চালাতে পারি। দেখা যাচ্ছে, কয়লার ভিতরে লুকিয়ে রয়েছে শক্তি; কিন্তু কয়লার ভিতরে এ শক্তি এল কোত্থেকে? অতি প্রাচীন কালের বিরাট বিরাট গাছ কালক্রমে চাপা পড়ে মাটির নিচে, তারপর লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে চলতে থাকে নানা ধরনের পরিবর্তন। তারপর একসময় এসব গাছই কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে। আজকের মত সেকালের গাছও বেড়ে উঠত এবং বেঁচে থাকত সূর্যের আলো আর উত্তাপের সাহায্য নিয়ে। তাই যদি হয় তবে দেখা যাচ্ছে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সূর্যই হল কয়লার ভিতরকার শক্তির মূলে। শুধু কয়লা কেন, যেকোন শক্তির প্রকাশ আমরা দেখছি তার সবই হল ঐ সূর্য থেকে। সৌরশক্তিই হল এক কথায় সকল শক্তির আধার। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা সূর্যের এহেন ক্ষমতার কথা জানতেন। তাই তাঁরা নানাভাবে সূর্যের স্তবস্তুতি করে গেছেন।

শক্তির বিনাশ নেই

এখানে তাহলে আমরা দুটি মূল কথার সন্ধান পাচ্ছি—এক, শক্তির বিনাশ নেই। যা বিনাশ বলে মনে হচ্ছে আমাদের কাছে তা এক শক্তি থেকে অন্য শক্তিতে রূপান্তর মাত্র। দুই, সূর্যই হল পৃথিবীর সর্বপ্রকার শক্তির আধার।

পরমাণুর শক্তি

শক্তির বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে বলা হল। কিন্তু সম্প্রতিকালে আর একরকম শক্তির সন্ধান আমরা পেয়েছি। আমি পারমাণবিক শক্তির কথাই বলছি। যেকোন পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশের নাম অণু। ইংরেজিতে বলে মলিকিউল। মলিকিউল বা অণু আবার গঠিত হয়েছে পরমাণু বা অ্যাটম দিয়ে। পরমাণুর গঠন বিচার করলে দেখা যায় যে, এর মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। পরমাণুর কেন্দ্রের অংশটির নাম নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীন। এসব কথা আমরা যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে বলব। এখানে তোমাদের একটি কথা বলতে চাই। তা হচ্ছে যে, কেন্দ্রীনে রয়েছে প্রচুর শক্তির উৎস। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, যখন পরমাণুর কেন্দ্রীন কোন বিশেষ উপায়ে ভেঙে যায় তখন সেখান থেকে বেরিয়ে আসে অসীম শক্তি। তাছাড়া বিভিন্ন জাতের কেন্দ্রীনে কেন্দ্রীনে মিলন ঘটালেও উপরি পাওয়া যায় শক্তি। পরমাণু ভেঙে যে শক্তি মেলে তা থেকে বানানো হয়েছে অ্যাটম বোমা। অ্যাটম বোমার ধ্বংস-ক্ষমতার কথা তোমাদের অজানা নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটানোর মূলে ছিল দুটি মাত্র অ্যাটম বোমা। আজকাল অবশ্য এ-জাতীয় শক্তি নানারকম মানবহিতকর কাজে লাগানো হচ্ছে।

বল বা ফোর্স

বল আর কাজ করার মধ্যে একান্ত ঘনিষ্ঠতা আছে সেকথা তোমাদের আগেই বলেছি। বলপ্রয়োগ করেই কাজ পাওয়া যায়।

ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, শক্তির প্রকাশ ঘটলেই বল বা ফোর্স এসে হাজির হয়।

এই যে বলপ্রয়োগের কথা বলা হল তা করা যায় দু-রকমভাবে। কোন জিনিসের উপর বলপ্রয়োগ করতে হলে তা আমরা সরাসরিও করতে পারি। দেয়ালের কাছ থেকে আলমারিটা সরাবার সময় তুমি সরাসরিই বল প্রয়োগ করেছিলে। বেহালা বাজাবার সময়ও তাই। কিন্তু আর একরকমভাবেও বলপ্রয়োগ করা সম্ভব। চুম্বক যখন লোহাকে টেনেছিল তখন চুম্বক কিন্তু লোহাকে একদম স্পর্শই করে নি। দূরে থেকেই চুম্বকের পক্ষে লোহার উপর বল-প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছিল। উপরদিকে একটা ঢিল ছুঁড়ে দাও। ঢিলটা খানিকটা উপরে উঠে মাটিতেই এসে পড়বে। কারণ কী? না, পৃথিবী ঢিলটাকে টানছে। আকাশপথে একখানা উড়োজাহাজ উড়ে চলেছে। মনে হয় পৃথিবীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই। আসলে কিন্তু তা নয়। পৃথিবী অনবরত টানছে উড়োজাহাজটাকে পৃথিবীর দিকেই। এখানে আমরা বলতে পারি, সরাসরি যোগাযোগ না রেখেই পৃথিবী তার বল প্রয়োগ করছে উড়োজাহাজখানার উপর, তুমি ছুঁড়ে দিয়েছিলে যে ঢিলটা তার উপর।

আগেকার দিনে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, বস্তু আর শক্তি একেবারেই আলাদা ব্যাপার। তাছাড়া সৃষ্টির কাল থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বস্তু আর শক্তির পরিমাণ আলাদা আলাদা ভাবে একই রয়ে গেছে। শক্তি যেমন এক রূপ থেকে অন্য রূপে বদলেছে পদার্থেরও তেমনি রূপান্তর ঘটেছে মাত্র। আজকাল কিন্তু বিজ্ঞানীদের এ ধারণা পালটে গেছে। আজ তাঁরা বলছেন, বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়; আবার শক্তিকেও বদলে নেওয়া যায় বস্তুতে। তোমরা অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের নাম শুনে থাকবে। এঁর মত মস্ত বড় বিজ্ঞানী এ যুগে আর দ্বিতীয় কেউ জন্মগ্রহণ করেন নি। তিনি একটি সহজ সমীকরণ দিয়ে বস্তু এবং শক্তির মধ্যে সম্পর্ক দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের। বড় হয়ে বিজ্ঞান

পড়লে এসব কথা বিস্তারিতভাবে জানতে পারবে তোমরা।

গ্যালিলিও এবং নিউটন

আধুনিক বিজ্ঞান গড়ে ওঠবার আগে বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্বন্ধে লোকের ধারণা ছিল ভারি অদ্ভুত। বলা বাহুল্য, সেসব তথ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল ভুলে ভরা। অবশ্য এজন্যে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ কী শোন।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষামূলক সত্যের উপর নির্ভরশীল সেকালে হাতেকলমে পরীক্ষা করে কোন বৈজ্ঞানিক বিষয় যাচাই করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে বড়-বড় দার্শনিক পণ্ডিতগণ যে মত প্রচার করতেন, লোকে তা বিনা দ্বিধায় মেনে নিত। সত্য মিথ্যা যাচাই করার প্রশ্ন তাদের মনেও কোনদিন জাগত না।

আমরা রোজ সকালে দেখি সূর্য পুব আকাশে উদয় হচ্ছে, তারপর সমস্ত আকাশটা ভ্রমণ করে সন্ধ্যাবেলা অস্ত যাচ্ছে পশ্চিম আকাশে। শুধু সূর্যের কথাই বা বলি কী করে। আকাশের চাঁদ, তারা, নক্ষত্র সবই পুব আকাশে উদিত হয়ে পশ্চিম আকাশে অস্ত যায়। মনে করা খুবই স্বাভাবিক যে, সূর্য, চন্দ্র, তারা, নক্ষত্র এরা সকলেই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। সেকালের দার্শনিকরাও ঠিক এ ধরনের কথাই বলেছেন। অথচ আজ আমরা জানি, কথাটা কতই না ভুল!

সেকালের এক নাম-করা দার্শনিক পণ্ডিত হলেন অ্যারিস্টটল। তিনি সে সময়কার জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল বিষয় সম্বন্ধেই তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। এসব মত লোকে নির্বিচারে মেনেও এসেছে দীর্ঘ দিন ধরে। শেষকালে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, অ্যারিস্টটলের মত সম্বন্ধে কোন দ্বিধা জাগাও পাপ বলে মনে করা হত। বলা বাহুল্য, অ্যারিস্টটলের সব মতই আর বৈজ্ঞানিক সত্য ছিল না। কিন্তু কে তার পরীক্ষা করবে? কে প্রমাণ করবে অ্যারিস্টটলের

ভুল ? সে সময় জ্ঞানবিজ্ঞানের কোন প্রশ্ন উঠলেই এক কথায় তার মীমাংসা হয়ে যেত। কোন বয়স্ক পণ্ডিত ব্যক্তি শুরু করতেন : মাস্টার বলেছেন, যে····ইত্যাদি।

আমরা হামেশাই দেখছি যে, উপর থেকে কোন ভারি জিনিস ফেলে দিলে তা মাটিতে নেমে আসে তাড়াতাড়ি। আর কোন হালকা জিনিস নেমে আসে আস্তে আস্তে। কারণ সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল বলেন, ভারি জিনিসের ওজন বেশি, কাজেই তা তাড়াতাড়ি পড়বে মাটিতে, আর হালকা জিনিসের ওজন কম তাই হালকা জিনিস মাটিতে নেমে আসবে আস্তে আস্তে। আর এ মতটাই সকলে মেনে নিয়েছে বহুদিন ধরে।

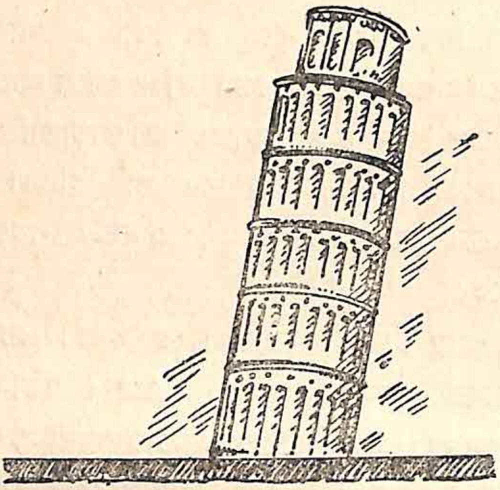
এখন থেকে প্রায় চারশো বছর আগের কথা। গ্যালিলিও ছিলেন ইটালি দেশের একজন নামকরা বিজ্ঞানী। তিনি কথাটা মেনে নিতে পারলেন না। তিনি বললেন, মাস্টার বলেছেন, অতএব মেনে নিতে হবে এমন কোন কথা নেই। মাস্টারের কথা বেদবাক্য হতে পারে, কিন্তু বেদবাক্যেরও প্রমাণ চাই।

গ্যালিলিও বললেন, জিনিস, তা ভারিই হোক বা হালকাই হোক, উপর থেকে একই সময় ছেড়ে দিলে একই সময় তা মাটিতে পড়বে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তাঁর কথা শুনে তখনকার পণ্ডিতরা হাসলেন। কিন্তু গ্যালিলিও পরীক্ষা দিয়ে ব্যাপারটা যাচাই করতে চাইলেন সকলের নিকটে।

ইটালির পিসা শহরের হেলানো স্তম্ভ পৃথিবীবিখ্যাত। বহু লোকের সামনে গ্যালিলিও স্তম্ভটার উপর থেকে এক পাউণ্ড আর দশ পাউণ্ড ওজনের দুটো লোহার টুকরো নিয়ে একই সময়ে ছেড়ে দিলেন। দেখা গেল, একই সময়ে সে দুটো মাটিতে এসে পড়েছে।

গ্যালিলিও বললেন, হালকা জিনিস উপর থেকে নিচে নেমে আসতে যদি সময় কম নেয় তার কারণ হল জিনিসটির উপর বায়ুর বাধা। বায়ুর বাধা যদি সরানো যায় তবে যেকোন ওজনের জিনিস কোন নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে নেমে আসতে সময় নেবে একই।

গ্যালিলিও আরও বহু বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করে গেছেন। আর এ সবের জন্যে তৎকালীন গোঁড়া লোকদের নিকট থেকে বহু



পিসা শহরের হেলানো স্তম্ভ। এখান থেকেই গ্যালিলিও তাঁর পরীক্ষা করেন।

অত্যাচার সহ্য করেছেন তিনি। সে সব কথা বলতে গেলে সে এক আলাদা মহাভারত হয়ে দাঁড়াবে। থাক সে কথা।

গ্যালিলিওর মতই আর এক মহাবিজ্ঞানী ছিলেন নিউটন। গ্যালিলিও যে বছর মারা যান নিউটন জন্মগ্রহণ করেন সেই বছরই। গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতি পণ্ডিতদের একান্ত চেষ্টায়ই পদার্থ-বিদ্যার ভিত্তি দৃঢ় হয়েছে। অন্ধ বিশ্বাসের বাঁধন ছেড়ে বিজ্ঞান প্রকৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অভিকর্ষ

কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে তা গতিসম্পন্ন হয় সে কথা আগেই বলেছি। তাছাড়া পৃথিবী প্রতিটি জিনিসকে টানে,

যাকে আমরা বলি অভিকর্ষ বা গ্র্যাভিটি। শুধু পৃথিবী কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি পদার্থ প্রতিটি পদার্থকে টানছে। একে বলা হয়, মহাকর্ষ বা গ্র্যাভিটেশন। মহাকর্ষের নিয়ম আবিষ্কার করেছেন নিউটন। তাছাড়া গতিবিজ্ঞানের যে সব নিয়ম বা সূত্র নিউটন আমাদের দিয়ে গেছেন তা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। পদার্থ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে নিউটনের এসব আবিষ্কারকে কোনক্রমেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলে না। তাই এ সব সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা যাক।

মহাকর্ষ

কোন জিনিসের মধ্যে যে পরিমাণ বস্তু আছে তাকে বিজ্ঞানীরা একটি মাত্র কথায় প্রকাশ করেছেন। কথাটি হল ভর, ইংরেজি করে বললে বলতে হয় মাস্। সোজা কথায়, বস্তুর পরিমাণকেই আমরা ভর বলি।

নিউটনের মহাকর্ষের নিয়ম অনুসারে আমরা বলতে পারি যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুকণিকা অন্য প্রতিটি বস্তুকণিকাকে আকর্ষণ করছে, তা সে বস্তুকণিকা দুটি যত দূরে বা যত কাছেই থাক না কেন। এই যে আকর্ষণ বা টান এটা নির্ভর করছে বস্তুর ভর এবং দূরত্বের উপর। ভর বেশি হলে এ টানটাও বেশি হবে, আর দূরত্ব বেশি হলে টানের জোরটা হবে কম। দূরত্ব যেমন যেমন কমে আসবে টানের জোরও তত বেড়ে যাবে।

সৌরজগতের বা সূর্যের জগতের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য। গ্রহ উপগ্রহরা সূর্যের চারদিকে অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে। পণ্ডিতরা বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এরকম কত সৌরজগত আছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। মহাকাশে লক্ষ কোটি ছোট বড় তারা নক্ষত্র। তারাও কোন না কোন নির্দিষ্ট পথে চলাফেরা করছে অনবরত। আমাদের কাছে মনে হয় সেখানে বুঝি কোন নিয়ম নেই, নেই কোন শৃঙ্খলা।

নিউটনের নিয়মটি আমাদের বলে দেয়, বিশ্বপ্রকৃতি কত সুন্দর নিয়মে বাঁধা। পরস্পর পরস্পরের টানাটানিতে একটা নির্দিষ্ট পথে আইন মেনে ঘুরপাক খাচ্ছে সূর্য, চন্দ্র, তারা, নক্ষত্র, সকলেই।

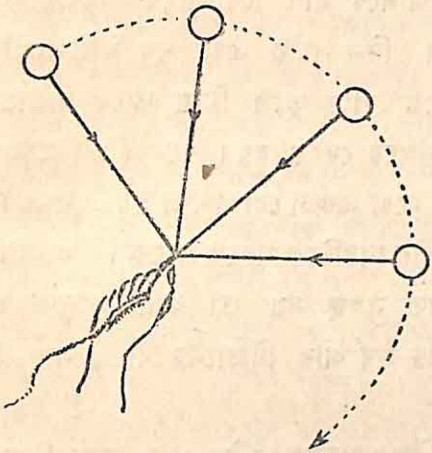
মহাকর্ষের নিয়মটি খুবই ব্যাপক। কিন্তু আমরা যদি আমাদের এই পৃথিবীর কথা চিন্তা করি তাহলে দেখা যাবে যে, পৃথিবীর পিঠের উপর বা কাছাকাছি জিনিসের উপর পৃথিবী একটা টান প্রয়োগ করছে। এই টানকেই আমরা বলি অভিকর্ষ। আর এই টানটার জন্যেই গাছ থেকে ফল মাটিতে পড়ে, পৃথিবীর বাইরে চলে যায় না। শোনা যায়, গাছ থেকে আপেল মাটিতে পড়তে দেখেই নিউটনের মনে অভিকর্ষের ধারণা প্রথম এসেছিল। সত্যি মিথ্যা জানি না, কিন্তু এ সত্য আবিষ্কার করবার জন্যে নিউটনকে মাথা খাটিয়ে অনেক হিসেব নিকেশ করতে যে হয়েছে তা না বললেও বোঝা যায়।

চাঁদ কেন ঘোরে পৃথিবীর চারদিকে

গাছ থেকে আপেল মাটিতে পড়ে অভিকর্ষের টানের জন্যে। ভাল কথা। চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খায়। চাঁদ কেন পৃথিবীর টানের জন্যে পৃথিবীর বুকে এসে পড়ে না হুমড়ি খেয়ে? কারণ কী? না, পৃথিবী যেমন চাঁদকে টানছে, চাঁদও তো আর চুপচাপ বসে নেই। সেও টানছে পৃথিবীকে। তাছাড়া সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহরাও টানছে পৃথিবী এবং চাঁদকে। এত সব টানাটানির ফলেই চাঁদ বেচারা পৃথিবীর পিঠে এসে পড়তে পারছে না। একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে থেকে পৃথিবীর চারদিকেই ঘুরে মরছে অনবরত।

কৃত্রিম উপগ্রহের কথা তোমাদের অজানা নেই। মানুষের তৈরি এ সব উপগ্রহ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। সম্প্রতি আবার কৃত্রিমভাবে গ্রহ তৈরি করার ব্যাপারেও বিজ্ঞান বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। কৃত্রিম গ্রহরা আবার আমাদের পৃথিবীর মতই সূর্যের চারদিকে ঘুরপাক খায়। এ সব কী করে সম্ভব? শোন সেই কথা।

একটা সুতোর মাথায় একটা ঢিল বেঁধে তাকে অনায়াসে চারদিকে ঘোরানো যায়। সুতোটা ছিঁড়ে গেলে ঢিলটা একদিকে ছিটকে বেরিয়ে যায়। এখানে ব্যাপারটা কী ঘটে দেখা যাক। এখানে দুটি টান একসঙ্গে কাজ করছে। সুতোটা ঢিলটাকে সবসময়েই আঙুলের দিকে টেনে রাখছে, আর ঢিলটার প্রকৃতি হল চক্রাকার পথ ছেড়ে সোজা পথে কোনদিকে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া। প্রথম টানটাকে আমরা বলতে পারি কেন্দ্রাভিমুখী টান, আর দ্বিতীয়টিকে বলা যায় বহির্মুখী টান। কেন্দ্রাভিমুখী টানটা যদি বেশি হয় তবে



সুতোর মাথায় একটি ঢিল বেঁধে তা অনায়াসে চারদিকে ঘোরানো যায়।

ঢিলটা আঙুলের দিকে সরে আসবে, আর দ্বিতীয় টানটা অর্থাৎ বহির্মুখী টানটা বেশি হলে ঢিলটা না ঘুরে সোজা পথে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। সুতোটা ছিঁড়ে গেলেই ওরকমটি ঘটতে পারে। এখন, এই যে দুটো টান এরা যদি সমান সমান হয় তবে ঢিলটা আঙুলের দিকেও আসতে পারবে না বা বাইরে বেরিয়েও যেতে পারবে না। ফল হবে, ঢিলটা চক্রাকার পথে আঙুলের চারদিকে ঘুরতে থাকবে। আশা করি, চাঁদ কেন পৃথিবীর চারদিকে অনবরত ঘুরপাক খায় তার কারণটা আর তোমাদের বলে দিতে হবে না। কৃত্রিম গ্রহ বা উপগ্রহ তৈরির মূল কথা এখানেই।

মানুষের তৈরি গ্রহ বা উপগ্রহ

পৃথিবী থেকে কোন জিনিস উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে খানিকটা উপরে উঠে তা আবার পৃথিবীর পিঠেই ফিরে আসে। কারণ হল

অভিকর্ষের টান। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে, পৃথিবী থেকে দুশো মাইল উপরে তুলে নিয়ে যদি কোন জিনিসকে ঘণ্টায় আঠারো হাজার মাইল বেগে পৃথিবীর সমান্তরাল করে চালিয়ে দেওয়া যায় তবে সে আর পৃথিবীর বুকে ফিরে আসবে না। সে পৃথিবীর চারদিকে অনবরত ঘুরপাক খেতে থাকবে। তিন পর্যায় এবং খুব শক্তিশালী রকেট সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহটিকে উপরে তুলে নিয়ে তাকে ঘণ্টায় আঠারো হাজার মাইল বেগে চালিয়ে দেওয়া হয়। রকেটটির নিজের গতি আর পৃথিবীর অভিকর্ষের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয় এ সময়। এর ফলে কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকে। কাজটা যত সহজে বলা হল তা যে অত সহজ নয় তা বলাই বাহুল্য। এর জন্যে চাই সূক্ষ্ম হিসেব, প্রচুর অর্থ আর বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সম্বন্ধে উঁচুস্তরের জ্ঞান।

কৃত্রিম গ্রহ এবং উপগ্রহ সৃষ্টির ব্যাপারে রাশিয়া এবং আমেরিকা যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে তা আশা করি তোমরা জান। রাশিয়া সর্বপ্রথম যে উপগ্রহটি ছেড়েছিল তা পৃথিবী থেকে ৫৬০ মাইল উপরে থেকে প্রতি ৯০ মিনিটে একবার করে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে এসেছিল।

ভর ও ওজন

ভর বা মাস্‌এর কথা আগেই বলেছি। এবারে দেখা যাক, ওজন বলতে কী বোঝায়। নিউটন বলেছেন, পৃথিবী প্রতিটি জিনিসকে তার কেন্দ্রের দিকে টানে। এই টানটাকেই আমরা বলি ওজন। অভিকর্ষের জন্যে আকর্ষণ ছাড়া এ আর অন্য কিছুই নয়। সুতরাং যে জিনিসের উপর পৃথিবীর টান বেশি তার ওজন হবে বেশি ; আর যার উপর টানটা কম তার ওজন হবে কম।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, পৃথিবীর এ টানটা দুটো জিনিসের উপর নির্ভর করে। এক নম্বর হল, পদার্থের ভর বা মাস্; আর দু-নম্বর

হল, পৃথিবীর টানের জন্যে পদার্থটির উপর যে অ্যাক্সিলারেশন (যার বাংলা করা হয় 'ত্বরণ') সৃষ্টি হবে তা। অ্যাক্সিলারেশন বা ত্বরণ ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

কোন জিনিসের উপর বল প্রয়োগ করলে জিনিসটার উপরে একটা গতির সৃষ্টি হয় অর্থাৎ জিনিসটা তখন চলতে থাকে। জিনিসটার উপর ক্রমাগত যদি বল প্রয়োগ করা হতে থাকে তবে জিনিসটার গতিবেগও একটু একটু করে বাড়তে থাকবে। এই যে বাড়তি গতিবেগ অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে বা মিনিটে যতটুকু করে গতি বেড়ে যাচ্ছে, তাকেই বলা হয় ত্বরণ বা অ্যাক্সিলারেশন।

পৃথিবী যখন প্রতি জিনিসকে টানছে তখন প্রতি জিনিসই একটা গতি পেয়ে পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে। পৃথিবীর যত কাছে আসছে জিনিসটি ততই তার গতিবেগ বাড়ছে। এর জন্যে ত্বরণ বা অ্যাক্সিলারেশনও সৃষ্টি হচ্ছে। পৃথিবীর টানের জন্যে তৈরি এই ত্বরণকে বলা হয় অভিকর্ষ ত্বরণ ; ইংরেজিতে, অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি।

পদার্থের ওজনের কথায় আবার একটু ফিরে আসা যাক। পদার্থের ভর বেশি হলে ওজনও হবে বেশি ; আবার যদি ভর হয় কম তবে ওজনও হবে কম। এটা এক কথায় মেনে নিতে কোন অসুবিধে হয় না আমাদের। কিন্তু গণ্ডগোল বাধল ত্বরণকে নিয়ে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, ত্বরণ পৃথিবীর এক এক জায়গায় এক এক রকম। বিষুবরেখার কাছাকাছি জায়গায় ত্বরণ কম ; যত পৃথিবীর উত্তর বা দক্ষিণ দিকে যাওয়া যাবে ততই ত্বরণ হবে বেশি। তাছাড়া পৃথিবীর উপরে, যেমন কোন পাহাড়ের চূড়ায়, বা মাটির নিচে, ধর কোন খনির মধ্যে গেলে ত্বরণ হবে কম। এর ফলে একই ভরের কোন জিনিসকে যদি বিষুবরেখা থেকে পৃথিবীর উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর দিকে নিয়ে যাওয়া যায় তবে তার ওজন একটু একটু করে বাড়তে থাকবে। তেমনি আবার কোন পাহাড়ের উপর বা কোন খনির মধ্যে নিয়ে গেলে একই জিনিসের ওজন হবে কম। মজার ব্যাপার সন্দেহ নেই।

অবশ্য ওজনের এই যে তারতম্য তা খুবই কম বলে সাধারণভাবে আমরা এর উপর কোন গুরুত্ব দিই না।

পৃথিবী ছাড়িয়ে যত উপরে ওঠা যাবে ততই কোন জিনিসের ওজন যাবে কমে। আসলে কৃত্রিম উপগ্রহে চড়ে যাঁরা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে এসেছেন সে ভ্রমণ-কালে তাঁদের দেহের কোন ওজনই ছিল না। তাঁদের শরীর ছিল একেবারে হালকা।

এখানে আর একটা ব্যাপার বলা দরকার। আমরা হামেশাই বলে থাকি অমুক জিনিসের ওজন অত সের বা অত কে.জি.। বিজ্ঞানের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, কথাটা আদবে ভুল। ঠিকমত বলতে গেলে বলতে হয়, অমুক জিনিসের ভর অত কে. জি. বা অত সের, কারণ জিনিস-পত্তরের ওজন করবার জন্যে আমরা যে দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করি তা দিয়ে ওজন মাপা যায় না, মাপা হয় ভর।

নিউটনের গতির নিয়ম

মহাকর্ষ এবং অভিকর্ষ ছাড়া নিউটন যে গতির নিয়মগুলি আবিষ্কার করেছেন তাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

চলন্ত ট্রাম-বাস থেকে উঠানামার অভ্যেস আছে অনেকের। অভ্যেসটা মোটেই সমর্থন করা যায় না। এতে করে বিপদ ঘটার সম্ভাবনা খুবই। তবে যারা এ কাজে ওস্তাদ তারা চলন্ত ট্রামে ওঠবার সময় ট্রামের সঙ্গে সঙ্গে একটুখানি ছুটে নিয়ে তবেই ট্রামে উঠে পড়ে। আবার চলন্ত ট্রাম থেকে নামবার সময় শরীরটাকে একটু পেছনদিকে ঝুঁকিয়ে তবেই নেমে পড়ে। চলন্ত ট্রাম-বাস হঠাৎ থেমে পড়লে যাত্রীদের অনেকেই (বিশেষভাবে সাবধান ছিল না যারা) হুড়মুড় করে পড়ে যায়, এ অভিজ্ঞতা তো তোমাদের নিত্যকারের। ট্রামটা এক জায়গায় থেমে আছে। হঠাৎ করে তা চলতে শুরু করলেও ওরকম ব্যাপার ঘটার সম্ভাবনা। এসব ক্ষেত্রে সত্যিকারের কী ঘটে দেখা যাক।

ট্রামটা যখন চলছে তখন ট্রামের সঙ্গে তুমিও চলেছ। তোমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। এখন যখন ট্রামটা হঠাৎ থেমে পড়ল তখন তোমার পা দু-খানা যা ট্রামের সংস্পর্শে আছে তা ট্রামের সঙ্গে সঙ্গে থেমে পড়ল। আর তোমার মাথার দিকটা ? সে কিন্তু তখনও চলছে। ফলে তোমার শরীরটা ঝুঁকে পড়বার সম্ভাবনা। আবার হঠাৎ করে ট্রাম বাস চলতে শুরু করলে অসাবধান যাত্রীদের অসুবিধের কারণও ওই একই।

নিউটনের এ সম্বন্ধে যে নিয়মটি আছে তা জেনে নেওয়াটা এ প্রসঙ্গে বোধহয় তোমাদের ভালই লাগবে। নিয়মটি এইরূপ—যদি কোন পদার্থ এক জায়গায় স্থির থাকে তবে তা চিরদিনই স্থির থাকবে, আর জিনিসটা যদি চলতে থাকে তবে সে চিরদিনই চলতে থাকবে, অবশ্য বাইরের কোন বল এসে যদি ব্যাঘাত না ঘটায়।

গতি সম্বন্ধে নিউটনের আরও দুটি বিখ্যাত নিয়ম আছে। দ্বিতীয় নিয়মটি থেকে আমরা বল কাকে বলে তা জানতে পারি। তৃতীয় নিয়মটি হল এই যে, প্রতিটি ক্রিয়ারই সমতুল্য বিপরীত ক্রিয়া আছে।

তৃতীয় নিয়মটিও ভারি মজার। তুমি রামের পিঠে একটা কিল দিলে। রাম সে আঘাতে কেঁদে ফেলল। কিন্তু রামের কাঁদার যথেষ্ট কারণ অছে কি ? নিউটনের নিয়ম অনুসারে, রামও যে তোমার হাতে একটা বিপরীত আঘাত দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, রামের পিঠে ব্যথাটা একটু বেশি লেগেছে এই যা।

তোমাদের মধ্যে যাদের বন্দুক ছোঁড়বার অভ্যেস আছে বন্দুক ছোঁড়বার সময় তাদের নিউটনের তৃতীয় নিয়মটির সঙ্গে পরিচয় আছে নিশ্চয়ই। বন্দুকের গুলিটা যখন বন্দুকের নল ছেড়ে বেরিয়ে যায় তখন বন্দুকটাকে কিরকম পেছনের দিকে ধাক্কা দেয় তা তারা জানে নিশ্চয়ই। এ সেই নিউটনের তৃতীয় নিয়মেরই পরীক্ষা বলতে পার। তবে প্রশ্ন করতে পার, বন্দুকের গুলিটা অতটা দূরে গেল আর বন্দুকটা পেছন দিকে সামান্য একটু ধাক্কা দিয়েই থেমে গেল যে ?

ব্যাখ্যাটা সহজ। গুলিটার ভর খুবই সামান্য, বিশেষভাবে বন্দুকটার তুলনায়। তাছাড়া তুমি তো জোর করে বন্দুকটাকে পেছনের দিকে সরে যেতে দিচ্ছ না। কাজেই বিপরীত ক্রিয়াটা তেমন জোরদার হয় নি আর-কি। কিন্তু নিয়ম অনুসারে, গুলিটা যতটা কাজ করবে, বন্দুকটাও ঠিক ততটা কাজ করবে বিপরীত দিকে। এবং তা করেও থাকে।

আর্কিমিডিসের গল্প

পদার্থের তিন অবস্থা

যেকোন পদার্থ আমরা তিন অবস্থায় দেখতে পাই। কোন পদার্থ কঠিন, কোন পদার্থ তরল, আবার কোন কোন পদার্থ বায়বীয়। লোহা, কাঠ, কয়লা, বই, এসব কঠিন। আবার তেল, জল, পেট্রোল, এসব তরল। কঠিন এবং তরল পদার্থ আমরা দেখে বা অনুভব করে বুঝতে পারি। হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, এ সব বায়বীয় পদার্থ। এ সব পদার্থ আমরা চোখে দেখতে পাই না। তবে এমন বায়বীয় পদার্থ আছে যার রঙ আছে, আছে গন্ধ। এ সব পদার্থের রঙ দেখে এবং গন্ধ শুঁকে আমরা এর অবস্থিতি বুঝতে পারি। বায়ু কয়েকটি বায়বীয় পদার্থের মিশ্রণ। এর মধ্যে প্রধান হল নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন। বায়ুও আমরা চোখে দেখতে পাই না, কারণ বায়ুর ভিতরকার পদার্থগুলির কোন রঙ নেই বর্তমান। তবে, বায়ু যখন প্রবাহিত হয় তখন তার অবস্থিতি আমরা টের পাই। ঝড় বইলে গাছপালা উপড়ে, বাড়িঘর তছনছ করে আমাদের অনেক ক্ষতি করে। বায়ুর অবস্থিতি তখন বেশ ভালভাবেই টের পাই আমরা।

বায়বীয় পদার্থের ইংরেজি নাম গ্যাস। বায়বীয় পদার্থ কথাটির বদলে আমরা অনায়াসে গ্যাস কথাটি ব্যবহার করতে পারি। বিজ্ঞানীরা বলেন, কোন পদার্থ—তা সে কঠিনই হোক, তরল বা

বায়বীয়ই হোক—তৈরি হয়েছে অতি ক্ষুদ্র সব কণিকা দিয়ে। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন মলিকিউল বা অণু। পদার্থের এই অণুগুলি খুব কাছাকাছি থেকেই যে-কোন পদার্থ সৃষ্টি করেছে। অণুগুলি একে অন্যকে টেনে রাখে নিজের নিজের একেবারে কাছে। অণুগুলির এই যে টান বা আকর্ষণ একে বলা হয় আণবিক আকর্ষণ বা মলিকিউলার অ্যাট্রাকশন। কোন পদার্থের অণুগুলির মধ্যে যে ফাঁকটুকু থাকে তাকে বলা হয় আণবিক ব্যবধান। দেখা যায়, কঠিন পদার্থের অণুগুলি খুবই ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে। তবে যতই এরা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাক না কেন খুব সামান্য হলেও এদের মধ্যে একটু ফাঁক থাকবেই। কাঠ কঠিন পদার্থ। কিন্তু একটা পেরেক পুতলে সেটা কাঠের মধ্যে ঢুকে যায় অনায়াসে। যদি কাঠের অণুগুলির মধ্যে একটুও ফাঁক না থাকবে তবে পেরেকটা কাঠের ভিতরে ঢুকল কী করে? আসলে ব্যাপারটা ঘটেছে এইরকম। কাঠের অণুগুলি একটু একটু সরে সরে জায়গা দিয়েছে বলে পেরেক সে ফাঁকে নিজের জন্যে একটু জায়গার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। একটা সহজ উদাহরণ নিলে ব্যাপারটা ভাল বোঝা যাবে। একটা বেঞ্চিতে সাধারণ অবস্থায় ধর পাঁচটি ছেলে বসতে পারে। এখন যদি আর একটি ছেলে বসতে চায় সে বেঞ্চিতে তবে ঐ পাঁচটি ছেলে একটু সরে সরে ঐ ছেলেটির বসবার ব্যবস্থা করে দিতে পারে। বেঞ্চিতে যদি একদম বসবার জায়গা না থাকত তবে তো এটা সম্ভব হত না!

তরল পদার্থের বেলা দেখা যায় যে, এর অণুগুলির ভিতরকার আকর্ষণ কঠিন পদার্থের চেয়ে কম, আর আণবিক ব্যবধান বেশি। এর ফলে তরল পদার্থের নিজস্ব কোন আকৃতি নেই। যে পাত্রে রাখা যায় তরল পদার্থ সে পাত্রের আকৃতিই পেয়ে থাকে। গ্যাসের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, আণবিক আকর্ষণ এদের একরকম নেই-ই। তাই গ্যাস মুহূর্তমধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঘরের একধারে একটা ধূপকাঠি জ্বাললে ধূপকাঠির মিষ্ট গন্ধ সঙ্গে সঙ্গেই ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে।

গ্যাসের অণুদের যে গুণটির কথা বললাম এটা সেজন্যেই যে সম্ভব হয়েছে তা না বললেও তোমরা বুঝতে পারছ।

ঘনত্ব কাকে বলে ?

কোন জিনিস ঘন, কোন জিনিস পাতলা—একথা তো আমরা হরদমই ব্যবহার করি। তেল আর জল মেশালে তেলটা উপরে ভেসে ওঠে। কারণ কী ? না, তেলটা জলের চেয়ে পাতলা। আবার, যে তেলটাকে পাতলা বলা হচ্ছে তার চেয়েও পাতলা তরল পদার্থ দেখা যায়। আবার জলের চেয়ে ঘন জিনিস রয়েছে অনেক। কাজেই কোন জিনিস কতটা পাতলা বা ঘন এটি বোঝাবার জন্যে বিজ্ঞানীরা যে কথাটির সাহায্য নেন তা হল ঘনত্ব বা ডেনসিটি। কোন নির্দিষ্ট আয়তনের পদার্থ নিয়ে তার যা ভর হবে তাকেই বলা হয় ঘনত্ব। হিসেবের সুবিধের জন্যে আয়তনটাকে নির্দিষ্ট রাখা হয়। এক ঘন-ফুট জলের ভর ৬২·৫ পাউণ্ড। কাজেই আমরা বলতে পারি, জলের ঘনত্ব ৬২·৫। উষ্ণতার তারতম্যের জন্যে অবশ্য ঘনত্ব বাড়ে কমে। কাজে-কাজেই কোন পদার্থের ঘনত্ব বলবার সময় তার উষ্ণতারও উল্লেখ করা দরকার। জলের ঘনত্বের কথা যা বললাম তা ধরা হয় ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায়। অ্যাল্‌কোহল জলের চেয়ে হালকা। এক ঘন-ফুট অ্যালকোহলের ভর হবে ৫০ পাউণ্ড। কাজেই অ্যাল্‌কোহলের ঘনত্ব ৫০। এমনিভাবে দেখা যায়, পারদের ঘনত্ব ৮৫০ অর্থাৎ এক ঘন-ফুট পারদের ওজন ৮৫০ পাউণ্ড।

মাপজোক করবার জন্যে আমরা যেমন গজ-ফুট-ইঞ্চি, পাউণ্ড-টন প্রভৃতি ব্যবহার করি তেমনি গ্রাম, সেন্টিমিটার প্রভৃতিও ব্যবহার করে থাকি। আজকাল শুধু ঐ গ্রাম, সেন্টিমিটার প্রভৃতিই চালু হয়েছে আমাদের দেশে। এদিক দিয়ে বিচার করলে জলের ঘনত্ব বললে বুঝব, এক ঘন-সেন্টিমিটার আয়তনের জলের ওজন বা ভর এক গ্রাম। তেমনি পারদের ঘনত্ব ১৩·৬ অর্থাৎ এক ঘন-সেন্টিমিটার পারদের ভর ১৩·৬ গ্রাম।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঘনত্ব বলতে গেলে মাপবার জন্যে কোন্ পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে তাও বলতে হয়। এসব ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে বিজ্ঞানীরা একটি সহজ এবং সুন্দর সমাধান খুঁজে বের করেছেন। তাঁরা একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব এক ধরে অন্যান্য যেকোন কঠিন বা তরল পদার্থের ঘনত্ব একটি তুলনামূলক সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করেছেন। জলের ঘনত্ব যদি ধরা হয় এক, তবে পারদের ঘনত্ব দাঁড়াবে ১৩·৬। এ কাজের জন্যে যে কথাটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে তা হল আপেক্ষিক গুরুত্ব বা তুলনামূলক ঘনত্ব। ইংরেজিতে বলা হয় স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি। পারদের আপেক্ষিক গুরুত্ব যদি হয় ১৩·৬, তবে আমরা সোজা কথায় বুঝব যে, পারদ জলের চেয়ে ১৩·৬ গুণ ভারি। এক ঘন-সেন্টিমিটার জলের ওজন যদি হয় এক গ্রাম, তবে এক ঘন-সেন্টিমিটার পারদের ওজন হবে ১৩·৬ গ্রাম।

তরল পদার্থের চাপ

কোন পাত্রে জল বা অন্য কোন তরল পদার্থ রাখলে তরল পদার্থটি পাত্রটির গায়ে এবং তলায় চাপ দিয়ে থাকে। এ জাতীয় চাপ যে কত বিরাট আকারের হয় তা একটি সহজ উদাহরণ নিলেই বোঝা যাবে।

একটা জলের ট্যাঙ্কের কথাই ধরা যাক না। ট্যাঙ্কটা ১০ ফুট লম্বা, ১০ ফুট চওড়া আর ১০ ফুট উঁচু। ট্যাঙ্কটা পুরোপুরি জল দিয়ে ভরে দেওয়া হল। হিসেব করলে দেখা যায় যে, শুধু ট্যাঙ্কের তলাতেই চাপ পড়ছে ৬২ হাজার ৪ শো পাউণ্ড। তলাকার সবটা বিচার না করে যদি মাত্র ১ ইঞ্চি লম্বা এবং ১ ইঞ্চি চওড়া জায়গার কথা ভাবা যায় তবে দেখা যাবে, এইটুকু জায়গার উপরই চাপ পড়ছে ৪·৩৩ পাউণ্ড।

এই যে কোন পাত্রের উপর জল বা অন্য কোন তরল পদার্থের

চাপ এটা সবদিকেই সমান, তা সে উপর নিচেই হোক বা পাশাপাশিই হোক। জলের গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ চাপ বাড়বে। আমরা এক কথায় বলতে পারি, পাত্রের চেহারা যেমনই হোক না কেন, জলের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গেই এ চাপের রয়েছে নিকট সম্পর্ক।

সমুদ্রের জলে থাকে নানা জাতীয় লবণ জলের সঙ্গে গুলে। ফলে এ জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব কিছুটা বেশি। ৬০০ ফুট গভীর সমুদ্রের তলায় প্রতি বর্গ-ইঞ্চির উপর এ জলের চাপ পড়বে ২৮২ পাউণ্ড। কোন-কোন জায়গার সমুদ্রের গভীরতা ছ-মাইলের মত। এ সব জায়গার সমুদ্রের তলায় চাপ পড়ছে প্রতি বর্গ-ইঞ্চির উপর সাত টনের মত। এক ইঞ্চি জায়গার উপর সাত টন চাপ! ভাবতেও ভয় লাগে।

জলে কোন জিনিস ভাসে কেন

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, এক টুকরো শুকনো কাঠ জলে ফেলে দিলে সেখানা ভাসে। আবার এক টুকরো লোহা কিন্তু ভাসে না। এর কারণ কী? আমরা সোজা কথায় বলতে পারি যে, জলের চেয়ে শুকনো কাঠের ঘনত্ব কম, তাই তা জলে ভাসে। আবার লোহার ঘনত্ব জলের চেয়ে বেশি, তাই লোহা জলে ডোবে। তবে কোন জিনিস যখন জলে ভাসে তখন তার খানিকটা অংশ জলের ভিতরে থাকে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, যে অংশটা জলের নিচে আছে সেই আয়তনের সমান জলের যা ওজন তা আসলে জিনিসটির পুরো ওজনের সমান। ধরা যাক, একখানা জাহাজের ওজন পাঁচ হাজার টন। এ জাহাজখানা জলে ভাসালে জাহাজের তলার দিকটার বেশ খানিকটা জলে ডুববে। কাজে-কাজেই যে অংশটা জলের ভিতরে রয়েছে তার আয়তন যা হবে সেই আয়তনের জলের ওজন পাঁচ হাজার টন হতেই হবে।

যে জিনিস জলে ডুবে যায় তা আবার অন্য কোন তরল পদার্থে কিন্তু ভেসে থাকতে পারে। সীসার একটি টুকরো নিয়ে তা পারদের উপর ছেড়ে দিলে তা পারদের উপর দিব্যি ভাসবে, যদিও সীসা জলে ভাসার কোন সম্ভাবনাই নেই। এক কথায় এর কারণ বলতে পারি, পারদের চেয়ে সীসার ঘনত্ব কম, তাই সীসা পারদে ভেসে থাকতে পারে।

ইউরেকা! ইউরেকা!

এ সব ব্যাপার সম্বন্ধে যে নিয়মটি আছে তা আবিষ্কার করেছেন গ্রীক পণ্ডিত আর্কিমিডিস। সে আবিষ্কারের পেছনে যে গল্পটি আছে তা হয়ত তোমাদের অনেকের জানা আছে। শোন সেই গল্পটি।



আর্কিমিডিস

সে অনেক দিন আগের কথা। যীশুখ্রীস্টের জন্মের প্রায় তিনশো বছর আগের। সাইরাকিউজের রাজা হিরো স্যাকরাকে দিয়েছেন এক সোনার মুকুট বানাতে। মুকুট বানানো হল। ভারি সুন্দর দেখতে। রাজার তো ভারি পছন্দ। কিন্তু হাতে ধরে কেমন যেন সন্দেহ হল রাজার, খাঁটি সোনায় বানানো হয়েছে তো মুকুটটি? সোনা চুরি করে কিছুটা খাদ স্যাকরা মিশিয়ে দেয় নি তো?

পণ্ডিত হিসেবে আর্কিমিডিসের তখন দেশজোড়া নাম ডাক। রাজা তাঁরই উপর ভার দিলেন মুকুটে কোন খাদ মেশানো আছে কি না তা বের করবার। তবে, মুকুটটি কিন্তু কোনক্রমে ভাঙা চলবে না।

আর্কিমিডিস খুব ভাবনায় পড়লেন। কী করে সমস্যার সমাধান হবে দিনরাত শুধু সেই ভাবনা। ভাবতে ভাবতে একদিন তিনি স্নানের ঘরে ঢুকেছেন। চৌবাচ্চা-ভর্তি জল। স্নান করবার জন্যে চৌবাচ্চায় নেমেছেন তিনি। বেশ খানিকটা জল উপছে পড়ল। তাছাড়া তাঁর মনে হল, তাঁর দেহের ওজনটাও যেন খানিকটা কমে গেছে। ব্যস্, আর যায় কোথা! এক লাফে চৌবাচ্চা ছেড়ে ছুটলেন রাজার কাছে; চেঁচিয়ে বলতে বলতে যাচ্ছেন—ইউরেকা, ইউরেকা (আমি পেয়েছি! আমি পেয়েছি!)

তোমরা বুঝতেই পারছ, মুকুটটি না ভেঙে আর্কিমিডিস মুকুটটির মধ্যে খাদ বের করেছিলেন সেদিন। কিন্তু কী করে? শোন।

তিনি সোনার মুকুটটির ওজন নিলেন। তারপর একটি পাত্র কানায় কানায় জল দিয়ে ভর্তি করে তার মধ্যে আস্তে ডুবিয়ে দিলেন মুকুটটি। খানিকটা জল উপছে পড়ে গেল। কতটা জল পড়ে গেল তা তিনি লিখে রাখলেন। এবারে একই ওজনের এক তাল সোনা নিয়ে তা কানায় কানায় জলে ভর্তি একটি পাত্রে ডোবালেন। এবারেও খানিকটা জল উপছে পড়ল। কতটা জল পড়েছে তাও তিনি লক্ষ্য করলেন। দেখা গেল, প্রথমবারে যে জল উপছে পড়েছে তার আয়তন দ্বিতীয় বারের চেয়ে বেশি। সুতরাং তিনি বুঝলেন, মুকুটটি খাঁটি সোনার তৈরি নয়। যদি তা হত তবে দু-বারেই উপছে-পড়া জলের আয়তন একই রকম হত। এরপর আর্কিমিডিস এও বের করেছিলেন যে মুকুটের মধ্যে কী জাতীয় খাদ আছে, আর তার পরিমাণই বা কত।

আর্কিমিডিসের যে সূত্রটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় তা হল এই—কোন জিনিস পুরোপুরি বা আংশিকভাবে কোন স্থির তরল পদার্থের ভিতর ডোবালে মনে হবে যে, জিনিসটি যেন তার খানিকটা ওজন হারিয়েছে। আর এই হারানো ওজন হবে জিনিসটি জলে ডোবানোর জন্যে যতটা জল সরে গেছে সেই পরিমাণ জলের ওজনের সমান।

প্রতিটি জিনিসকে পৃথিবী টানে, আর এইজন্যেই দেখি যে প্রতি জিনিসের ওজন আছে। কাজেই কোন জিনিস জলে ডুবোলে তা জলের উপরে একটা চাপ দেবে, জলও আবার জিনিসটির উপর একটা চাপ দিতে থাকবে, অর্থাৎ জিনিসটির ওজন আর জলের চাপ একই সঙ্গে কাজ করবে যখন কোন জিনিস জলে ডোবানো হবে। এখন, যদি জিনিসটির ওজন বেশি হয় তবে জিনিসটি জলে ডুববে ; আর যদি জলের চাপ বেশি হয় তবে জিনিসটি জলে ভাসবে।

প্যাসক্যালের নিয়ম

আর্কিমিডিসের এই আবিষ্কারের পর বহু দিন কেটে গেছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশের এক বিজ্ঞানী জলের আর একটি অদ্ভুত ধর্মের সন্ধান পান। এঁর নাম ব্লেইজি প্যাসক্যাল। ইনি দেখান, আবদ্ধ জলের উপর যে-কোন জায়গায় চাপ দিলে তা সমানভাবে এবং সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়মটিকে বলা হয় প্যাসক্যালের নিয়ম।

পাটের কল, কাপড়ের কল এবং আরও অনেক কারখানায় হাইড্রলিক প্রেস নামে একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এ যন্ত্রটি দিয়ে খুব জোর চাপে কাপড় বা পাটের বেল বাঁধা হয়। এ যন্ত্রটি তৈরি করা হয়েছে প্যাসক্যালের নিয়মটির সাহায্য নিয়ে। যন্ত্রটি এমন-ভাবেই তৈরি যে মনে হয়, সামান্য চাপ প্রয়োগে আমরা খুব বেশি রকমের চাপ পেতে পারি এ যন্ত্র থেকে। মোটরগাড়ি প্রভৃতিতে যে হাইড্রলিক ব্রেক আছে তাও প্যাসক্যালের নিয়মের সাহায্য নিয়েই তৈরি।

জলের স্রোতের নিয়ম

আমরা এতক্ষণ জল যখন স্থির থাকে তখনকারই গুণ বা ধর্ম নিয়ে আলোচনা করলাম। এবারে শোন জল যখন প্রবাহিত হয় তার তখনকার গুণ সম্বন্ধে দু-একটি কথা।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, জল যখন স্থির থাকে তখন তার বেলা যে সমস্ত আইন কানুন খাটে, জল যখন প্রবাহিত হয় তখন সেসব আইন একেবারে অচল। ধরা যাক, চৌবাচ্চার জলের কথা। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ঐ জলের যে চাপ তা সবদিকেই সমান, উপর দিকে, নিচের দিকে বা পাশাপাশি। কিন্তু জল যখন একটা পাইপের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে তখন পাইপের সব জায়গায় চাপ এক থাকে না। যেদিকে জল প্রবাহিত হচ্ছে সেইদিকে চাপ একটু একটু করে কমতে থাকে। পাইপের যেখান দিয়ে জল প্রবেশ করে পাইপের মধ্যে সেখানেই চাপ হয় সবচেয়ে বেশি। বাড়িতে যে জলের পাইপ আছে সে পাইপ দিয়ে যখন জল আসে তখন দেখা যাবে পাইপের গোড়ার দিকে জলের তোড় কত বেশি। আড়াআড়ি একটা জলের পাইপের কথা ভাবা যাক। পাইপের ভিতরে যেখানে জলের গতিবেগ বেশি সেখানেই তো জলের চাপ সবচেয়ে বেশি হওয়া দরকার। আসলে কিন্তু তা হয় না। দেখা যায়, যেখানে জলের গতিবেগ সবচেয়ে বেশি সেখানেই জলের চাপ হয় সবচেয়ে কম। একই পাইপের যদি কোন জায়গা হয় মোটা আর কোন জায়গা হয় সরু তবে জলের চাপেরও তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। যেখানটা মোটা সেখানকার জলের গতিবেগ হয় কম; কাজে-কাজেই সেখানকার জলের চাপ হবে বেশি। যেখানটা সরু সেখানে জলের গতিবেগ বেশি, ফলে চাপ হয় কম। এ নিয়মটি আবিষ্কার করেছেন স্থইজারল্যাণ্ডের এক বিজ্ঞানী, নাম বারনৌলি।

দু-খানা মোটর-বোট যদি পাশাপাশি খুব জোরে চলতে থাকে তাহলে দু-খানা বোটের মধ্যে ধাক্কা লাগার খুবই সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় দেখা যাক। দু-খানা বোটের মাঝখানে জলের গতিবেগ হয় খুব বেশি, আর বোট দু-খানার বাইরের দিকে জলের গতিবেগ থাকে কম। জলের গতিবেগ বেশি হওয়ার অর্থ হল কম চাপের সৃষ্টি, আর গতিবেগ কম হওয়া মানে হল বেশি চাপের সৃষ্টি। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বোট দু-খানার বাইরের দিকে বেশি চাপের সৃষ্টি হয়েছে, আর দু-খানা বোটের মাঝখানে চাপ হয়েছে কম। এর ফলে এদের মধ্যে ঠোকাঠুকি লাগা খুবই সম্ভব।

বায়ুর চাপ আছে

জলের নানারকম চাপের কথা বলা হল। এবারে আমরা বায়ুর চাপের কথা বলব।

আমাদের চারদিকে যে বায়ুর আবরণ রয়েছে তাকে আমরা বলে থাকি বায়ুমণ্ডল। বায়ু আসলে কয়েকটি গ্যাসের একটি মিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এর ভিতরে প্রধান গ্যাস হল দুটি—নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। বায়ুরও ওজন আছে; ফলে পৃথিবীর চারিদিককার বায়ুমণ্ডল খুব প্রচণ্ড চাপ দেয় আমাদের পৃথিবীর উপর। জন্ম থেকেই আমরা এ চাপের মধ্যে বেড়ে উঠি; কাজেই এ চাপ সহ্য করতে অভ্যস্ত বলে আমরা এর প্রবলতা টের পাই না। হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে, প্রতি বর্গ-ইঞ্চি জায়গার উপর বায়ুমণ্ডল যে চাপ দেয় তার পরিমাণ প্রায় সাড়ে সাত সেরের মত। পণ্ডিতরা বলেন, সমস্ত বায়ুমণ্ডলের ওজন হিসেব করলে তা দাঁড়ায় প্রায় ৫৮১০০০০০০০০০০০ পাউণ্ডের মত।

বায়ুর যে চাপ আছে তা আমরা নানা কাজে লাগিয়েছি। বায়ুমান যন্ত্র বা ব্যারোমিটার যন্ত্রের নাম তোমরা শুনে থাকবে।

বায়ুমণ্ডলের চাপের সাহায্য নিয়েই তৈরি করা হয়েছে এ যন্ত্রটি। এ সম্পর্কে ইটালি দেশের বিজ্ঞানী টোরিসেলি যে আবিষ্কার করেছেন তা উল্লেখ করবার মত। তিনি একটি লম্বা একমুখ-খোলা সরু কাচের নল নিয়ে সেটি পারদ দিয়ে ভর্তি করলেন। তারপর বুড়ো আঙুল দিয়ে খোলা মুখটি বন্ধ করে আর একটি পারদ-ভরা বাটিতে সেটি উপুড় করে রাখলেন। এবারে আঙুলটি সরিয়ে নেওয়া হল। দেখা গেল, কাচের নলের পারদ আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে আসছে। এসে এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল। বাটিতে যে পারদ আছে সেখান থেকে মেপে দেখা গেল যে, নলের পারদ-স্তম্ভের দৈর্ঘ্য ৩০ ইঞ্চি বা ৭৬ সেন্টিমিটার। নলের উপর দিকে যে ফাঁকা জায়গা আছে সেখানটায় বায়ু নেই—আছে অল্প-সল্প পারদের বাষ্প।

এ পরীক্ষাটি হল ব্যারোমিটার যন্ত্রের গোড়ার কথা। অনেকটা এই একই উপায়ে তৈরি করা হয় ব্যারোমিটার যন্ত্র। আবহাওয়ার খবরাখবর সংগ্রহ করতে ব্যারোমিটার যন্ত্র যে আমাদের অনেকভাবে সাহায্য করে তা আর বলতে! আজকাল অবশ্য অন্য ধরনের সব ব্যারোমিটার বেরিয়েছে। এর মধ্যে অ্যানেরয়েড ব্যারোমিটার ব্যবহারের নানা সুবিধে দেখা যায়।

পারদের বদলে জল বা অন্য কোন তরল পদার্থ দিয়ে ব্যারোমিটার বানানো যায়, কি না? যায়, তবে অসুবিধে আছে। যেমন, জল দিয়ে একটি ব্যারোমিটার বানাতে হলে ব্যারোমিটারের নলটি লম্বায় হবে ৩৪ ফুটের মত। কাজেই ৩৪ ফুট লম্বা একটি যন্ত্রের ব্যবহার যে নানাদিক দিয়ে অসুবিধেজনক তা আর তোমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে না।

এ প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ল। শোন সেই গল্পটি।

ইটালি দেশে একটি টিউবওয়েল বসানো হচ্ছিল। ঠিক-ঠিক মত সব কাজ শেষ হল। কিন্তু পাম্প চালিয়ে টিউবওয়েল থেকে জল তোলা আর সম্ভব হল না। ব্যাপারটা সম্বন্ধে খোঁজখবর

নেওয়ার জন্যে বিজ্ঞানীদের ডাক পড়ল। তাঁরা এলেন, পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন। কারণটা বের হয়ে পড়ল শেষে।

কারণটা কী ?

যেখানে টিউবওয়েলটা বসানো হয়েছে সেখানকার মাটির তলায় জল রয়েছে অনেক নিচে—৩৪ ফুটের চেয়েও বেশি নিচে। পাম্প চালিয়ে জল তোলা যায় ৩৪ ফুট পর্যন্ত—এর বেশি নয়। ফলে পাম্পের সাহায্যে জল উঠল না সেই ইটালিদেশের টিউবওয়েলটি থেকে।

আমরা আগেই বলেছি, পারদের বদলে জল দিয়ে যদি ব্যারোমিটার বানানো যায় তবে সে ব্যারোমিটার লম্বায় হবে ৩৪ ফুটের বেশি। আমরা অন্যভাবে বলতে পারি যে, বায়ুমণ্ডল যে চাপ দেয় সে চাপ হল ৩৪ ফুট উঁচু কোন জলস্তম্ভের ওজনের সমান। আমাদের জানা আছে, টিউবওয়েলে যে পাম্প ব্যবহার করা হয় সে নিজে জল তোলে না, তার কাজ হল টিউবওয়েলের নলটিকে বায়ুশূন্য করে দেওয়া। জল ওঠে বায়ুমণ্ডলের চাপে আপনা-আপনি।

নানা ধরনের পাম্প

পাম্পের কথায় অন্য নানা রকম পাম্পের কথা মনে পড়ল। আমরা কত কাজেই না কত ধরনের পাম্প ব্যবহার করি। টিউবওয়েলের পাম্পের কথা তো আগেই বলেছি। সাইকেলের পাম্প দিয়ে আমরা জোর চাপে বায়ু ভরে দিই সাইকেলের টিউবে। আবার আর-এক রকমের পাম্প আছে যা দিয়ে কোন আবদ্ধ জায়গাকে বায়ুশূন্য করা যায়। ডাক্তারবাবুদের ইনজেকশন দেবার সিরিঞ্জ তোমরা দেখে থাকবে। এও এক ধরনের পাম্প। সাধারণ পাম্প দিয়ে ৩৪ ফুটের বেশি উঁচুতে জল তোলা যায় না। কিন্তু পাঁচ সাত তলা বাড়ির ছাদে জল তুলতে

হলে কী করব ? এ কাজের জন্যে আবার অন্য এক ধরনের পাম্পের দরকার হয়। এর নাম লিফ্‌ট্‌ পাম্প।

বারনৌলির সূত্রের কথা আগেই বলেছি। উড়োজাহাজ মাটি ছেড়ে কেমন মুহূর্তমধ্যে আকাশে উঠে যায় তা লক্ষ্য করেছ হয়ত অনেকে। উড়োজাহাজের পাখা এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে করে পাখার উপরদিককার হাওয়া কেটে যায় বেশ তাড়াতাড়ি—নিচের হাওয়া কাটে আস্তে আস্তে। এর ফলে পাখার উপর দিকে চাপ হয় কম আর নিচের দিকে হয় বেশি। পাখার নিচের বেশি চাপ উড়োজাহাজকে ঠেলে উপরে তুলে দেয়। আকাশে উঠবার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটুকু আমরা বারনৌলির নিয়ম থেকেই পেয়ে থাকি।

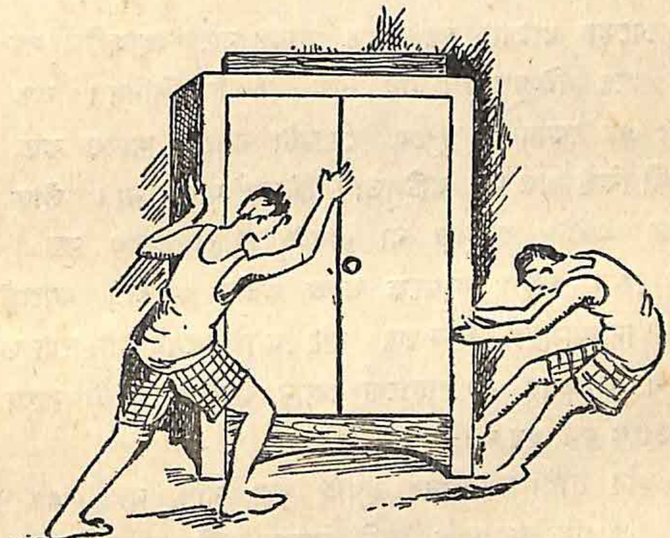
জলীয় বাষ্পের কথা

বায়ুমণ্ডলের কথা বলতে গিয়ে বায়ুমণ্ডলের ভিতরকার জলীয় বাষ্পের কথাও একটু বলা দরকার। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে জলীয় বাষ্প তো সব সময়ই বর্তমান। আর এই জলীয় বাষ্পই কখনো মেঘবৃষ্টির আকারে, কখনো বা শিশির, কুয়াসা এবং তুষারের আকারে আমাদের চোখে পড়ে। গ্রীষ্ম বা বর্ষার দিনে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ থাকে বেশি। এর ফলে গরমের দিনে আমাদের ঘাম হয়, বর্ষার দিনে ভিজে কাপড়-চোপড় শুকোতেই চায় না। আবার শীতের দিনে কাপড় চোপড় কত তাড়াতাড়িই না শুকোয় ! কারণটা খুবই সহজ। শীতের দিনে বায়ুর মধ্যে জলীয় বাষ্প থাকে খুবই কম। তাই সহজেই ভিজে কাপড়ের জল বাষ্প হয়ে বায়ুর মধ্যে যেতে পারে। বায়ুর ভিতরকার জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, এক কথায়, আর্দ্রতা মাপবার জন্যে নানারূপ উপায় আছে। যে যন্ত্র এ কাজে ব্যবহার করা হয় তার নাম হাইগ্রোমিটার। এখানে বলে রাখা ভাল যে, বায়ুমণ্ডলের তাপ, চাপ এবং জলীয় বাষ্পের পরিমাণ রীতিমত মাপা হয়ে থাকে। আবহাওয়ার মতিগতি এসব জিনিসের উপরই

নির্ভর করে। এসব ব্যাপার নিয়ে বিজ্ঞানের একটি আলাদা শাখাই গড়ে উঠেছে, নাম—আবহাওয়া বিজ্ঞান। কখন ঝড় হবে, কখন বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা, কখন পড়বে কন্‌কনে ঠাণ্ডা—এ ধরনের সব খবর সরবরাহ করাই হল আবহাওয়াবিদের কাজ।

যান্ত্রিক সুবিধে

একটা ভারি জিনিস টেনে নিতে কতই না অসুবিধে! দেয়ালের কাছের আলমারিটার কথা মনে আছে তো? তোমরা বলপ্রয়োগ



বলপ্রয়োগ করেই আলমারিটা সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল

করেই সেটা সরিয়ে দিয়েছিলে। কিন্তু এই জিনিসটির সঙ্গে যদি দুটি চাকার ব্যবস্থা করা যায় বা কোনমতে ঠেলে একটা চাকাওয়ালা গাড়িতে তোলা যায় তবে তা বয়ে নিয়ে যাওয়া কতই না সহজ! আমরা বলতে পারি, চাকা এখানে কাজটিকে সহজ করে দিয়েছে। ভারি জিনিস সহজে সরানোর জন্যে চাকার সাহায্য না নিলেও চলে। সামান্য একখানা মোটা

বাঁশের লাঠি নিয়ে তার এক মাথা ভারি জিনিসটির তলার দিকে প্রবেশ করিয়ে দাও। তারপর হাত দিয়ে লাঠির অন্য মাথায় উপরের দিক থেকে চাপ দাও। দেখবে ভারি জিনিসটি অনায়াসেই সরিয়ে দেওয়া যাচ্ছে। এখানেও লাঠিখানা ভারি জিনিসটিকে সরিয়ে দেওয়ার কাজটা সহজ করে দিয়েছে। বিজ্ঞানের ভাষায় বললে আমরা বলতে পারি যে, উভয় ক্ষেত্রেই আমরা যান্ত্রিক সুবিধে পেয়েছি। লাঠিখানা বা চাকা যন্ত্রের কাজ করেছে।

তাহলে যন্ত্র কাকে বলে? যান্ত্রিক সুবিধেই বা কী জিনিস? শোন।

অনেকের ধারণা, যন্ত্র বলতে বোঝা যাবে বহু জটিল সব অংশ একত্র করে কিম্ভূতকিমাকার এক বিরাট জিনিস। কত তার অংশ: এর কোনটা ঘুরবে, কোনটা নড়বে, আরও কত কী! বিজ্ঞানী কিন্তু অত সব জটিলতার ভিতর যাবেন না। তাঁর মতে, সামান্য একটা হাতুড়ি বা একটা স্ক্রু-ড্রাইভারও যন্ত্র। এরও আছে কোন জটিল কাজকে সহজ করার ক্ষমতা। কাজেই বলা যায়, কোন কাজকে সহজ করা যায় যে জিনিসের সাহায্যে তাকেই বলে যন্ত্র। আর এর সাহায্যে কোন কাজকে যতটা সহজ করা যায় তাকে বলা হয় যান্ত্রিক সুবিধে।

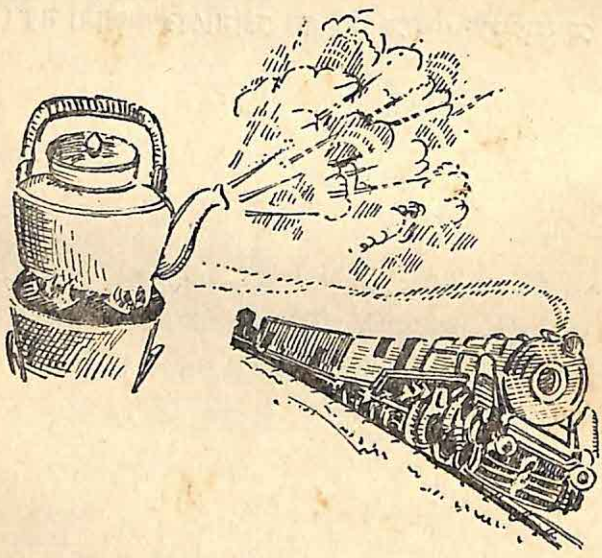
একটা টাইপরাইটারের কথাই ধরা যাক না। এও একটি যন্ত্র। এর বিভিন্ন অংশ তৈরি হয়েছে অতি সাধারণ এবং সহজ কতকগুলো যন্ত্র দিয়ে। এ ধরনের যন্ত্রের কথাই আমরা আগে বলেছি। সত্যি কথা বলতে গেলে বলা যায় যে, ছটি বিভিন্ন রকমের সহজ যন্ত্র আছে যার সাহায্য নিয়েই যে-কোন যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে—সে যন্ত্র যতই জটিল হোক না কেন। রেলের এঞ্জিনই বল বা উড়োজাহাজের এঞ্জিনই বল, সবই তৈরি হয়েছে এই ছয় রকম যন্ত্র দিয়ে। এরা হল, লিভার, বাঁকানো নল, খুঁটি, স্ক্রু, চাকা আর কপিকল। এর যে-কোন একটি দিয়েই বেশ

খানিকটা যান্ত্রিক সুবিধে পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য সব সময়েই যে যান্ত্রিক সুবিধে পাওয়া যাবে তা নয়। কখনো-কখনো আমাদের যান্ত্রিক অসুবিধেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ছুরি, চিমটে প্রভৃতি দিয়ে আমরা কাজ পাই। কিন্তু যে পরিমাণ শক্তি আমরা ব্যয় করি কাজ পাই তার চেয়ে কম। কাজেই এ-সব যন্ত্রের যান্ত্রিক সুবিধে নেই। হাতুড়ি, কোদাল, গাঁইতি, কাঁচি, বেলচা, দাঁড়িপাল্লা, ঢেঁকি, জাঁতি, নলকূপের পাম্প প্রভৃতি সবই যন্ত্র ; এদের দিয়ে কাজ করতে গেলে কাজের সুবিধে ছাড়া অসুবিধে হয় না। কপিকল, স্ক্রু, চাকা প্রভৃতি দিয়ে আমরা কাজকে যে কত সহজ করে নিই তা তোমাদের অজানা নয়।

তাপের কথা

তাপ আসলে কী

আমরা আগেই বলেছি, তাপ একপ্রকার শক্তি। তাপশক্তি দিয়ে আমরা নানা কাজ করে নিতে পারি। কয়লা পোড়ালে আমরা তাপ পাই। এ তাপ দিয়ে জল ফুটিয়ে তা বাষ্পে পরিণত করা যেতে পারে। বাষ্পের সাহায্যে স্টীম এঞ্জিন



তাপে জল বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্পের জোরে রেলগাড়ির এঞ্জিন টেনে চলে বিরাট গাড়িটা

চলে। বিরাট একটা রেলগাড়িকে কত সহজেই না টেনে নিয়ে যায় স্টীম এঞ্জিন। এঞ্জিন যখন চলছে তখন তা নিশ্চয়ই কাজ করছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, তাপের মধ্যে যে শক্তি আছে তা দিয়েই রেলগাড়ি চলে।

কাইনেটিক আর পোটেনশিয়াল এনার্জির কথা আমরা আগেই বলেছি। তাপশক্তিটা আসলে কী? কাইনেটিক, না পোটেনশিয়াল? বিজ্ঞানীরা বলেন, তাপশক্তি আসলে কাইনেটিক এনার্জি বা গতিশক্তি। কিন্তু তাপের মধ্যে এ ধরনের শক্তির আবির্ভাব ঘটে কিভাবে? শোন সে কথা।

আমরা জানি, পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশের নাম অণু বা মলিকিউল। লোহার একটা তারের কথাই ধরা যাক। লোহার তার তৈরি হয়েছে লক্ষ-লক্ষ লোহার অণু দিয়ে। লোহার ধর্ম বা গুণ মানেই হল, এই অণুগুলোর ধর্ম বা গুণ। এক অণু জলের ধর্ম আর এক চৌবাচ্চা জলের ধর্ম একই। পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসই ঠিক এইভাবে অতি ক্ষুদ্র সব অণু দিয়ে গঠিত। অবশ্য অণুরও ক্ষুদ্র অংশ আছে; অণু গঠিত হয়েছে পরমাণুর সমষ্টি দিয়ে। আবার পরমাণু ভেঙে পাওয়া যায় ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি। কিন্তু সে সব কথা এখন থাক।

আমরা বলছিলাম অণু বা মলিকিউলের কথা। পদার্থের মধ্যে অণুরা আছে কী ভাবে? চুপচাপ বসে? তা কিন্তু মোটেই নয়। পদার্থের মধ্যে অণুগুলো অনবরতই ছটফট করছে—এর গায়ে সে পড়ছে—লাগাচ্ছে ধাক্কাধাক্কি। আবার আমাদের জানা আছে, কেউ চলাফেরা করলেই সে গতিশক্তি বা কাইনেটিক এনার্জির অধিকারী হয়। পদার্থের মধ্যে তার অণুগুলোর এই যে গতি, এই গতির জন্যে তার ভিতরকার অণুগুলোর গতিশক্তিই হল আসলে তাপ বা তাপশক্তি। যখন কোন পদার্থ ঠাণ্ডা থাকে তখন তার ভিতরকার অণুগুলো খানিকটা ধীরে ধীরে চলাফেরা করে। কিন্তু যখনই তার উষ্ণতা বাড়তে থাকে, অণুগুলোর ছটফটানিও অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। ফলে এদের গতিশক্তিও বাড়ে। কিন্তু এমনিভাবে যদি অণুগুলোর গতিবেগ বাড়তেই থাকে তখন কী হবে? গতিবেগ বেড়ে যাওয়া মানে হল তাপ

বেড়ে যাওয়া। কাজেই পদার্থের তাপ যাবে অসম্ভব রকম বেড়ে। এর ফলে কঠিন পদার্থ গলে তরল হবে, আবার তরল পদার্থ পরিণত হবে বাষ্পে। সোজা কথায় আমরা বলতে পারি, পদার্থের অণুগুলোর গতিবেগ কঠিন অবস্থার চেয়ে তরল অবস্থায় বেশি, আবার গ্যাসের ভিতরে আরও বেশি।

তাপ আসে কোত্থেকে

সূর্য থেকে আমরা প্রচুর তাপ পাই। সূর্যের তাপই এ পৃথিবীতে প্রাণীজগতকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমরা আগে বলছি, যেকোন ধরনের শক্তির রূপান্তর ঘটানো চলে। সরু একটা লোহার বা তামার তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালানো হল। দেখা যাবে, তারটা বেশ গরম হয়ে উঠেছে। এখানে বিদ্যুৎশক্তিই তাপশক্তিতে পরিণত হয়েছে। কয়লা পোড়ানো হল। কয়লার মধ্যে যে কার্বন আছে তা বায়ুর ভিতরকার অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক উপায়ে মিলিত হল। উৎপন্ন হল তাপ। হাতে হাত ঘষে দেখ। দেখবে হাতটা গরম হয়ে উঠেছে। এমনি কত-শত ভাবেই না তাপের সৃষ্টি হচ্ছে অনবরত!

তাপের একটা প্রধান গুণ হচ্ছে যে, তাপ কখনো এক জায়গায় চুপচাপ থাকতে পারে না। অনবরত তাপ চলাফেরা করছে। তাপকে এক জায়গায় ধরে রাখবার জো নেই। কাজেই মানুষ তাপের এই অদ্ভুত গুণটিকে নিজেদের সুখ-সুবিধের কাজে লাগিয়েছে নানাভাবে। যেখানে তাপের প্রাচুর্য সেখান থেকে তা সরিয়ে নিয়ে যেখানে তাপের ঘাটতি আছে সেখানেই তা কাজে লাগানো হচ্ছে। ঠাণ্ডা দেশে ঘরবাড়ি গরম করার কাজে লাগানো হচ্ছে তাপ। আবার গরম দেশের ঘরবাড়ি ঠাণ্ডা করার জন্যে তাপ সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি যে তাপ-নিয়ন্ত্রক বা এয়ার কণ্ডিশনড্ ঘরবাড়ির কথা বলছি তা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ।

আমরা গরমের দিনে পাতলা কাপড় জামা ব্যবহার করি। কারণ কী? না, শরীরের উত্তাপটা যাতে সহজেই বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া গায়ের উপর যাতে হাওয়া খেলে একটু আরাম দিতে পারে তারই ব্যবস্থা আর-কি। আবার, শীতের দিনে আমরা পশমের জামা প্যাণ্ট ব্যবহার করি। পশমের জামা প্যাণ্টের তাপ আটকে রাখার ক্ষমতা আছে। শীতের দিনে আমাদের শরীরের গরমটা যাতে সহজে বাইরে বেরিয়ে যেতে না পারে তারই জন্যে এ ব্যবস্থা। তাপের এই যে যাযাবর বৃত্তি, একে যে আমরা কত রকম কাজে লাগিয়েছি তা বলে শেষ করা যায় না। ইস্পাতের কারখানাই বল, প্ল্যাস্টিকের কারখানাই বল বা কোন রাসায়নিক শিল্পের কারখানাই বল, সর্বত্রই আমরা তাপের এই বিশেষ গুণটির সুযোগ নিয়েছি।

তাপ চলে কিভাবে

তাপের এই যে গমনাগমন, এ কাজটি ঘটে তিন রকমে। বিজ্ঞানের ভাষায় এদের বলা হয় কণ্ডাকশন, কনভেকশন আর র‍্যাডিয়েশন। বাংলা করে বললে বলা যায়, পরিবহন, পরিচলন আর বিকিরণ।

একটা কঠিন পদার্থের এক অংশ গরম করলে সেখানকার অণুদের গতিবেগ বেড়ে যায়। অণুদের এই বাড়তি ছটফটানির ধাক্কায় এদের কাছাকাছি অণুদেরও ছটফটানি বাড়ে। এমনিভাবে একসময় দেখা যাবে যে, পদার্থটির সর্বত্রই অণুরা বড় বেশি রকমের চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমরা বলি, সমস্ত জিনিসটিই বেশ গরম হয়ে উঠেছে। কোন পদার্থের এক অংশে তাপ দিলে তা যেভাবে পদার্থের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে তাকেই বলে তাপের কণ্ডাকশন বা পরিবহন।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, কোন-কোন জিনিসের তাপ-পরিবহন-ক্ষমতা বেশ বেশি। অর্থাৎ পদার্থের এক অংশ গরম করলে

খুব সামান্য সময়ের মধ্যেই সমস্ত জিনিসটিই বেশ গরম হয়ে উঠে। আবার এমন অনেক জিনিস আছে যার পরিবহন-ক্ষমতা বেশ কম। একটা তামার রড আর একটা কাচের রডের কথাই ধর না। একই আকারের দুটো রড নিয়ে তাদের এক মাথা উনুনে প্রবেশ করালে দেখবে যে, একটু পরেই তামার রডটি আর হাতে ধরে রাখা যাচ্ছে না, কিন্তু কাচের রডটি অনায়াসেই ধরে রাখা যাচ্ছে। আমরা বলতে পারি, তামার পরিবহন ক্ষমতা বেশি, আর কাচের কম। সাধারণত কঠিন পদার্থ তরল পদার্থের চেয়ে তাপ পরিবহনের ব্যাপারে বেশি কার্যকরী; আবার তেমনি গ্যাসের চেয়ে তরল পদার্থের পরিবহন-ক্ষমতা বেশি। বায়ুর তাপ পরিবহন-ক্ষমতা খুবই কম। জলেরও তাপ পরিবহন করবার ক্ষমতা খুবই কম। রুপোর তাপ-পরিবহন-ক্ষমতা যতটা জলের ক্ষমতা তার ৬৫০ ভাগের এক ভাগ। কাঠের গুঁড়ো, পশম, ফেল্ট, কর্ক প্রভৃতির তাপ-পরিবহন-ক্ষমতা যে খুব কম তার মূলে রয়েছে অবশ্য বায়ু। পশম বা কাঠের গুঁড়োর ফাঁকে ফাঁকে অল্পসল্প বায়ু রয়েছে আটকা পড়ে। বায়ুর তাপ-পরিবহন-ক্ষমতা কম বলে এসব জিনিসেরও পরিবহন-ক্ষমতা কম। বাজার থেকে বরফ কিনে আনবার সময় দোকানি কেন কাঠের গুঁড়ো দিয়ে জড়িয়ে দেয় বরফখণ্ডকে তা আশা করি বুঝে নিয়েছ তোমরা। তাপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরের কাচের জানলা দুই পর্দা কাচ দিয়ে ঢেকে রাখার রেওয়াজ আছে। কারণটা হল এই যে, দুই পর্দা কাচের মধ্যে কিছুটা বায়ু আটকা রয়েছে, যার ফলে বাইরের তাপ ভিতরে আসতে পারে না, আবার ভিতরের ঠাণ্ডাটা বাইরে যেতে পারে না। অথচ বাইরের আলো অনায়াসে ভিতরে আসতে পারে।

যে সব জিনিস তাপের বেশ ভাল পরিবাহক সেগুলো খুব সহজেই যেমন গরম হয় তেমনি আবার সহজেই ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে। শীতের রাতে একটুকরো লোহা আর এক টুকরো কাঠ খোলা ছাতে ফেলে রাখা হল। সকালবেলা হাত দিলে দেখা যাবে যে, লোহার

টুকরোটি বেশ ঠাণ্ডা, আর কাঠের টুকরোটি তেমন ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে না। এমনিভাবে যদি ও-ছুটি জিনিসকে রোদে ফেলে রাখা যায় তবে লোহার টুকরোটি গরম হবে বেশি, কাঠের টুকরোটি হবে কম। ঠাণ্ডা লোহায় যখন হাত দেওয়া হল তখন হাত থেকে কিছুটা তাপ খুব তাড়াতাড়ি লোহার মধ্যে চলে গেল, কারণ লোহা তো তাপের ভাল পরিবাহক। কাজেই হাতটায় বেশ ঠাণ্ডা ভাব লাগবে। কিন্তু কাঠের বেলায় দেখা যায় যে, হাত থেকে আস্তে আস্তে তাপ চলে যাচ্ছে কাঠের দিকে, কারণ কাঠ তাপের ভাল পরিবাহক নয়। ফলে কাঠটা তেমন ঠাণ্ডা মনে হবে না।

তাপের পরিচলন বা কনভেকশন

তাপের পরিবহনের বেলা একটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতে তাপ চলে যেতে পারে সেজন্যে যে-কোন একটি মাধ্যমের প্রয়োজন হয়েছে। তামার রডের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় তাপ গিয়েছিল রডের সাহায্য নিয়েই। আমরা বলতে পারি, রডটি এখানে মাধ্যমের কাজ করেছে। অর্থাৎ তাপকে রডের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় চলে যেতে সাহায্য করেছে। কিন্তু তাপ পরিচলনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটে অন্য রকম।

একটা হাঁড়িতে জল নিয়ে উনুনের উপর তা চাপিয়ে দেওয়া হল। দেখতে দেখতে জলটা গরম হয়ে উঠল। কিভাবে গরম হল জলটা? প্রথমে উনুনের তাপে হাঁড়ির তলার দিকটা গরম হল। সে গরম থেকে সেখানকার জলটাও গরম পেয়ে গরম হয়ে উঠল। কোন জিনিস তাপ পেলে তা হালকা হয়। এখানে হাঁড়ির তলাকার গরম জলটা তাই হালকা হল। হালকা জিনিস আবার সব সময় উপরে উঠে যায়। ফলে এই গরম এবং হালকা জলটা হাঁড়ির তলা ছেড়ে উপরে উঠে গেল। জলটা উঠে যাওয়ার দরুন যে ফাঁকা জায়গাটা হল সেটা ভর্তি হয়ে গেল পাশ থেকে আসা ঠাণ্ডা জল দিয়ে। এ জলটা আবার

গরম হল, হল হালকা, উঠে গেল উপরে—হাঁড়ির পাশের জল নেমে এল নিচে। এমনিভাবে হাঁড়ির সব জলটা গরম হয়ে উঠল। যে-ভাবে হাঁড়ির জলটা গরম হয়েছে তাকেই বলে তাপের পরিচলন। জলটা উপরে নিচে ওঠা-নামা করবার জন্যে যে স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে তাকে বলে পরিচলন-স্রোত বা কনভেকশন কারেন্ট।

নানা কারণে বায়ুর মধ্যে এ-জাতীয় পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কোন জায়গায় আগুন লাগলে আগুনের চারদিকে যেন ঝড় বইতে শুরু হয়েছে মনে হয়। কারণ আর কিছুই নয়—ঐ কনভেকশন কারেন্ট। যেখানটায় আগুন লেগেছে সেখানকার চারদিকের বায়ু গরম হয়ে ওঠে। তারপর সে বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। আর ঐ ফাঁকা জায়গাটা ভরাট করবার জন্যে চারদিক থেকে ঠাণ্ডা বায়ু ছুটে আসে। মনে হয়, যেন ঝড় বইছে। আসলে প্রকৃত ঝড়ের কারণও এই। হঠাৎ কোন কারণে যদি কোন জায়গার বায়ু বেশ গরম হয়ে ওঠে তবে তা হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। আর ঐ ফাঁকা জায়গাটার দিকে চারদিককার বায়ু ছুটে আসে। একেই আমরা বলি ঝড়।

সমুদ্রের মধ্যে রয়েছে নানারকম স্রোত। এ সব স্রোতও ঐ পরিচলন স্রোতেরই ফল ছাড়া আর কিছুই নয়।

পরিচলনের বেলাও দেখা গেল যে, কোন মাধ্যমের সাহায্য নিয়েই তাপ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাফেরা করে। এক্ষেত্রে মাধ্যমটি নিজেই তাপকে বহন করে নিয়ে যায়। পরিবহনের বেলা অবশ্য মাধ্যমটি নিজে চলে না, তাপকে চালিয়ে নিতে সাহায্য করে মাত্র।

বিকিরণ বা র‍্যাডিয়েশন

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। ঘরের ছায়ায় ভাল লাগে না। রোদে গিয়ে দাঁড়ালে কেমন হয়? বেশ আরাম লাগে না কি? আরাম

লাগা এক্ষেত্রে মানে বেশ গরম লাগা। এ গরমটা কোত্থেকে এসেছে? না, সূর্য থেকে। আমরা আগেই বলেছি, পরিবহন বা পরিচলন পদ্ধতিতে তাপ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই আমরা মনে করব যে, সূর্য থেকে এ তাপ আমাদের কাছে এসেছে হয় পরিবহন উপায়ে, নয় পরিচলন উপায়ে। কিন্তু এখানে যে একটা অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে! সূর্য আর পৃথিবী, এদের মধ্যে ব্যবধান যে লক্ষ লক্ষ মাইলের। আর এ ব্যবধানের অধিকাংশ স্থানই একেবারে ফাঁকা, সামান্য একটু বায়ুও নেই। যাকে বিজ্ঞানীরা বলেন ভ্যাকুয়াম, একেবারে তাই আর কি! কাজেই এহেন মহাশূন্য বা ভ্যাকুয়ামের ভিতর দিয়ে তাপ আমাদের কাছে আসে কিভাবে? তবে কোন মাধ্যম যখন নেই তখন পরিবহন বা পরিচলন ক্রিয়ার সাহায্য নিয়ে তাপ যে আসবে তার সম্ভাবনা একদম নেই এখানে।

বিজ্ঞানী বলেন, বিকিরণ প্রণালীতেই সূর্য থেকে তাপ আসে আমাদের এ পৃথিবীতে। এভাবে তাপ চলাচলের জন্যে পরিবহন বা পরিচলনের মত কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নেই।

অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা বিকিরণ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আমাদের জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, প্রতি জিনিস থেকেই তাপ বিকিরণ হয়ে থাকে। তবে, পদার্থের উষ্ণতা যত বেশি হবে বিকিরণ ক্ষমতাও হবে তত বেশি।

সূর্য আর আমাদের পৃথিবীর মধ্যে যে বিরাট দূরত্ব তার বেশির ভাগই যে একদম ফাঁকা সেকথা আগেই বলেছি। বিজ্ঞানীরা অবশ্য বলেন যে, বিশ্বপ্রকৃতির কোন অংশই ফাঁকা থাকতে পারে না। এর সর্বত্র বিরাজ করছে একটি মাধ্যম; তাঁরা এর নাম দিয়েছেন ইথার। যেখানটা একেবারে ফাঁকা অর্থাৎ যেখানে সামান্যতম বায়ুও নেই (যাকে আমরা বলি ভ্যাকুয়াম) সেখানেও কিন্তু ইথার আছে। ইথার জিনিসটি যে কী তা বলে বোঝানো একটু শক্ত বই কি! এ

আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু এ যে আছে, এ-কথার প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। এই যে ইথার এর মধ্যে কতগুলো ঢেউয়ের সৃষ্টি হলেই আমরা পাই বিকিরণ। সূর্য থেকে যখন তাপ আসে আমাদের কাছে তখন ব্যাপারটা কী ঘটে দেখা যাক। সূর্যের ভিতরে অনবরত যে কাণ্ডকারখানা ঘটছে তার ফলে সূর্যের চারদিককার ইথার-সমুদ্রে ঢেউয়ের সৃষ্টি হল। এ ঢেউগুলো ইথারের মধ্য দিয়ে তাপকে নিয়ে এল আমাদের কাছে। আমরা তাপ অনুভব করলাম। ইথারের ঢেউ দিয়ে বিকীর্ণ তাপই যে শুধু সৃষ্টি হয়েছে তা নয়। আলোও আসলে ইথারের ঢেউ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া তোমরা এক্স-রে, গামা-রে, আলট্রা-ভায়োলেট রে, রেডিও-তরঙ্গ প্রভৃতির নাম শুনে থাকবে। এ সবও ঐ ইথারের মধ্যেকার ঢেউ মাত্র। তোমরা প্রশ্ন করতে পার—তবে পার্থক্যটা কোনখানে? ঢেউয়ের আকার বড় কি ছোট তাই দিয়েই আমরা ঠিক করে নিই যে, এ ঢেউ দিয়ে এক্স-রে তৈরি হবে, না রেডিও-তরঙ্গ তৈরি হবে। শুদ্ধ ভাষায় বলতে গেলে বলতে পারি—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যই হল আসল ব্যাপার। দেখা গেছে, এক্স-রের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ১ ইঞ্চির আড়াই কোটি ভাগের এক ভাগ। আবার রেডিও-তরঙ্গ এক একটি দৈর্ঘ্যে হয় কয়েক মাইল।

বলছিলাম বিকিরণ-ক্রিয়ার কথা। আমরা দেখলাম, বিকিরণ ক্রিয়া আর আলো—এর মধ্যে আসলে কোন পার্থক্যই নেই। তবে, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে পার্থক্য থাকবার জন্যে বিকিরণ আর আলোর মধ্যে গুণের কিছুটা পার্থক্য থাকবে বৈকি। যেমন ধর, কাচ। কাচের ভিতর দিয়ে আলো অতি সহজেই চলে যেতে পারে, কিন্তু বিকিরণকে কাচ আটকে দেয়। আবার দেখ, আয়োডিনের দ্রবণের ভিতর দিয়ে বিকিরণ চলে যায় অনায়াসে, অথচ এর ভিতর দিয়ে আলো চলে যেতে পারে না। সহজেই বুঝতে পারছ যে, এর কারণ আর কিছুই নয়—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পার্থক্য আর কি।

কোন জিনিসের উপর বিকীর্ণ তাপ পড়লে তার কতকটা প্রতিফলিত হয়ে চলে যায়, কিছুটা আবার জিনিসটির ভিতর দিয়েই অবাধে বেরিয়ে যায় এবং বাকিটা জিনিসটি শোষণ করে নেয়। এর ফলেই জিনিসটি গরম হয়ে ওঠে। যে জিনিসের উপর বিকীর্ণ তাপ পড়ছে তা যদি বেশ মসৃণ হয় তবে অধিকাংশ তাপই প্রতিফলিত হয়ে বাইরে চলে যায়। আর অতি সামান্য অংশই শোষণ করতে পারে জিনিসটি। ফলে জিনিসটি গরম হয় আস্তে আস্তে। আবার, যদি জিনিসটি হয় এবড়ো-থেবড়ো তবে বিকীর্ণ তাপের অধিকাংশই সে শোষণ করে নিতে পারে। তাই জিনিসটি বেশ তাড়াতাড়িই গরম হয়ে ওঠে। কোন্ জিনিসের কী রঙ তার উপরও বিকীর্ণ তাপের কার্যকলাপ বেশ কিছুটা নির্ভর করে থাকে। কোন ঘন রঙ বা কালো রঙের জিনিসের তাপ শোষণ করবার ক্ষমতা বেশ বেশি। আবার সাদা বা হালকা রঙের জিনিস তাপ শোষণ করে কম। শীতের দিনে ঘন বা কালো রঙের কাপড় চোপড় ব্যবহারের কারণটা আশা করি এবারে তোমরা সহজেই বুঝতে পারছ।

থার্মোফ্লাস্কের কথা

তাপের যাযাবর বৃত্তির সম্বন্ধে তোমরা শুনলে। এবারে খুব সহজ একটি জিনিসের কথা বলছি যা তৈরি করতে গিয়ে তাপের পরিচলন, পরিবহন আর বিকিরণ—এ তিনটি পদ্ধতিরই সাহায্য নেওয়া হয়েছে। বলছি থার্মোফ্লাস্কের কথা। দু-পর্দা কাচ দিয়ে তৈরি থার্মোফ্লাস্ক। দুটি পর্দার মাঝখানে যে বায়ু আছে তা সেখান থেকে পাম্প করে বের করে নেওয়া হয়েছে। কাজেই থার্মোফ্লাস্কে কোন গরম জিনিস রাখলে তা গরম থাকে। কারণ আমরা দেখেছি, তাপ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালিয়ে যেতে পারে তিন রকম

ভাবে। এর মধ্যে পরিবহন আর পরিচলন ক্রিয়ার জন্যে যে-কোন একটি মাধ্যমের প্রয়োজন। আবার, খুব মসৃণ কোন জিনিস থেকে বিকিরণ ক্রিয়া ঘটে খুবই কম। থার্মোফ্লাস্কের ভিতর আর বাইরের মধ্যে কোন মাধ্যমের যোগাযোগ নেই। ফলে পরিচলন এবং পরিবহন ক্রিয়া ঘটতে পারে না। আবার কাচ বেশ মসৃণ জিনিস। থার্মোফ্লাস্ক কাচের তৈরি। ফলে বিকিরণ ক্রিয়ার সাহায্য নিয়ে থার্মোফ্লাস্ক থেকে যে তাপ পালাবে তারও জো নেই। এর ফলে থার্মোফ্লাস্কের গরম জিনিস বেশ গরমই থাকবে। দরকার পড়লে ঠাণ্ডা জিনিসও বেশ ঠাণ্ডা রাখা যায় থার্মোফ্লাস্কে।



থার্মোফ্লাস্ক

উষ্ণতা বলতে আমরা কী বুঝি

তাপের কথা বলতে গিয়ে উষ্ণতার কথা না বলে পারা যায় না। আমরা এর আগে দু-এক জায়গায় উষ্ণতা কথাটির উল্লেখও করেছি। তাপ হল শক্তি ; কিন্তু উষ্ণতা ? উষ্ণতা হল, তাপ দিলে কোন পদার্থের ভিতরে যে তাপের পরিবর্তন ঘটে তা। কোন জিনিসের

উষ্ণতার উল্লেখ করলে আমরা বুঝতে পারি,—এই পদার্থটি থেকে তাপ অন্য পদার্থে যাবে, না, অন্য পদার্থ থেকে তাপ আসবে ঐ পদার্থে। একটি সাধারণ উদাহরণ নিলে মন্দ হয় না।

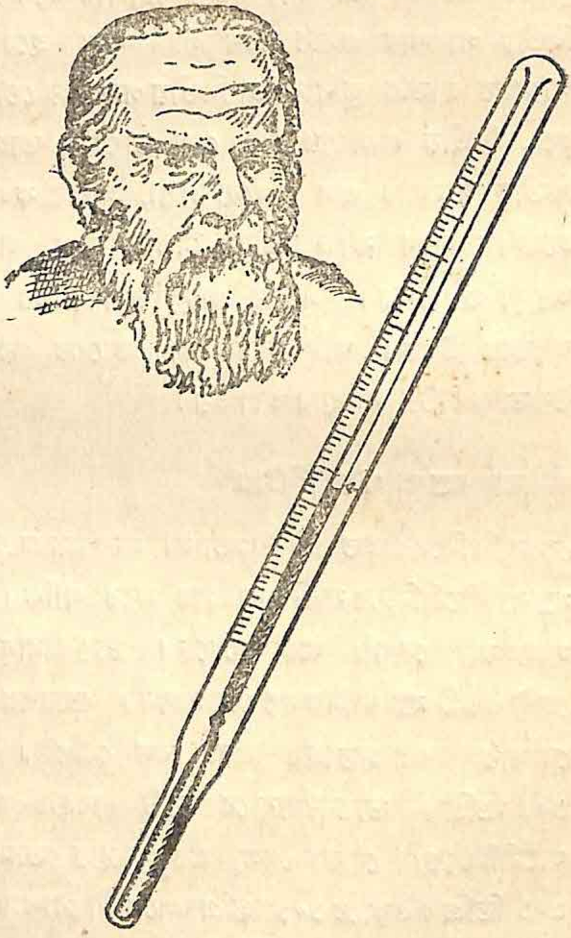
তিনটি গামলায় তিন গামলা জল নেওয়া হল। প্রথম গামলার জল ঠাণ্ডা, দ্বিতীয় গামলার জল সামান্য গরম, আর তৃতীয় গামলার জল বেশ গরম। এবারে প্রথম গামলার জলে হাত ডুবিয়ে তারপর তা যদি দ্বিতীয় গামলার জলে ডোবানো যায় তবে দ্বিতীয় গামলার জলটা বেশ গরম মনে হবে। এরপর তৃতীয় গামলায় হাতটা ডুবিয়ে তা দ্বিতীয় গামলায় ডোবানো হল। মনে হবে, দ্বিতীয় গামলার জল বেশ ঠাণ্ডা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় গামলার জল কখনো ঠাণ্ডা, আবার কখনো গরম বলে মনে হচ্ছে। কারণ কী? এটা নির্ভর করে আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির উপর। আবার অনুভূতিটা নির্ভর করে চারদিককার অবস্থার উপর। তাই সঠিকভাবে তাপের অবস্থা বোঝবার জন্যে উষ্ণতা কথাটির ব্যবহার করা হয়।

তাপমান যন্ত্র বা থার্মোমিটার

কোন জিনিসের কতখানি উষ্ণতা তা মাপবার জন্যে আমরা তাপমান-যন্ত্র বা থার্মোমিটার যন্ত্রটির ব্যবহার করে থাকি। যন্ত্রটি তোমাদের সকলেরই দেখা। জ্বর হয়েছে। ডাক্তারবাবু তোমার বগলে ছোট্ট একটি যন্ত্র খানিকক্ষণ রেখে দেন। তারপর তা দেখেই বলেন, তোমার জ্বর হয়েছে। জ্বরটা বেশ বেশিই। কত জ্বর? না—১০১ ডিগ্রি। ডাক্তারবাবু যে যন্ত্রটি ব্যবহার করলেন তা একটি থার্মোমিটার। বোঝা গেল, জ্বর অবস্থায় তোমার শরীরের উষ্ণতা ১০১ ডিগ্রি। এবারে ১০১ ডিগ্রি বলতে কী বোঝায় দেখা যাক। উষ্ণতা মাপবার জন্যে কোন একটি জিনিসের উষ্ণতাকে মাপকাঠি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। তারপর অন্যান্য জিনিসের উষ্ণতা একটি তুলনা-

মূলক সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করাই রীতি। যেমন, বরফ এবং ফুটন্ত জলের উষ্ণতাই মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয় উষ্ণতা মাপবার ক্ষেত্রে। সাধারণত আবার এ কাজে দু-রকম মাপকাঠির প্রচলন আছে। একটিকে বলা হয় সেন্টিগ্রেড পদ্ধতি, অন্যটির নাম ফারেনহিট পদ্ধতি। সেন্টিগ্রেড পদ্ধতিতে বরফের উষ্ণতাকে ধরা হয় ০ ডিগ্রি আর ফুটন্ত জলের উষ্ণতা ১০০ ডিগ্রি। ফারেনহিটের বেলা বরফের উষ্ণতাকে ধরা হয় ৩২ ডিগ্রি, আর ফুটন্ত জলের উষ্ণতাকে ২১২ ডিগ্রি। তোমার জ্বরের বেলা যে ১০১ ডিগ্রির কথা বলেছিলাম তা হল ফারেনহিট পদ্ধতির মাপ। যদি বরফের উত্তাপ হয় ৩২ ডিগ্রি তবে জ্বর অবস্থায় তোমার শরীরের উষ্ণতা হয়েছিল ১০১ ডিগ্রি আর কি।

অন্যান্য বহু আবিষ্কারের সঙ্গে এই তাপমানযন্ত্রও আবিষ্কার করেছেন



প্রথম তাপমান যন্ত্র তৈরি করেন গ্যালিলিও

গ্যালিলিও। সাধারণ তাপমান যন্ত্র কাচের তৈরি সরু নল ছাড়া অন্য কিছুই নয়। ভিতরে ব্যবহার করা হয় পারদ বা পারা।

তাপ কী করে মাপা হয়

কোন পদার্থে তাপ দিলে তার উষ্ণতা বাড়ে। উষ্ণতা মাপবার কথা বললাম। কিন্তু তাপ মাপবার উপায় কি? তাপ মাপবার জন্যেও নানারকম মাপকাঠির ব্যবহার করা হয়। একক ও নানা ধরনের। এর মধ্যে একটির নাম ক্যালোরি। ১ গ্রাম জলের উষ্ণতা যদি ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়ানো যায় তবে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হবে তাকেই বলা হয় ১ ক্যালোরি। কোন্ জিনিসের মধ্যে কী পরিমাণ তাপশক্তি রয়েছে তা আমরা ক্যালোরি কথাটি দিয়েই প্রকাশ করতে পারি।

এখানে আরও একটি কথা বলে রাখা ভাল। তাপের পরিমাণ আর কোন পদার্থের উষ্ণতার মধ্যে যে পার্থক্যটুকু তা একটু ভাল করে লক্ষ্য রাখতে হবে। কোন জিনিসের উষ্ণতা হয়ত খুব বেশি, কিন্তু এ-কথার মানে এ নয় যে, সে জিনিসটির মধ্যে তাপের পরিমাণও অনেক বেশি হতে হবে। এমনও দেখা যায় যে, দুটি জিনিসের মধ্যে একটির উষ্ণতা হয়ত অন্যটির চেয়ে বেশি; কিন্তু প্রথমটির ভিতরে তাপের পরিমাণ হয়ত দ্বিতীয়টির চেয়ে কম।

তাপ দিলে কোন জিনিসের উষ্ণতা বাড়ে। তেমনি আবার পদার্থের আয়তনও বাড়ে উষ্ণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। তোমরা দু-খানা ট্রেন বা ট্রাম লাইনের মাঝখানে সামান্য একটুখানি ফাঁক লক্ষ্য করে থাকবে। উষ্ণতা বাড়ার সঙ্গে আয়তনে বেড়ে গিয়ে লাইনটা যাতে বেঁকে না যায় তারই জন্যে এ ব্যবস্থা।

তাপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বহু যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয়েছে, আর এ সব যন্ত্র আমাদের নানা কাজে লাগছে, আমাদের সুখ-সুবিধে অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। যেমন ধর, রেলগাড়ি। রেলগাড়ি

যে এঞ্জিনে টানে তার মধ্যে ব্যবস্থা রয়েছে তাপশক্তিকে গতিশক্তিতে পরিণত করবার। কয়লা পুড়িয়ে তাপ মেলে। এ তাপ দিয়ে একটি বয়লারে জল ফোটানো হয়। জল পরিণত হয় বাষ্পে। বাষ্পের কাজ করবার ক্ষমতা রয়েছে প্রচুর। কেটলিতে চায়ের জল ফোটালে দেখা যায় যে, বাষ্প কেমনভাবে কেটলির ঢাকনিটাকে ঠেলে ঠেলে উপরে তুলে দিচ্ছে। প্রমাণ হয়, বাষ্পের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে কাজ করবার ক্ষমতা। বয়লারে তৈরি বাষ্প এবারে গিয়ে প্রবেশ করে একটা মোটা নলের ভিতর। এটি স্টীল বা ইস্পাত দিয়ে তৈরি, নাম সিলিণ্ডার। এর মধ্যে রয়েছে একটি পিস্টন। সিলিণ্ডারের মধ্যে স্টীম ঢুকে পিস্টনটাকে দেয় ধাক্কা, পিস্টন সরে যায় এক ধারে। এবারে আবার স্টীম উল্টো দিক দিয়ে ধাক্কা দেয় পিস্টনকে। পিস্টন চলে অন্যদিকে। এমনিভাবে পিস্টনের এদিক-ওদিক যাতায়াতকে বিশেষ ব্যবস্থা করে দুটি চাকার সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হয়। ফলে চাকা ঘোরে, টেনে নিয়ে যায় বিরাট গাড়িটাকে। অবশ্য রেল-এঞ্জিনের বিবরণ যতটা সহজে এখানে দেওয়া হল তা যে আসলে তা নয় তা বলাই বাহুল্য। স্টীম এঞ্জিনের মধ্যে রয়েছে বহু ছোট বড় অংশ, বহু রকমের ব্যবস্থা।

রামবাবুর গাড়িখানার কথা মনে আছে তো? রামবাবুর বরাত ভাল। গাড়ির মিস্ত্রি গাড়িখানা ভাল করে দিয়েছে। তিনি আরাম করে অফিসে যাচ্ছেন তাঁর সেই গাড়ি চড়েই। গাড়ির এঞ্জিনখানা কি-কি দিয়ে তৈরি সেকথা তখন বলেছি। রেলগাড়িতে কয়লা পুড়িয়ে তাপ মেলে, আর সেই তাপ দিয়েই জল বাষ্পে পরিণত হয়—গাড়ি চলে। রামবাবুর গাড়ির এঞ্জিনখানায় কিন্তু সে সব নেই। এখানে সামান্য একটু পেট্রোল-বাষ্প বায়ুর সঙ্গে মিশিয়ে এঞ্জিনের যে সিলিণ্ডার আছে তার মধ্যে নেওয়া হয়। সেখানে তার আয়তন কমিয়ে দিয়ে উপযুক্ত সময়ে একটি বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ চালিয়ে দেওয়া হয়। ফলে যে ভীষণ তাপের সৃষ্টি হয় তার ফলে

পেট্রোল বাষ্প আর বাষ্পের মিশ্রণ আয়তনে বেড়ে যায় অনেকটা। এর চাপে পিস্টনের উপর ধাক্কা পড়ে। ফলে পিস্টন চলে। পিস্টনের চলাকে উপযুক্ত ব্যবস্থার সাহায্যে চাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। কাজেই এঞ্জিন চালিয়ে দিলে চাকা ঘোরে। রামবাবুকে পৌঁছে দেয় তাঁর অফিসে। এখানেও বলে রাখা ভাল যে, পেট্রোল এঞ্জিনটিও মোটেই এত সহজ নয় যত সহজে তা এখানে বলা হল।

বায়ুমণ্ডলের কথা

পৃথিবীর চারদিকে নানা গ্যাসের যে আবরণটি পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে তাকেই আমরা বলি বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে আগেই উল্লেখ করেছি। বায়ুর মধ্যে রয়েছে প্রধানত দুটি গ্যাস—অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। বায়ুর মধ্যের আর একটি গ্যাসের নাম হল কার্বন ডাই-অক্সাইড। মানুষ বা অন্য জীবজন্তু বায়ুর ভিতরকার অক্সিজেন টেনে নিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায়। এরা ছেড়ে দেয় কার্বন ডাই-অক্সাইড। গাছপালার ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা অন্যভাবে ঘটে, বিশেষভাবে দিনের বেলায়। দিনের বেলা গাছপালা টেনে নেয় কার্বন ডাই-অক্সাইড, আর ছেড়ে দেয় অক্সিজেন। রাতের বেলা অবশ্য গাছপালা মানুষেরই মত অক্সিজেন টেনে নিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দেয়।

মাটি থেকে প্রায় পনের ষোল মাইল উপর পর্যন্ত বায়ুর মধ্যে ওজোন বলে আর একটি গ্যাস দেখা যায়। সূর্যের আলোর মধ্যে মানুষের ক্ষতি করে এ রকম আলোও আছে। বায়ুর ভিতরকার ওজোন গ্যাসটি একটি ফিলটারের কাজ করে। সূর্যের আলোকে বিশুদ্ধ করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সূর্যের ভিতরকার ক্ষতিকারক গ্যাসটির নাম আলট্রা-ভায়োলেট রে। বেশি পরিমাণে এ গ্যাসটি আমাদের ক্ষতি করলেও অল্প-সল্প আলট্রা-ভায়োলেট রে আমাদের বরং উপকারই করে। ওজোন-ফিলটারের ভিতর দিয়ে

যতটুকু আলট্রা-ভায়োলেট রে পৃথিবীতে এসে পেঁছয় তার সাহায্যেই তৈরি হয় ভিটামিন ডি। এ ভিটামিনটির অভাবে রিকেট ব্যাধি হয়।

বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে নানাভাবে রক্ষা করে থাকে। বায়ুমণ্ডল না থাকলে আমাদের গরমও যেমন লাগত অসম্ভব, ঠাণ্ডাও লাগত তেমনি অসহ্য। বায়ুমণ্ডলের কম্বল গায়ে দিয়ে পৃথিবী বেশ আরামেই আছে, একথা আমরা বলতে পারি বই কি। কিন্তু বায়ুমণ্ডল আছে কত উঁচু পর্যন্ত? নানারকমের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা বলেছেন, পৃথিবী থেকে চারশো মাইলের উপরেও খুব সামান্য পরিমাণে বায়ু রয়েছে বর্তমান। বলা বাহুল্য, যত উপরে ওঠা যাবে বায়ুমণ্ডল হবে তত হালকা।

পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর উপরকার আকাশে অনেক সময় অতি চমৎকার আলোর ছটা দেখা যায়। এদের বলা হয় অরোরা। অরোরার মনোমুগ্ধকর আলো দেখলে অবাক হতে হয়। লাল, সবুজ, হলদে, গোলাপি, সবুজ-মেশানো সাদা প্রভৃতি নানা বর্ণের খেলা চলে অরোরার মধ্যে। উত্তর মেরু বা সুমেরু অঞ্চলে যে অরোরা দেখা যায় তার নাম অরোরা বোরিয়ালিস, আর দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু অঞ্চলে যে অরোরা তার নাম অরোরা অস্ট্রালিস।

কাজকর্মের সুবিধের জন্যে বায়ুমণ্ডলকে বিজ্ঞানীরা কয়েকটি ভাগে বা স্তরে ভাগ করে নিয়েছেন। পৃথিবীর পিঠ থেকে শুরু করে ছ-সাত মাইল বিস্তৃত যে স্তরটি তার নাম ট্রোপোস্ফিয়ার। ট্রোপোস্ফিয়ারের মধ্যে যত উপরে ওঠা যাবে ততই বায়ুমণ্ডলের তাপ কমতে থাকে। খানিকটা জায়গায় অবশ্য উত্তাপ একই রকম। এ অঞ্চলটার নাম দেওয়া হয়েছে আইসোথার্মাল লেয়ার। এর উপরে প্রায় পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত যে স্তরটি তার নাম স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। এর পরের স্তবটির নাম আয়নোস্ফিয়ার। এখানে বায়ুর পরিমাণ খুবই সামান্য। আয়ন হল কোন মৌলিক পদার্থের

অ্যাটম বা পরমাণু যার সঙ্গে থাকে একটুখানি বিদ্যুৎ মেশানো। বিজ্ঞানীরা বলেন, আয়নোস্ফিয়ারে যে সামান্য পরিমাণ বায়ু আছে তার ভিতরকার গ্যাসগুলো আছে আয়নের আকারে। গ্যাসের কণিকা আয়নে পরিণত হয়েছে সূর্যের আলট্রা-ভায়োলেট আলোর জন্যেই। আয়নোস্ফিয়ারের যে অংশটা পৃথিবীর ১২০ মাইল থেকে ১৮০ মাইলের মধ্যে রয়েছে তার নাম অ্যাপ্‌ল্‌টন স্তর। আয়নোস্ফিয়ারের উষ্ণতা খুব বেশি। প্রায় দু-হাজার ডিগ্রি ফারেনহিটের মতই হবে।

আলোর কাহিনী

বাইবেলে গল্প আছে যে, ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করার পর দেখলেন পৃথিবী একেবারে অন্ধকার। ব্যাপারটা দেখে ভগবানের ভাল লাগল না। কাজেই তিনি বললেন, পৃথিবীতে আলোর আবির্ভাব হোক। যেই না বলা অমনি পৃথিবী আলোয় ভরে গেল। তাই না দেখে ভগবান তো মহা খুশি। স্থায়ীভাবে পৃথিবীতে আলো দেবার জন্যে তিনি এরপর তৈরি করলেন সূর্য। সেটিকে স্থাপন করলেন আকাশে। সেদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সূর্য আলো জুগিয়ে আসছে জীবজগতকে। রাতের বেলা আলো জোগানোর ভার পড়ল চাঁদের উপর।

দেখা যাচ্ছে, এক কথায় ভগবান আলো তৈরি করে ফেলেছেন। বিজ্ঞানীরা কিন্তু অন্য কথা বলেন। তবে, সূর্য যে যুগ-যুগান্ত ধরে আলো দান করে আসছে পৃথিবীকে, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের দ্বিমত নেই।

প্রথমেই তাহলে দেখা যাক, আলো আসলে কী?

আলো সম্বন্ধে প্রাচীন কালের ধারণা

প্রাচীনকালের পণ্ডিতরা ভাবতেন যে, যে-সব জিনিস থেকে আলো বেরোয় সে-সব জিনিস থেকেই খুব ছোট ছোট কণিকার মত একটা কিছু ছুটে চলে চারদিকে। এ কণিকাগুলো আমাদের চোখে পড়েই আলোর অনুভূতি জাগায়। আর এক দল পণ্ডিত ভাবতেন যে, আমাদের চোখ থেকেই একটা কিছু বেরিয়ে তা যখন অন্য কোন জিনিসের উপর পড়ে তখনই আমরা সে জিনিসটি দেখতে পাই। সেকালের একজন নামকরা দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন অ্যারিস্টটল। তিনিও আলো সম্বন্ধে অনেকটা এ-ধরনের একটি মত প্রকাশ করেছিলেন।

এরপর দীর্ঘদিন কেটে গেল। বিজ্ঞান তার প্রাচীন ভাবধারা পালটে নতুন রূপ নিল। দার্শনিক যুক্তি এবং অন্ধ বিশ্বাসের ঘোর এক সময় কেটে গেল। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় বহু নতুন তথ্যের আবিষ্কার হতে লাগল। আলো-বিজ্ঞানও বাদ গেল না।

গ্যালিলিওর কথা আগেই বলেছি। বহু জিনিসের মধ্যে দূরবীন যন্ত্র আবিষ্কার গ্যালিলিওর একটি অতি মূল্যবান কাজ। রোজার বেকন আবিষ্কার করলেন ম্যাজিক ল্যান্টার্ন। এরপর একে-একে এলেন নিউটন, গ্রিমলডি, স্নেলিয়াস, এবং আরও অনেকে। এ সবই হল ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর কথা।

আলোর গতি আছে

এখন থেকে প্রায় তিনশো বছর আগে দিনেমার দেশে জন্ম নিয়েছিলেন রোমার নামে একজন নামকরা বিজ্ঞানী। আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ হল চাঁদ। চাঁদ আমাদের পৃথিবীর চারদিকে অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৃহস্পতি হল একটি গ্রহ, আমাদের পৃথিবীর মতই। বৃহস্পতির আছে ১২টি চাঁদ। এরা বৃহস্পতির চার-দিকে ঘুরে বেড়ায়। আমাদের চাঁদের যেমন গ্রহণ হয়, এ সব চাঁদেরও তেমনি। একটি শক্তিশালী দূরবীন নিয়ে বৃহস্পতির একটি চাঁদের দিকে লক্ষ্য রাখলেন রোমার। দিনের পর দিন তিনি ঐ চাঁদটির গ্রহণকাল নির্ণয় করতে লাগলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, পর-পর দুটি গ্রহণের মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান তা সব সময় ঠিক থাকে না। সময়টা কখনো বাড়ে, কখনো কমে। বৃহস্পতি আর পৃথিবী যখন কাছাকাছি আসে অর্থাৎ এদের দূরত্ব যখন সবচেয়ে কম তখন এ সময়ের ব্যবধানটা হয় সবচেয়ে কম, আর যখন এরা সবচেয়ে দূরে থাকে তখন সময়ের ব্যবধানটা হয় সবচেয়ে বেশি। এ পরীক্ষা থেকে তিনি প্রমাণ করলেন যে, আলোর একটা গতি আছে। আর এ গতি হল সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।

এ আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা আলো সম্বন্ধে নতুনভাবে চিন্তা শুরু করলেন। আলোর যখন একটা নির্দিষ্ট গতিবেগ আছে তখন আলোর উৎস যেসব পদার্থ নিশ্চয় সেসব পদার্থ থেকেই আলো বেরোয়।

আলো একপ্রকার শক্তি

আগেই বলেছি, আলো একপ্রকার শক্তি। আলো যদি শক্তিই হয় তবে নিশ্চয়ই কাজ করবার ক্ষমতা আছে আলোর। কথাটা ঠিকই। একটি সহজ রাসায়নিক ক্রিয়ার কথাই ধরা যাক। হাইড্রোজেন একটি গ্যাস, এর কোন বর্ণ নেই, নেই গন্ধ। ক্লোরিন আর একটি গ্যাস। এর অবশ্য গন্ধ আছে, বর্ণও হল সবুজে হলুদে মেশানো। এ গ্যাসদুটির মধ্যে একটি রাসায়ানিক ক্রিয়া ঘটলে পাওয়া যায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নামে একটি অ্যাসিড বা অম্ল। সমান-সমান আয়তনের হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন মিশিয়ে যদি তা অন্ধকারে রেখে দেওয়া যায় তবে দেখা যাবে, এদের মধ্যে কোনরূপ ক্রিয়া ঘটছে না। অথচ যেই না ঐ মিশ্রণটি আলোতে নিয়ে আসা হল অমনি ঐ গ্যাস-দুটির মধ্যে একটি রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটল, তৈরি হল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। প্রশ্ন উঠবে, আলোতে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটাবার শক্তি মিশ্রণটি পেল কোথা থেকে? নিশ্চয়ই আলো থেকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আলো একপ্রকার শক্তি, তার আছে কাজ করবার ক্ষমতা।

এখন তাহলে দুটি ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত। এক, আলো একপ্রকার শক্তি, দুই, আলোর একটা নির্দিষ্ট গতিবেগ আছে। তাই যদি হয়, তবে যে-সব পদার্থ থেকে আলো বেরোয় তা থেকে আমাদের চোখে আলো আসে কিভাবে?

ধরা যাক, নদীতে একখানা নৌকো ভাসছে। নদীর জলে কোন স্রোত নেই, বায়ুতে নেই হাওয়ার জোর। ফলে নৌকোখানার এক

জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় কী! ধর, নৌকোয় কোন লোকজনও নেই। পাড় থেকে আমরা নৌকোখানা চালাতে চাই। কী করব? পাড় থেকে অনেকে মিলে একসঙ্গে নৌকো-খানাকে উদ্দেশ করে যদি আমরা অনবরত ঢিল ছুড়তে থাকি তবে ঢিলের ভিতরে যে গতিশক্তি থাকে তা-ই নৌকোখানাকে গতি দান করবে, অর্থাৎ নৌকো তখন চলতে থাকবে। অবশ্য ঢিলের গুঁতোয় নৌকোখানা হয়ত আস্তই থাকবে না। সে যাই হোক, নৌকোখানাকে এভাবে না চালিয়ে আমরা অন্যভাবেও কাজ হাসিল করতে পারি। আমরা যদি অনেকে মিলে নদীর জলে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারি, মানে নদীর জলে যদি অসংখ্য ঢেউ তৈরি করতে পারি তবে সে ঢেউয়ের আঘাতে নৌকোটি চলতে থাকবে নিশ্চয়ই।

তাহলে দেখা গেল, কোন পদার্থের মধ্যে সরাসরি কোন শক্তি দান করা যায় বাইরে থেকে। এ কাজের জন্যে মাধ্যমটি নিজেই শক্তিকে বহন করে নিয়ে যেতে পারে। আবার দরকার পড়লে কোন মাধ্যমের সাহায্যেও শক্তি পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। নৌকোটির বেলা মাধ্যমের কাজ করেছে প্রথমে ঢিল, তারপর জল।

নিউটনের মত

আলো ব্যাপারটা আসলে কী সে সম্বন্ধে এমনি ধরনের দুটি মত চলে আসছে বিজ্ঞানীদের মধ্যে। তোমরা বিজ্ঞানী নিউটনের নাম শুনেছ। তিনি যে মতটি প্রকাশ করেছেন তা হল এই যে, আলো দেয় এমনি কোন পদার্থ থেকে অতি ক্ষুদ্র সব কণিকা ছুটে চলে চারদিকে। প্রচণ্ড এদের গতিবেগ। কিন্তু ভর বা মাস্ এদের খুবই সামান্য। এ-সব কণিকা এসে যখন আমাদের চোখে পড়ে তখনই আমাদের আলোর অনুভূতি জাগে। নিউটনের এ মতবাদের নাম হচ্ছে কণিকা-তত্ত্ব বা করপাসকিউলার থিয়োরি।

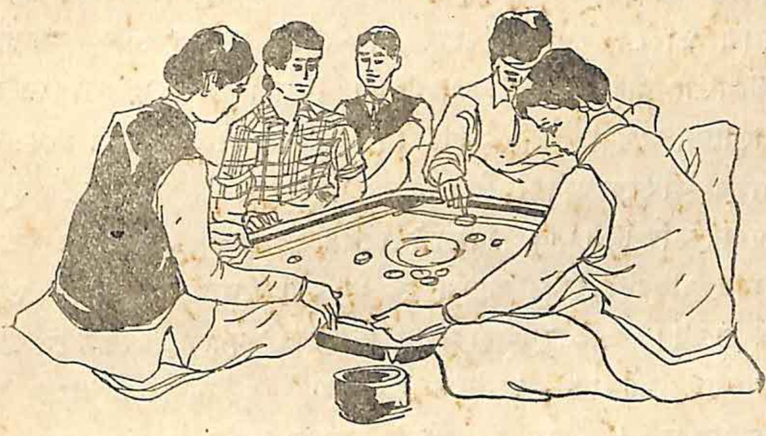
আলোর ধর্ম

আলোর নিজস্ব কতগুলি ধর্ম আছে। কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন্ তত্ত্ব বা থিয়োরি প্রকাশ করতে হলে আমাদের দেখতে হয় যে, তত্ত্বটি বিষয়টির গুণ বা ধর্মগুলি ঠিক-ঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে কি না। কাজেই নিউটনের কণিকা-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আলোর বিশেষ-বিশেষ ধর্মগুলি সম্বন্ধে একটু বলে নিলে মন্দ হয় না। শোন।

তোমরা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে যে, এমন অনেক জিনিস আছে যার ভিতর দিয়ে আলো অবাধে চলে যেতে পারে। যেমন ধর, জানলার কাচ। কাচের জানলা কি রোদ আটকাতে পারে? নিশ্চয়ই নয়। এ-জাতীয় জিনিসকে আমরা বলি স্বচ্ছ জিনিস। আবার এমন অনেক জিনিস আছে যা আলোকে বাধা দেয়। ফলে জিনিসগুলির পেছনে একটু ছায়া পড়ে। এ-জাতীয় জিনিসকে আমরা বলি অস্বচ্ছ জিনিস। আলোকে যদি আমরা কতগুলো ক্ষুদ্র কণিকা মনে করি তবে ছায়া পড়ার ব্যাপারটা সহজেই বোঝা যাবে। তোমার গায়ে যদি কেউ ঢিল ছোড়ে তবে সেটা তুমি কিভাবে আটকাতে পার? বড় একখানা তক্তা যদি সামনে ধরতে পার তুমি, তবে ঢিলের আঘাত তোমার গায়ে লাগবে না, তক্তায় লেগে ঢিলটা আটকে যাবে। আলোর কণাগুলোও তেমনিভাবে অস্বচ্ছ পদার্থের উপর পড়ে আটকে যাবে ঐ ঢিলের মত, আর তার পেছনে পড়বে একটা ছায়া।

কোন জিনিসের উপর আলো পড়লে তার খানিকটা অংশ জিনিসটা শুষে নেয়, খানিকটা আবার জিনিসটা ফিরিয়ে দেয় উল্‌টো দিকে। দেয়ালে একটা বল ছুঁড়ে দিলে সেটা যেমন ফিরে আসে, অনেকটা সেই রকমেই। কোন পদার্থের উপর থেকে এই যে আলোর ফিরে আসা, একে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় প্রতিফলন।

বেশ মসৃণ জিনিসের পিঠের উপর থেকে যখন আলোর প্রতিফলন ঘটে তখন সে আলো দুটি আইন মেনে চলে। একটি হল এই যে, যে বিন্দুতে আলো পড়েছে সেই বিন্দু থেকে যদি একটি লম্ব আঁকা যায় তবে আলোর পথ লম্বের সঙ্গে যতটা বেঁকে আছে, প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যাওয়ার সময়ও সে ঠিক ততটাই বেঁকে যাবে। তোমাদের মধ্যে



ওস্তাদ ক্যারম খেলোয়াড় রিবাউণ্ড মারবার সময় আলোর প্রতিফলনের মতই একটা নিয়মের সাহায্য নিয়ে থাকে

যারা ক্যারম খেলায় ওস্তাদ তারা রিবাউণ্ড মারবার সময়ে ঠিক ঐ ধরনেরই একটি নিয়ম মেনে থাকো। পদার্থের পিঠ যদি মসৃণ না হয় তবে প্রতিফলিত আলো এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ে, সঙ্গতির অভাব দেখা যায় এদের মধ্যে। যে পরিমাণ আলো কোন জিনিস শুষে নেয় তাতে জিনিসটি ততটা গরম হয়ে ওঠে। আলোকে যদি আমরা ধরে নিই কতগুলো ছোট ছোট কণা হিসেবে তবে দেয়ালে বল ছোড়া বা ক্যারমের রিবাউণ্ড মারার মতই আলো প্রতিফলিত হবে কোন জিনিসের পিঠ থেকে এতে আর বিচিত্র কী!

আয়না কাকে বলে

আয়না কাকে বল জানো? তোমরা বলবে, এ আর এমন শক্ত ব্যাপার কী? প্রতিদিনই তো আমরা আয়নায় মুখ দেখি। কাচের তৈরি মসৃণ সোজা আয়না তোমরা মুখ দেখার কাজে ব্যবহার কর একথা কেই বা অস্বীকার করছে। বিজ্ঞানীরা কিন্তু বলেন অন্য কথা। তাঁরা বলেন, মসৃণ পিঠ থাকলেই হল, তাকেই আমরা আয়না বলব, তা সে সোজাই হোক বা বাঁকাই হোক। এক কথায়, এ-জাতীয় সব জিনিসই আয়না বা মিরর। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, আয়না তৈরি করার জন্যে কাচ না হলেও চলে। কোন ধাতুর পাতকে ঘসে মেজে চকচকে করে নাও না, তা দিয়ে কি মুখ দেখার কাজ চলে না? নিশ্চয়ই চলে। কাচেরই হোক, বা অন্য কোন ধাতুরই হোক, আয়না যে সব সময় সোজা হতে হবে তা অবশ্য নয়। তবে মুখখানা সমান আকৃতির দেখাবার জন্যে সোজা আয়নাই দরকার। বাড়িতে আমরা এ ধরনের আয়নাই ব্যবহার করি। এদের ইংরেজিতে বলা হয় প্লেন মিরর। তোমার চেহারা বা মুখখানা যদি ছোট বা বড় আকারে দেখতে চাও তবে বাঁকানো আয়না ব্যবহার করতে হবে। এদের ইংরেজিতে বলা হয় কার্ভ্ড্ মিরর। আয়না যত মসৃণ হবে ততই ভাল। কারণ এক্ষেত্রে খুব সামান্য আলোই শোষণ করে নিতে পারবে আয়না। তার মানে, বেশির ভাগ আলোই উলটে ফিরে আসবে অর্থাৎ প্রতিফলিত হবে। বিজ্ঞানের হিসেব দিয়ে বিচার করলে বলতে পারা যায়, ভাল আয়না বানানো মেহনতের কাজ। তবে আমাদের সাধারণ কাজ-কর্মের জন্যে আমরা যে-সব আয়না ব্যবহার করি তাই যথেষ্ট। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে যে সব আয়না ব্যবহার করা হয় তা নানা দিক দিয়েই নিখুঁত হওয়া দরকার। বাঁকানো আয়নার কতগুলোর পিঠ হয় উঁচু; এদের বলা হয় কনভেক্স মিরর। আর

এক ধরনের আয়নার পিঠ হয় নিচু ; এদের নাম দেওয়া হয়েছে কনকেভ মিরর।

আলোর প্রতিসরণ

আগেই বলেছি, এমন অনেক জিনিস আছে যার ভিতর দিয়ে আলো অনায়াসে চলে যেতে পারে। যেমন ধর, কাচ। কাচকে আমরা বলি স্বচ্ছ পদার্থ। কোন মসৃণ কাচের পিঠের উপর যখন আলো পড়ে তখন সে আলো কাচের ভিতর দিয়ে অন্য দিকে বেরিয়ে যায়। কাচের উপর বাঁকাভাবে আলো পড়লে তা কাচের ভিতরে প্রবেশ করবার সময় আরও একটু বেঁকে প্রবেশ করে। অবশ্য কাচের ভিতর প্রবেশ করে আলো কিন্তু সোজা পথেই চলতে থাকে। কারণ বায়ুই বল বা কাচই বল, যে-কোন মাধ্যমের মধ্যে আলোর পথ থাকে সব সময় সরল রেখায়। কাচ থেকে আলো যখন আবার বেরিয়ে যায় বায়ুতে তখন আবার তার পথটা একটু বেঁকে যাবে। বায়ুর মধ্যে গিয়ে সে কিন্তু আবার সরল রেখায়ই চলতে থাকবে। যে-কোন পদার্থেরই একটা ঘনত্ব আছে। সোজা কথায় আমরা হালকা বা ভারি কথাটাও ব্যবহার করতে পারি। কাচ ভারি, বায়ু হালকা। কাজেই আলো এক মাধ্যম থেকে আলাদা মাধ্যমের ভিতরে যাবার সময় তার পথটা একটু বদলে নেয়। এই যে পথ বদলে নেওয়ার ব্যাপারটা, একে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে প্রতিসরণ বা রিফ্র্যাকশন। প্রতিসরণেরও আইন-কানুন আছে। দুটি বিভিন্ন মাধ্যমের যে সাধারণ বিন্দুতে আলো মাধ্যমদুটিকে স্পর্শ করে সেখান থেকে যদি একটা লম্ব আঁকা যায় তবে সেই লম্বের সঙ্গে আলো যে কোণ তৈরি করবে তা এক-এক মাধ্যমে এক-এক রকম। কোন এক মাধ্যমে এ কোণটি হবে বড়, অন্য মাধ্যমে হবে ছোট। যখন আলো বায়ু

থেকে কাচের ভিতরে যায় তখন বায়ুর ভিতরকার এই কোণটির চেয়ে কাচের ভিতরের কোণটি হবে ছোট। আবার যদি কোন ঘন মাধ্যম, যেমন কাচ বা জল থেকে আলো হালকা মাধ্যম বায়ুর মধ্যে প্রবেশ করে তবে বায়ুর ভিতরকার ঐ কোণটি হবে জলের ভিতরকার কোণের থেকে বড়। এই দুটি কোণের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তাকে বলা হয় স্নেলস্ ল।

মরীচিকার কথা তোমরা শুনে থাকবে। মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত কোন মানুষ বা প্রাণী নিকটেই জল আছে বলে দেখতে পায়। ছুটে যায় জলের আশায়। গিয়ে দেখে সেখানে জল নেই। জলাশয় চলে গেছে আরও দূরে। এমনিভাবে বিভ্রান্ত হয়ে এক সময় প্রাণ হারায় তারা মরুভূমিতে। একেই বলে মরীচিকা। মরীচিকার কারণ ঐ আলোর প্রতিসরণ।

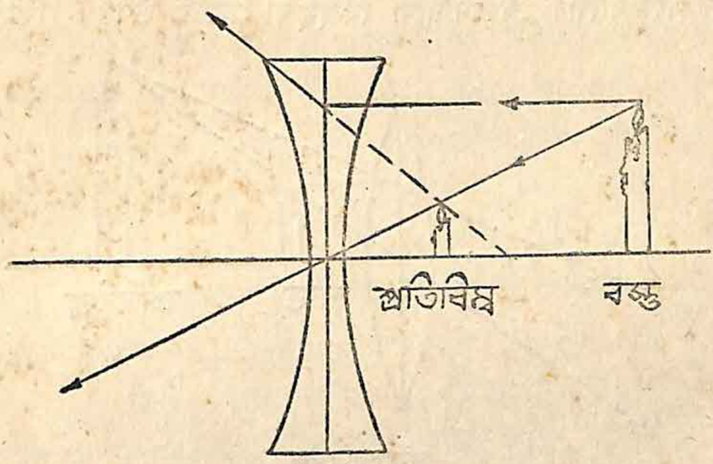
আকাশের রামধনুর উদয়ও ঐ প্রতিসরণেরই জন্যে।

আয়নার কথায় আবার একটু ফিরে আসা যাক। আয়না সরল হতে পারে আবার বাঁকাও হতে পারে, সেকথা আগেই বলেছি! যে-কোন আয়নায়ই আমরা যা দেখি তা হল বস্তুটির প্রতিবিম্ব। আয়নার সামনে কোন বস্তু রাখলে বস্তুটি থেকে আলো ঠিকরে পড়ে আয়নার উপর। সেখান থেকে তা প্রতিফলিত হয়ে আবার আমাদের চোখে ফিরে আসে। আমরা দেখি বস্তুটির প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব আকারে বড় হবে, কি ছোট হবে, কি সমান হবে—তা নির্ভর করে আয়নাটি সরল হবে, কি বাঁকা হবে তার উপর। জলের মধ্যে যে আমরা কোন জিনিসের ছায়া দেখতে পাই তাও আসলে ঐ প্রতিবিম্বই।

চশমার কাচ

চশমার কাচকে আমরা বলি :লেন্স। লেন্স জিনিসটা কী? লেন্স হল একখানা কাচের টুকরো, যার পেটটা মোটা, দু-ধার সরু। এমন

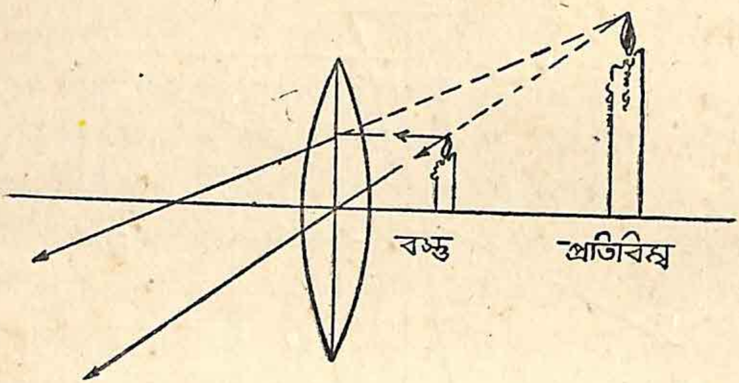
লেন্সও আছে যার পেটের দিকটা সরু, দুটো ধার মোটা। এর নাম কনকেভ লেন্স। কোন লেন্সের উপর আলো পড়লে



কনকেভ লেন্স

তা প্রতিফলিত হয় না, হয় প্রতিসরিত। তারপরে তা তৈরি করে প্রতিবিম্ব, যা কখনো আকারে ছোট, কখনো বা বড়। এর সাহায্যে আমরা ইচ্ছেমত কোন বস্তুর প্রতিবিম্বকে ছোট বা বড় করে নিতে পারি। তাছাড়া যে জিনিস খালি চোখে দেখতে পাই না তাও দেখা যায় উপযুক্ত লেন্সের সাহায্য নিয়ে। কেউ কাছের জিনিস ভাল দেখতে পায় না। চশমার লেন্স তাকে তা দেখিয়ে দেয় স্পষ্ট করে। কেউ দেখে না দূরের জিনিস। চশমার লেন্স তাও তাকে দেখতে সাহায্য করে। তবে, লেন্সের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার নানারকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে। ক্যামেরা, অণুবীক্ষণ যন্ত্র (মাইক্রোস্কোপ) আর দূরবীন যন্ত্র (টেলিস্কোপ) এদের মধ্যে প্রধান। ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার অভ্যেস তোমাদের অনেকেরই হয়ত আছে। পেটমোটা লেন্সের কথা যা আগে বলেছি তার বৈজ্ঞানিক নাম কনভেক্স লেন্স। ক্যামেরার বাক্সটির সামনে থাকে একখানা কনভেক্স লেন্স। কোন

জিনিসের দিকে সেটি ফিরিয়ে ধরলে জিনিসটি থেকে আলো এসে পড়ে লেন্সের উপর। তারপর তার ভিতর দিয়ে সে আলো চলে গিয়ে পড়ে বাক্সের পেছনে রাখা ফিল্‌ম্ বা প্লেটের উপর। ফিল্‌ম্



কনভেক্স লেন্স

বা প্লেটে মাখানো থাকে রাসায়নিক মাল মশলা। এর উপরেই তৈরি হয় জিনিসটির একটি অদৃশ্য ছবি। তারপর আবার এ অদৃশ্য ছবিকে ফুটিয়ে তোলা হয় রাসায়নিক মালমশলার সাহায্যে। আমরা পাই ছবির নেগেটিভ। নেগেটিভ থেকে আসল ছবি পেতে হলে আবার রাসায়নিক মাল মশলার সাহায্য নিতে হয়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে আমরা অতি ক্ষুদ্র এবং খালি চোখে অদৃশ্য জিনিস দেখতে পাই। এ যন্ত্রেও ব্যবহার করা হয় কনভেক্স লেন্স। দূরের জিনিস দেখবার জন্যে ব্যবহার করা হয় দূরবীন যন্ত্র। এ যন্ত্রেও থাকে নানারকম লেন্স, কনভেক্স এবং কনকেভ উভয়ই। কত রকমের যে দূরবীন-যন্ত্র বা টেলিস্‌কোপ তৈরি করা হয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না। গ্যালিলিওই যে প্রথম টেলিস্‌কোপ বানিয়েছিলেন সে-কথা অনেকেরই জানা নেই।

আলো হল ইথারের ঢেউ

আমাদের পুরোনো কথায় আবার ফিরে আসা যাক। সেই নিউটনের

কণিকা-তত্ত্বের ব্যাপারে। দেখা যায় যে, আলোর নানরকম ধর্ম যে সম্বন্ধে আমরা এত সময় আলোচনা করেছি, নিউটনের তত্ত্ব দিয়ে তা বেশ ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু আলোর কোন-কোন ব্যাপার এমন জটিল যে তা কোনক্রমেই নিউটনের তত্ত্ব-সাহায্যে বুঝিয়ে বলা যায় না। বিজ্ঞানীরা বলেন, না, আলো-কণিকা টনিকা কিছুই নয়। আলো হল একরকমের ঢেউ। ইথারের মধ্যে নানা ধরনের ঢেউ আর কি!

বিজ্ঞানীরা আরও বলেন, বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে একটি পদার্থ, যা আমাদের ধরাছোঁয়ার একেবারেই বাইরে। এর নাম দেওয়া হয়েছে ইথার। এই ইথারের মধ্যে ঢেউই হল আলো। যে জিনিস থেকে আলো আসছে বেরিয়ে সেখান থেকেই তৈরি হয় কতগুলো ইথারের ঢেউ। নানা আকারের এরা; কোনটা লম্বা, কোনটা খাটো। এ ঢেউগুলো ছুটতে থাকে তীব্র গতিতে ইথারের ভিতর দিয়েই। এরাই যখন এসে আমাদের চোখে পড়ে, আমরা আলোর অনুভূতি টের পাই।

আলো নিজে অদৃশ্য

এখানে আর-একটা কথা বলে রাখা ভাল। আলোর সাহায্যে নানা জিনিস-পত্তর আমরা দেখতে পাই বটে, কিন্তু আলো নিজে একেবারেই অদৃশ্য। কেউই দেখতে পায় না আলো। আমরা বলি, অন্ধকারে পথ চলতে গিয়ে আলো দেখতে পেলাম। কথাটা একেবারেই ভুল, অবশ্য বিজ্ঞানের ভাষায়।

অন্ধকার ঘর। কিছুই দেখা যায় না। বিজলি বাতির সুইচ টিপে দাও, মুহূর্তমধ্যে ঘরখানা আলোয় ভরে গেল—ঘরের সব কিছু তুমি দেখতে পেলে। এখানে ব্যাপারটা ঘটেছে এই—বিজলি বাতির সরু তার—যাকে বলি আমরা ফিলামেন্ট—তা বিদ্যুৎ-প্রবাহে বেশ গরম হল। তারপর তা থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে লাগল

আলো, অর্থাৎ ইথারের ঢেউ। চারদিকে ছুটে চলেছে ইথারের ঢেউ তীব্র গতিতে। সে আলো এসে পড়ল টেবিলটার উপর। পড়ল বইখাতার উপর, পড়ল ঘরের অন্যান্য আসবাব-পত্রের উপর। আলোর খানিকটা এসব পদার্থ শুষে নিল নিজের মধ্যে। বাকিটা প্রতিফলিত করে পাঠিয়ে দিল তোমার চোখে। তুমি ঘরের সব জিনিস দেখতে পেলে।

এখানে আর-একটা প্রশ্ন অবশ্য ওঠে। বিজলি বাতির ফিলা-মেণ্টের মধ্যে এমন কী ব্যাপার ঘটল যার জন্যে সেখান থেকে অসংখ্য ইথারের ঢেউ সৃষ্টি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে? এ-সব ঢেউ আবার ঘরের আসবাবপত্র থেকে প্রতিফলিত হয়ে যখন আমাদের চোখে ফিরে আসে তখনই বা কী ব্যাপার ঘটে? শোন।

পদার্থ দু-রকম—মৌলিক আর যৌগিক। মৌলিক মানে মূল পদার্থ। মূল পদার্থের মধ্যে নানা ধরনের মিশ্রণ হয়ে তৈরি হয় অসংখ্য যৌগিক পদার্থ। যে-সব পদার্থ আমরা চারদিকে দেখি তার অধিকাংশই হল যৌগিক পদার্থ। বিজ্ঞানীরা বলেন, শ-খানেক মৌলিক পদার্থ নিয়েই তৈরি হয়েছে দুনিয়ার সব কিছু। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, লোহা, তামা, সোডিয়াম, পটাসিয়াম—সবই মৌলিক পদার্থ। জল একটি যৌগিক পদার্থ—তৈরি হয়েছে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন দিয়ে। চিনি তৈরি হয়েছে তিনটি মৌলিক পদার্থ দিয়ে; এরা হল হাইড্রোজেন, অক্সিজেন আর কার্বন। যে-কোন পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশের নাম অণু বা মলিকিউল। অণু আবার তৈরি হয়েছে বিভিন্ন জাতের পরমাণু দিয়ে। তাহলে আমরা বলতে পারি, পরমাণুই পদার্থের সবচেয়ে ছোট অংশ।

পরমাণুদেরও আবার ভাঙা যায়—পাওয়া যায় ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন কণিকা। বিদ্যুৎ দু-রকম—ধনবিদ্যুৎ আর ঋণবিদ্যুৎ। ইংরেজিতে বলা যায়, পজিটিভ ইলেকট্রিসিটি আর নেগেটিভ ইলেকট্রিসিটি। পজিটিভ ইলেকট্রিসিটির সবচেয়ে ছোট কণিকার নাম

প্রোটন, আর নেগেটিভ ইলেকট্রিসিটির সবচেয়ে ছোট কণিকার নাম ইলেকট্রন। একটি প্রোটন আর একটি ইলেকট্রন মিলে যে কণিকা তৈরি হয় তার নাম নিউট্রন। কোন পদার্থের পরমাণুর ভিতরকার প্রোটন আর নিউট্রনগুলো থাকে পরমাণুটির ঠিক মাঝখানে, আর ইলেকট্রনরা মাঝখানকার জায়গাটুকুর চারদিকে ঘুরতে থাকে অনবরত।

যখন কোন জিনিস আলো দেয় তখন তার ভিতরকার ইলেকট্রন-দের ছটফটানি বেড়ে যায়। এর ফলে ইথারের মধ্যে তৈরি হয় নানা আকারের ঢেউ। এরাই হল আলোর ঢেউ। এ ঢেউগুলো ছুটতে ছুটতে যখন অন্য কোন জিনিসের উপর পড়ে তখন সেখান থেকে এগুলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে ফিরে আসে। আমরা তখন জিনিসটি দেখতে পাই। আগেই বলেছি, বিকীর্ণ তাপ আর আলো একই জিনিস। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, এরা উভয়েই ইথারের ভিতরের ঢেউ আর কি! তবে পার্থক্য কোনখানটায়? পার্থক্য হল এদের ঢেউয়ের আকারে। শুধু বিকীর্ণ তাপই বলি কেন। এক্স-রে, আলট্রা-ভায়োলেট রে, ইনফ্রা-রেড রে, বেতার বা রেডিও-তরঙ্গ—এ সবই হল ইথারের ঢেউ; পার্থক্য শুধু ঢেউয়ের আকারে।

নানা রঙের আলো

ইথারের ঢেউয়ের কথাই যখন উঠল তখন নানা রঙের কথা বলতে হয়।

সূর্যের আলোকে আমরা সাদা আলো বলি। আসলে কিন্তু তা নয়। সূর্যের আলো তৈরি হয়েছে সাতটি আলাদা আলাদা রঙ দিয়ে। এ সাতটি রঙ আমরা রামধনুতে দেখতে পাই। এরা হল বেগুনি, অতিনীল, নীল, সবুজ, হলদে, কমলা এবং লাল। ইংরেজি একটি শব্দে এদের প্রকাশ করা যায়। শব্দটি VIBGYOR।

উপরের সাতটি রঙের যে ইংরেজি নাম তার আদ্যক্ষর দিয়েই তৈরি হয়েছে শব্দটি। যথা, পর-পর Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange, Red। সূর্যের আলোর মধ্যে যে এ সাতটি রঙ রয়েছে তা প্রথম বলেন বিজ্ঞানী নিউটন।

একটি তিনকোণা কাচ বা প্রিজম নিয়ে তার ভিতর দিয়ে যদি সূর্যের আলো চালিয়ে দেওয়া যায় তবে দেখা যাবে যে, সাদা আলো সাতটি ভিন্ন রঙে ভাগ হয়ে বেরিয়ে এসেছে। কোন পর্দার উপর ধরতে পারলে দেখা যাবে যে, সাতটি রঙের এক ধারে রয়েছে বেগুনি রঙ, অন্য ধারে লাল রঙ। পর-পর সাজানো সাতটি রঙকে বলা হয় বর্ণালী বা স্পেকট্রাম। আলাদা আলাদা রঙগুলোকে আমরা মৌলিক রঙ বলতে পারি। যে-কোন রঙের কথাই বলা যাক না কেন, এরা সকলেই সেই ইথারের ঢেউ ; তবে, ঢেউগুলো আকারে ছোট বড়—এই যা প্রভেদ। ভিন্ন-ভিন্ন আকারের ঢেউ থেকে তৈরি এই সাতটি রঙ একসঙ্গে মিলে তৈরি করেছে সাদা রঙ।

ছোট-বড় ইথারের ঢেউয়ের কথা বার বার বলছি। কিন্তু কতখানি ছোট বড় ? এক সেন্টিমিটার বলতে কতটা দৈর্ঘ্য বোঝায় তা বোধহয় তোমাদের অজানা নয়। এক ইঞ্চির প্রায় আড়াই ভাগের এক ভাগ হল এক সেন্টিমিটার। আমরা যে উপরে সাতটা রঙের কথা বললাম তার মধ্যে লাল আলোর ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি, আর বেগুনি আলোর সবচেয়ে কম। বাকি রঙগুলো লাল আর বেগুনির মাঝামাঝি। লাল আলো সৃষ্টি হতে ইথারের যে ঢেউয়ের প্রয়োজন, তার এক-একটা ঢেউ কতটা লম্বায় তা শুনলে তোমরা কিন্তু অবাক হয়ে যাবে। এক ইঞ্চির চল্লিশ হাজার ভাগের এক ভাগই হল এক-একটি লাল আলোর ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য। আর বেগুনি আলোর এক একটি ঢেউ লম্বায় হল এক ইঞ্চির সত্তর হাজার ভাগের এক ভাগের কাছাকাছি।

ইথারের মধ্যে বহু আকারের ঢেউ তৈরি হয় নানা কারণে। এর

মধ্যে লাল থেকে বেগুনি আলো তৈরি করবার জন্যে যে ঢেউগুলো সেগুলোই শুধু আমরা দেখতে পাই, অর্থাৎ সেগুলোই আমাদের চোখে দেখার অনুভূতি জাগায়। মানে দাঁড়াচ্ছে, এক ইঞ্চির চল্লিশ হাজার ভাগের এক ভাগ লম্বা যে সব ইথারের ঢেউ সে থেকে শুরু করে এক ইঞ্চির সত্তর হাজার ভাগের এক ভাগ লম্বা ঢেউগুলো পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন রঙ হিসেবে দেখি। এর বাইরে অর্থাৎ এর চেয়ে আকারে ছোট আর এর চেয়ে আকারে বড় যে-সব ঢেউ সে-সব আমাদের দেখার অনুভূতি জাগায় না। আমরা আগের সাতটি রঙকে যদি দৃশ্যমান আলো বলি, তবে এ-সব আলোকে আমরা অদৃশ্য আলো বলতে পারি। ছোট আকারের ঢেউয়ের দিকে এক্স-রে, গামা-রে, প্রভৃতি আছে। আর বড় আকারের ঢেউয়ের দিকে রয়েছে রেডিও-তরঙ্গ, ইনফ্রা-রেড রে প্রভৃতি। রেডিও-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হয় এক মিটার থেকে শুরু করে প্রায় এক লাখ মিটার পর্যন্ত। এক্স-রে ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য হয় এক সেন্টিমিটারের এক কোটি ভাগের এক ভাগের কাছাকাছি।

কোন জিনিস কেন রঙিন দেখায়

সূর্যের আলোই বল বা বিজলিবাতির আলোই বল না কেন, কোন জিনিসের উপর তা পড়লে আমরা জিনিসটি দেখতে পাই। জিনিসটি যদি রঙিন হয় তবে তার সে রঙটিই আমরা দেখি। তার মানে হল, সে জিনিসটির যা রঙ সে জিনিসটি থেকে ঠিক সেই রঙের মতই ইথারের ঢেউ প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসে। একখানা লাল কাগজ। তার উপর সূর্যের আলো পড়ল। আমরা সেখানা দেখি লাল। অথচ সূর্যের আলোর মধ্যে সাতটি মৌলিক রঙের আলো আছে মেশানো। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই। সূর্যের সাদা আলো যখন লাল কাগজখানার উপর পড়ল তখন লাল কাগজখানা সূর্যের সব-কটি

রঙই নিজের মধ্যে শুষে নিল। শুষতে পারল না শুধু লাল রঙটি। এই লাল রঙটি কাগজখানা থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ল, অর্থাৎ লাল আলোর যা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সেই ধরনের অজস্র ইথারের ঢেউ এসে আমাদের চোখকে সজাগ করে দিল। চোখ দেখল একখানা লাল কাগজ। লাল কাগজখানার মত যে-কোন রঙের ক্ষেত্রেই ঘটে এমনিধারা ব্যাপার। কালো জিনিসের আবার অদ্ভুত ক্ষমতা। এর উপর যে-কোন আলোই পড়ুক না কেন, তা একদম শুষে নেয় সে নিজের মধ্যে। এ যেন একটা আলো গিলবার রাক্ষস আর কি। কাজেই সাদা আলো বা অন্য যে-কোন রঙের আলো পড়ুক কালো রঙের উপর, কালো রঙটি তার সবই গিলে ফেলবে। কোন রঙ নেই—এ-কথার মানেই হল কালো রঙ। কালো জিনিস সহজে গরম হয়ে ওঠে কেন, তার কারণটি এখানেই। অন্য যে-কোন রঙের জিনিস আলোর কিছু না কিছু অংশ প্রতিফলিত করে দেয়, কিন্তু কালো রঙের জিনিস তা করে না ; সে যে-কোন রঙকেই নিজের মধ্যে হজম করে নেয়।

আধুনিক মত

এবারে আমরা আবার একটু আমাদের সেই পুরোনো কথায় ফিরে যাই। আলো হল তাহলে ইথারের ভিতরকার ঢেউ। কাজেই নিউটনের কণিকাবাদ বা করপাস্‌কিউলার থিয়োরি শেষ পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানীদের হাতে মার খেল। ওয়েভ থিওরি বা তরঙ্গ-বাদ বিজ্ঞানীরা প্রায় সকলেই মেনে নিলেন।

এমনিভাবে চলল বহু দিন। মাত্র কয়েক বছর আগের কথা। তরঙ্গ-বাদ সম্বন্ধে আবার বিজ্ঞানীরা সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁরা পরীক্ষায় দেখলেন, বিকীর্ণ তাপ বা কোন আলো কখনো-কখনো ঢেউয়ের মত ব্যবহার করে, আবার কখনো করে পদার্থ-কণিকার মত। ইলেকট্রনদের কথা আগেই বলেছি। এদের

ব্যবহার আবার কখনো-কখনো ঢেউয়ের মত। অথচ এরা পদার্থেরই অতি ক্ষুদ্র অংশ। বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলল ব্যাপারটা।

তাই আজকের দিনে নিউটনের কণিকাবাদ আর আধুনিক বিজ্ঞানীদের তরঙ্গবাদ—ছটিই চলছে পাশাপাশি। আলো যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে তখন তার ব্যবহার হুবহু কোন ঢেউয়ের মত। আবার যখন কোন অ্যাটম থেকে আলো বেরিয়ে আসে ইলেকট্রনের ছটফটানির জন্যে, তখন আলোর ব্যবহার একদম পদার্থ-কণিকার মত। কাজেই আজকের দিনে আলো বেচারি ছু-দল পণ্ডিতের পাল্লায় পড়ে একটা রফা করে নিয়েছে—কখনো সে ইথারের ঢেউ, আবার কখনো সে পদার্থ কণিকা।

শব্দের জগতে

ট্রামের ঘড়-ঘড় শব্দে তোমার ঘুম ভেঙে যায় সকালে। উঠি-উঠি করছ। পরীক্ষা সামনেই। মা বলেন, এ সময়ই পড়ায় খুব মন বসে। কারণ কী? না, চারদিকে গণ্ডগোল কম। ভাবতে ভাবতেই মার ডাক কানে এল, 'উঠে হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বস খোকা।' কিন্তু কলতলায় এখন হাত মুখ ধুতে যায় কার সাধ্যি! ঝি পটলার মা ঠাকুরের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া লাগিয়েছে। ওদিকে ছোট খোকা হাত পা ছুড়ে কান্না শুরু করে দিয়েছে। মাঝখান থেকে বাবার গলা শোনা গেল, 'কই গো, তোমার চা হতে আর কতক্ষণ?' কথাটা তোমার মাকে উদ্দেশ করে বলা। দাদার আবার আটটায় অফিস। সেও ইতিমধ্যে হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছে। এত সকালেই গয়লা এসে হাজির। 'দুধটা নিন, মা', শোনা গেল তার গলার স্বর। রাস্তা দিয়ে ঠিক এ সময় হাঁক দিয়ে যাচ্ছে মোয়া-ওয়ালা। লোকটা মুড়ির মোয়া বিক্রি করে। হঠাৎ একটা লরি বাড়িঘর কাঁপিয়ে চলে গেল বড় রাস্তা দিয়ে।

বেলা বাড়ছে। কর্মচাঞ্চল্য বাড়ছে মানুষের। চারদিকে শুধু শব্দ আর শব্দ। তুমি হয়ত অনেকবার ভেবেছ, না বাপু, এ আর ভাল লাগে না। চুপচাপ কোথাও গিয়ে কয়েকটা দিন কাটিয়ে এলে হয়। তা, যাও না কোন পাহাড়ের দেশে। সেখানে গাড়ি ঘোড়ার শব্দ নেই, জন-কোলাহল নেই। কিন্তু সেখানে তুমি শুনতে পাবে পাতার মর্মর শব্দ, পাখির মিষ্টি গান, ঝরনার কুলু কুলু ধ্বনি।

শব্দ নেই—এ-রকম অবস্থা কল্পনা করতে পার? সাহিত্যে হয়ত বিবরণ পড়া যায়—নীরব নিস্তব্ধ প্রান্তরের। অনেকের অভিজ্ঞতাও হয়ত আছে এ-রকম অবস্থার। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায়,

একদম শব্দ নেই, এরকম অবস্থা কল্পনা করাই যায় না। আমাদের দেশের প্রাচীন মনীষীরা শব্দের সম্বন্ধে ভেবেছেন ; শব্দকে তাঁরা ব্রহ্ম বলতেন। শব্দব্রহ্ম।

কিন্তু সেকথা থাক। এই যে চারদিকে এত শব্দ, এ-সব শুনে একবারও ভেবেছ কি, কী করে তৈরি হয় শব্দ, কী করে তা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাফেরা করে, কেন কোন শব্দ মধুর কোন শব্দ কর্কশ, কেনই বা গান শুনতে তোমার ভাল লাগে, গাধার চিৎকার কেন বিরক্তিকর ? এমনি ধরনের বহু প্রশ্ন। এখানে আমরা এ-সব কথাই বলতে চাই। কিন্তু তার আগে একটা গল্প শোন।

অনেক—অনেক দিন আগের কথা। ব্যাবিলন শহরে একটা খুব উঁচু স্তম্ভ তৈরি হচ্ছিল। স্তম্ভটা হবে এত উঁচু যে তার মাথাটা গিয়ে ঠেকবে একেবারে স্বর্গের গায়ে। এতে করে পৃথিবীর লোকের ভারি সুবিধে হবে। স্বর্গে যাবার জন্যে আর তাদের কোন মেহনত করতে হবে না। স্তম্ভের সিঁড়ি বেয়ে তারা অনায়াসেই স্বর্গে গিয়ে হাজির হতে পারবে। এদিকে ভগবান পড়লেন মহা চিন্তায়। স্বর্গে আসার জন্যে পৃথিবীর লোকেরা যদিও বা তাঁর একটু আধটু পুজো অর্চনা করত এবার বুঝি তাও আর থাকে না। তাই তিনি একটা বুদ্ধি বাতলালেন। তিনি এমন এক ব্যবস্থা করলেন যার ফলে যে মিস্ত্রিরা স্তম্ভের কাজ করছিল তারা একজনের কথা অন্য জনে বুঝতে পারল না। কারোর কথা কেউ না বুঝলে তারা কাজ করবে কী করে ? ফলে স্তম্ভ বানানোর কাজ মাঝ-পথেই বন্ধ হয়ে গেল। ভগবানও সেবারকার মত রেহাই পেলেন।

গল্পটি গল্পই। কিন্তু এর মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক সত্যের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে।

আধুনিক কালের একটি মজাদার গল্পের কথা শোন। জোসেফ অ্যাডিসনের 'জমাট বাঁধা কথা'র গল্পটির কথাই আমি বলছি। এটি মেরু অভিযানের গল্প। মেরু প্রদেশে একবার এত ঠাণ্ডা

পড়ল যে, লোকের কথা একেবারে জমে গেল। দেখা গেল, একজন লোক মুখ নাড়ছে, কিন্তু অন্যে তার কথা শুনতে পাচ্ছে না। ঠাণ্ডাটা একটু কমলে জমাট-বাঁধা কথাগুলো শোনা যেতে লাগল বটে, কিন্তু তা মেছোবাজারের হট্টগোল ছাড়া আর কিছুই না। আধুনিক কালের হলেও এটাও গল্পই। বৈজ্ঞানিক সত্য নেই এখানে। মানুষ কথা জমা করে রাখবার ক্ষমতা পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা বরফের মত জমিয়ে নয়। তা অন্যভাবে। পরে বলছি সে-কথা।

শব্দ আসলে কী

শব্দ কাকে বলে? আমরা কান দিয়ে যা শুনি তা-ই শব্দ। শব্দেরও শক্তি আছে—সে কাজ করতে পারে। আকাশে মেঘ ডাকলে অনেক সময় ঘরের জানলা দরজা কাঁপে। কাছাকাছি জোর শব্দ হলে কানে তালা লাগে। তাছাড়া এক ধরনের শক্তি যেমন অন্য ধরনের শক্তিতে বদলে নেওয়া যায়, শব্দের বেলায়ও সেই নিয়ম। তাপ-শক্তিকে শব্দ-শক্তিতে, বা শব্দ-শক্তিকে তাপ-শক্তিতে বদলে নেওয়া যায় উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারলে। তবে, শব্দের শক্তি বড় কম, অর্থাৎ সাধারণ শব্দ থেকে আমরা যা কাজ পাই তা বড়ই কম। আমরা যে বিজলি বাতির বাল্‌ব্‌ ব্যবহার করি, আলো দেওয়ার ক্ষমতা তাদের এক-একটির এক-একরকম। কোন বাতির আলো দেওয়ার ক্ষমতাকে আমরা ৬০-ওয়াট, ৭৫-ওয়াট, ১০০-ওয়াট প্রভৃতি কথাগুলো দিয়ে প্রকাশ করি। অর্থাৎ বিদ্যুৎ-শক্তি প্রকাশ করার জন্যে ওয়াট কথাটি আমরা হামেশা ব্যবহার করে থাকি। যে বাল্‌বের ওয়াট বেশি তার আলো দেওয়ার ক্ষমতাও বেশি, অর্থাৎ সে বেশি উজ্জ্বল আলো দেবে। মনে কর, একদল বাদক খুব জোরসে বাজনা বাজিয়ে চলেছে। বাদক আছে ধর ৭৫ জন। এরা সকলে মিলে যে শব্দ-শক্তি তৈরি করবে তা দিয়ে ৭৫-ওয়াটের একটা বিজলি বাতি জালানো যায় মাত্র। সাধারণ-

ভাবে আমরা যে কথাবার্তা বলি তাতে শক্তি তৈরি হয় আগের বিজলি বাতিটি জ্বালাতে যে শক্তি দরকার তার দশ লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র।

শব্দ সৃষ্টি হয় কী করে

আমরা যখন কথা বলি তখন বায়ুর মধ্যে এক ধরনের ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। আমাদের জিভ আর ঠোঁটই এ কাজটি করে থাকে। পুকুরের জলে একটা ঢিল ছুড়ে দিলে ব্যাপারটা কী ঘটে লক্ষ্য করেছ কখনো? করলে দেখবে যেখানে ঢিলটা পড়েছে সেখানে গোল আকারের ঢেউ সৃষ্টি হয়েছে। ঢেউয়ের আকার ক্রমে বেড়ে চলল। ক্রমে তা পুকুরের সমস্ত জলে ছড়িয়ে পড়ল। বায়ুর মধ্যে যখন কোন আলোড়নের সৃষ্টি হয় তখন অনেকটা ঐ ধরনেরই ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এই ঢেউগুলো যখন কারো কানে গিয়ে পোঁছয় তখনই আমরা একটা শব্দ শুনতে পাই।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, বায়ু বা অন্য কোন মাধ্যমের সাহায্যেই শব্দের ঢেউ তৈরি হয়, তৈরি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। বিজ্ঞানের ভাষায়, একটি মাধ্যমের প্রয়োজন শব্দকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। মাধ্যমটি যদি কঠিন হয়, বা হয় তরল, তাতেও শব্দ ছড়িয়ে পড়ার কোন অসুবিধে হয় না।

কোন মাধ্যম ছাড়া শব্দ ছড়িয়ে পড়ে না। একটি সহজ পরীক্ষা দিয়ে এটা দেখানো যায়। একটা আবদ্ধ জায়গায় একটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা নেওয়া হল। বাইরে থেকে সুইচ টিপে ঘণ্টাটি বাজানো হল। শব্দ বেশ শোনা যাচ্ছে। এবারে আবদ্ধ জায়গা থেকে সমস্ত বায়ু সরিয়ে দাও পাম্প করে। দেখবে ঘণ্টাটি নড়ছে, তবে কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। আবার বায়ু ভরে দাও আবদ্ধ জায়গার ভিতরে, দেখবে, ঘণ্টার শব্দ আবার শোনা যাচ্ছে।

বায়ুর মধ্যে শব্দের ঢেউ কী করে তৈরি হয় জান? যে-কোন জিনিসে যদি ঘা দেওয়া যায় তবে তা কাঁপতে থাকে।

বায়ুর মধ্যে কোন জিনিস কাঁপতে থাকলে বায়ুতে চাপের তারতম্য হয়। ফলে সৃষ্টি হয় অসংখ্য ঢেউয়ের। এরাই ছুটে চলে বায়ুর মধ্য দিয়ে। আমরা শুনি শব্দ।

ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে তাহলে, যখনই কোন জিনিস কাঁপে তখনই সৃষ্টি হয় শব্দ। হাতে একখানা কঞ্চি নিয়ে বায়ুর মধ্যে সেখানা আন্দোলিত করেই দেখ না কোন শব্দ শোনা যায় কি না! না, কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না। এবারে কঞ্চিখানা বেশ জোরে দোলাতে থাক। দেখবে সপাং করে একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। প্রথমবারেও কঞ্চিখানা কেঁপেছে, দ্বিতীয়বারেও তাই। তবে? এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? কারণটা হল কম্পন-সংখ্যা। প্রথমবারে কঞ্চিটা আস্তে আস্তে কেঁপেছে, দ্বিতীয়বারে দ্রুত তালে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, প্রতি সেকেণ্ডে কম-সে কম সাতাশ-বার কাঁপলে তবেই শোনবার মত শব্দ সৃষ্টি হয়। অবশ্য কারো-কারো সেকেণ্ডে ২০ বার কম্পনের শব্দও শোনার ক্ষমতা আছে। প্রতি সেকেণ্ডে কোন জিনিস যতবার কাঁপে তাকে তার তত কম্পন-সংখ্যা বলতে পারি। কম্পন-সংখ্যা যত কম হবে শব্দ হবে তত গম্ভীর এবং মোটা। কম্পন-সংখ্যা যত বাড়তে থাকবে শব্দও হবে তত কর্কশ। এমনিভাবে কম্পন-সংখ্যা বেড়ে বেড়ে যদি সেকেণ্ডে বিশ হাজার বারের উপরে ওঠে তবে যে শব্দ তৈরি হয় তা আমরা শুনতে পাই না। ঐ জাতীয় শব্দকে বলে সুপারসোনিক শব্দ। বাংলায় তাকে 'শব্দহীন শব্দ' বলতে পারি আমরা। শব্দহীন শব্দ সম্বন্ধে পরে বলা হবে।

নানা ধরনের শব্দ

শব্দ সৃষ্টি হয় নানাভাবে। কোন মানুষ যতই চিৎকার করুক না কেন সে সেকেণ্ডে আটশোর বেশি কম্পন তৈরি করতে পারে

না। আবার কারো কণ্ঠস্বর যতই গম্ভীর এবং রাশভারি হোক না, সেকেণ্ডে অন্ততপক্ষে তাকে নব্বই বার বায়ুর কম্পন তৈরি করতেই হবে। নানারকম বাদ্যযন্ত্রের কথা তোমরা জান। এ-সব যন্ত্রে সেকেণ্ডে ৩০ বারের চেয়ে কম, আর ৪০ হাজার বারের চেয়ে বেশি কম্পন তৈরি হতে পারে না।

অন্ধকারে আমাদের চলাফেরা করতে কতই না অসুবিধে। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে বাদুড়ের চলাফেরায় কোন অসুবিধেই হয় না। অন্ধকারে উড়তে ওদের কোন বিপদ আসে না। কোথাও কোন ধাক্কাও ওরা খায় না। বিজ্ঞানীরা বলেন, বাদুড়রা সেকেণ্ডে ৫০ হাজার বার কম্পন-বিশিষ্ট শব্দহীন শব্দ তৈরি করতে ভারি ওস্তাদ। অন্ধকারের মধ্যে অমনি ধরনের শব্দ কোন দেয়াল বা গাছের ডাল থেকে প্রতিফলিত হয়ে চলে আসে। প্রতিফলিত শব্দ শুনেই বাদুড়রা হিসেব করে নেয় যে দেয়ালটা কত দূরে আছে। বাদুড়রা শব্দহীন শব্দ যেমন তৈরি করতে পারে তেমনি আবার তা শোনার ক্ষমতাও রাখে। তার উপর দূরত্ব হিসেব করার ব্যাপারেও ওরা ওস্তাদ। এক কথায় আমরা বলতে পারি, বাদুড়ের মাথার ভিতরে রয়েছে অতি-আধুনিক যন্ত্রপাতি-ভরা একটি পরীক্ষাগার আর কি!

কত তাড়াতাড়ি শব্দ ছুটে চলে

আগেই বলেছি, বায়ু বা অন্য যে-কোন মাধ্যমের ভিতর দিয়ে শব্দ চলতে পারে। কিন্তু কী গতিতে? বিজ্ঞানীরা বলেন, সাধারণ অবস্থায় বায়ুর ভিতর দিয়ে সেকেণ্ডে প্রায় ১১০০ ফুট গতিতে শব্দ ছুটে চলে। অবশ্য বায়ুর ভিতরে জলীয় বাষ্পের কম বেশির জন্যে শব্দের গতিবেগ কম বেশি হতে পারে। তাছাড়া, বায়ুমণ্ডলের তাপের উপরও এটা নির্ভর করে। তাপ বাড়লে গতিবেগ বাড়ে, আর তাপ কমলে তা কমে। দূরে একখানা রেলগাড়ি আসছে হুইসল

বাজিয়ে। তুমি ধোঁয়া দেখলে, হুইস্‌লের শব্দ শুনলে একটু পরে; যদিও হুইস্‌ল্‌ দেওয়া এবং ধোঁয়া ছাড়া একই সময়ে ঘটেছে। কারণটা সহজ। আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল, আর শব্দের গতিবেগ সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট। কাজেই আলোটা আসছে সঙ্গে-সঙ্গেই; তাই তার ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে শব্দের আগেই।

অবশ্য জলের ভিতর দিয়ে যখন শব্দ চলতে থাকে তখন তার গতিবেগ হয় সেকেণ্ডে প্রায় ৪৪০০ ফুট। অন্যান্য কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়েও শব্দের গতিবেগ হয় বায়ুর চেয়ে বেশি।

শব্দের প্রতিফলন

কোন আয়নার গায়ে আলো পড়লে তা প্রতিফলিত হয়। আমরা পাই প্রতিবিম্ব। ঠিক তেমনি কোন দেয়াল বা দূরের গাছপালার গা থেকেও শব্দ প্রতিফলিত হয়। প্রতিফলিত শব্দকে আমরা বলি প্রতিধ্বনি বা একো। এমনও হতে পারে যে, শব্দ একবার, দু-বার বা তারও বেশিবার প্রতিফলিত হচ্ছে। ফলে একবার শব্দ করলে তার অনেকগুলো প্রতিধ্বনি শোনা যায়। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানা প্রদেশের একটি শহরে বাড়িগুলো এমনভাবে তৈরি যে, সেখানকার কোন রাস্তায় কোন শব্দ করলে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায় কয়েকবার ধরে। এ শহরের কোন একটা জায়গায় ইংরেজি নিকার-বোকার কথাটি জোরে চেঁচিয়ে বললে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায় অন্ততপক্ষে কুড়ি বার। তোমাদের মধ্যে অনেকে আগ্রার তাজমহল, ফোর্ট প্রভৃতি দেখে থাকবে। তারা নিশ্চয়ই জান যে, এসব জায়গার কোন-কোন প্রাসাদ এমনভাবে তৈরি যে চেঁচিয়ে কিছু বললে সে শব্দ মিলিয়ে যেতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। গাইড এটা হাতে-কলমে দেখিয়ে দেন। কুমায়ুন পর্বতে একটা গুহা আছে যেখানে কোন সামান্য শব্দও অনেকবার শোনা যায়। একবার একটা সাপ গিয়ে আশ্রয় নেয় সে গুহায়। তার ফোঁসফোঁসানি

শুনে লোকে ভাবত ওখানে বুঝি আছে হাজার হাজার সাপ। পরে অবশ্য আসল সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছিল।

প্রতিধ্বনি নানা কাজে লাগে

শব্দের প্রতিধ্বনি সৃষ্টির ব্যাপারটা আবার বিজ্ঞানীরা নানা কাজে লাগিয়েছেন। সমুদ্রে জাহাজ চলবার সময় হয়ত কুয়াশায় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। জাহাজ চালানোয় বিপদ অনেক, সার্চলাইটে কিছুই দেখা যায় না। কোথায় কোন বরফের পাহাড়ে ধাক্কা লাগবে জাহাজের কে বলতে পারে! কোন জাহাজ এরকম অবস্থায় পড়লে জাহাজের 'ফগ হর্ন' বাজানো হয়। 'ফগ হর্ন' হল এমন একরকম হর্ন যা জাহাজ কুয়াশায় আটকা পড়লেই বাজানো হয়। সে শব্দ দূরের কোন বরফের পাহাড় থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে আবার জাহাজে। শব্দের যাতায়াতে কতটুকু সময় লেগেছে, তা থেকেই হিসেব করে নেওয়া হয় পাহাড়টা কত দূরে আছে। জাহাজের ক্যাপ্টেনও সেই অনুসারেই সাবধান হতে পারে।

সমুদ্রের গভীরতা মাপবার জন্যেও প্রতিফলিত শব্দ কাজে লাগানো হয়। এক বিশেষ কম্পনবিশিষ্ট শব্দ তৈরি করে তা জলের ভিতর দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হয়। সে শব্দ সমুদ্রের তলা থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। ফিরে আসতে সময় কতটা লাগে তা থেকে হিসেব করে বের করতে হয় সমুদ্রের তলাটা কত দূরে আছে।

তবে, প্রতিধ্বনি আমাদের নানাভাবেই বিরক্তির উদ্রেক করে থাকে। বক্তৃতা, গান প্রভৃতি করতে গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় যে, যে-সব ঘরে গান বা বক্তৃতা হচ্ছে সেখানে ঘরের দেয়াল থেকে শব্দ প্রতিফলিত হয়ে আসল শব্দকে ভাল করে শুনতেই দেয় না। অনেক সিনেমা, থিয়েটার-গৃহেরও এ দোষ দেখা যায়। সেজন্যে আজকাল থিয়েটার বা সিনেমা-গৃহের দেয়াল শব্দ যাতে শুষে নিতে

পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। এতে করে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হয়ে বিরক্ত করতে পারে না। সাধারণ ইটের দেয়ালের সামনে অ্যাসবেসটসের দেয়াল বসিয়ে দিলেই এ কাজটি চলতে পারে ভালভাবে।

শব্দের গুণাগুণ

কোন শব্দ মোটা, কোন শব্দ কর্কশ। আমার পাশের বাড়ি একটি ভদ্রমহিলা আছেন যাঁর গলার স্বর শুনলেই আমার ভাঙা কাঁসর বাজানোর শব্দ মনে পড়ে যায়। ভাঙা কাঁসর বাজানো শুনেছ কখনো? শুনলে, শব্দও যে মানুষের কত বিরক্তির উদ্রেক করতে পারে তা বুঝতে পারবে তখন।

এ তো গেল শব্দের একটা দিক। তাছাড়া একই শব্দ কাছে থেকে শুনলে বেশ স্পষ্ট শোনা যায়; যত দূরে যাওয়া যাবে ততই তা মৃদু হতে থাকবে। এ সম্বন্ধে একটি নিয়ম আছে। যেখানে শব্দটি সৃষ্টি হচ্ছে সেখান থেকে কোন জায়গার দূরত্ব দ্বিগুণ হলে শব্দ শোনা যাবে চারভাগের একভাগ মৃদুভাবে।

শব্দের জোর মাপবার জন্যে যে একক ব্যবহার করা হয় তার নাম 'বেল'। নামটি এসেছে আলেকজাণ্ডার গ্র্যাহ্যাম বেলের নাম থেকে। তোমাদের জানা আছে যে, গ্র্যাহ্যাম বেলই টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন। এক 'বেলের' (bel) দশভাগের এক ভাগের নাম 'ডেসিবেল' (decibel)। কী রকম শব্দে কত বেল হয় তার মোটামুটি একটা হিসেব তোমাদের দিচ্ছি। তুমি যখন ফিসফিস করে কথা বলছ তখন তোমার শব্দের জোর হবে দশ থেকে কুড়ি ডেসিবেলের মধ্যে। একটা অফিসের কথা ধর না। একটা সওদাগরি অফিসের কথাই আমি বলছি। ওসব অফিসে ভারি কড়াকড়ি আইন। কাজের কথা ছাড়া একটি কথাও বলেন না কেরানিবাবুরা। এ-রকম একটা অফিসে তবুও যেটুকু শব্দ হয় তার জোর কুড়ি থেকে চল্লিশ ডেসিবেলের মধ্যে। সাধারণ কথাবার্তার

জোর ষাট ডেসিবেলই হবে। রাস্তা দিয়ে একটি লরি চলে গেল, রাস্তা, ঘর-দোর কাঁপিয়ে। শব্দের জোর সত্তর ডেসিবেল হবে বই কি। ট্রেনের শব্দও কম নয় একেবারে, প্রায় একশো ডেসিবেলের মত। বিদ্যুৎ চমকাল। কড়-কড় কড়াৎ! কাছেই বাজ পড়েছে কোথাও। শব্দের জোর একশো দশ ডেসিবেল। জোরালো শব্দ কারোর ভাল লাগে না। ১২০ থেকে ১৩০ ডেসিবেল জোর যে সব শব্দের তা শুনতে রীতিমত কষ্ট হয়।

জোর ছাড়া শব্দের আর একটা গুণ আছে। তাকে আমরা বাংলায় বলতে পারি তীক্ষ্ণতা বা কর্কশতা। ইংরেজিতে বলে পিচ। কারো গলার স্বর ভারি কর্কশ, কারোর বা গম্ভীর। আমাদের জানা আছে, কোন বস্তু কেঁপেই শব্দের সৃষ্টি করে। প্রতি সেকেণ্ডে কম্পন-সংখ্যা যত বেশি হবে ততই শব্দ হবে কর্কশ। মোটা গলায় কথা বললে বায়ুর কম্পন-সংখ্যা হয় খুবই কম। ফলে এ শব্দের পিচও কম।

সঙ্গীত

গানও আসলে শব্দই। খোকা চিৎকার করতে শুরু করলে কার ভাল লাগে বল! অথচ নাম-করা একজন গায়ক যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারস্বরে চিৎকার করে যাচ্ছেন তোমার সামনে বসে তখন কিন্তু তুমি একটুও বিরক্ত হচ্ছ না। বরং মাঝে মাঝে বাহবা দিচ্ছ। উৎসাহিত করছ গায়ককে। বোঝা যাচ্ছে, তোমার ভালই লাগছে। তোমার কানে গায়কের চিৎকার মধু বর্ষণ করছে। খোকার চিৎকার আর গায়কের চিৎকার—এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য তাহলে কোনখানটায়?

গোলমাল, চিৎকার, হৈ-চৈ কানে পীড়া দেয়। আমরা অনবরত গোলমাল শুনলে বলি, কান ঝালাপালা করছে। কথাটা ঠিক তাই। কান ঝালাপালা হয় যে শব্দে তাকে বলি আমরা গোলমাল। কান

এবং মনের তৃপ্তি দেয় যে শব্দ তাকে বলি আমরা সঙ্গীত। বিজ্ঞানের ভাষায় অবশ্য এরা উভয়েই শব্দ। কোন বস্তুর কম্পনেই এরা উভয়ে সৃষ্টি হয়েছে। তবে গানের বেলা শব্দের ঢেউ নানা ধরনের শৃঙ্খলা মেনে চলে। গোলমালের বেলা অবশ্য তা হয় না। বায়ুর মধ্যে এলোপাথাড়ি ঢেউই সৃষ্টি করে গোলমাল। সঙ্গীত বলতে আমরা কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্র-সঙ্গীত প্রভৃতির কথাই বলছি।

যন্ত্র-সঙ্গীতের কথা বলতে গিয়ে নানা ধরনের বাদ্য-যন্ত্রের কথা মনে পড়ে। এর মধ্যে কতগুলিতে হল তার লাগানো—তারের সাহায্য নিয়ে সে যন্ত্রে নানা ধরনের মিষ্ট শব্দ তৈরি করাই ওস্তাদ ব্যক্তির কাজ। বেহালা, এস্রাজ, সেতার, গীটার প্রভৃতি এ ধরনের বাদ্য-যন্ত্র।

কতগুলি যন্ত্র আছে যেখানে বায়ুর সাহায্যেই মধুর শব্দের সৃষ্টি হয়ে থাকে। বাঁশির কথাই ধর না। বাঁশির মুখে ফুঁ দিলে ভিতর-কার বায়ুর মধ্যে একটা কাঁপন শুরু হয়। এই কাঁপনই শব্দের সৃষ্টি করে। ঢাক, ঢোল, তবলা প্রভৃতি যন্ত্রে কিন্তু তারও ব্যবহার করা হয় না, আবার ফুঁ দিয়ে বায়ুর কাঁপন তৈরি করাও হয় না। এ-সব যন্ত্রের মুখে টাইট করে বাঁধা থাকে একখানা চামড়া, যার উপর কাঠির ঘা পড়লে ভিতরকার বায়ুতে একটা কাঁপন শুরু হয়। এই কাঁপনই আমাদের কাছে নানা ধরনের শব্দের সৃষ্টি করে। চামড়ার উপর কাঠির আঘাতের জোর কমিয়ে বাড়িয়ে নানা ধরনের মিষ্ট শব্দ তৈরি করা হয়।

গ্রামোফোনের কথা

আগেই বলেছি, বায়ুর ভিতর দিয়ে যখন শব্দ চলাফেরা করে তখন চাপের তারতম্য ঘটে সেখানে। বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রতি সেকেণ্ডে কম্পনসংখ্যা যত হবে ঠিক ততবারই বায়ুর মধ্যে চাপের বাড়তি

কমতি হবে। এই ব্যাপারটাকে ফোনোগ্রাফের রেকর্ড বানানোর কাজে লাগানো হয়েছে।

ফোনোগ্রাফ আবিষ্কার করেন টমাস এডিসন। তিনি মুখের সামনে রাখলেন একখানা পর্দা। এখানে কথা বললে পর্দা কাঁপতে থাকবে, আর তার উল্‌টো দিকে চাপের কমতি বাড়তি হতে থাকবে। সেখানে যদি লাগানো থাকে একটা পিন, আর পিনটা লাগানো থাকে যদি মোম-ঢাকা কোন জিনিসের উপর তাহলে কী ঘটবে? পর্দার কাঁপুনির সঙ্গে সঙ্গে পিনটা মোমের উপর দাগ কাটতে থাকবে। এ দাগগুলোর গভীরতা কোন জায়গায় কম, আবার কোন জায়গায় বেশি। অনেকটা এভাবেই তৈরি করা হয় গ্রামোফোনের রেকর্ড। এখন, যদি উলটো ব্যাপার ঘটানো যায় তবে কী হয় দেখা যাক। এবড়ো থেবড়ো পথে গাড়ি চালালে গাড়ি কি কখনো না লাফিয়ে পারে? রেকর্ডের উপরকার দাগের উপর দিয়ে পিন চালালে পিনটা কখনো উপরে উঠবে, কখনো নিচে নামবে। এর ফলে পর্দাটা কাঁপতে থাকবে। তৈরি করবে শব্দ, ঠিক যেমনটির সাহায্য নিয়ে রেকর্ড বানানো হয়েছিল।

গ্রামোফোন রেকর্ড বানানোর এই-ই উপায়। তবে, যত সহজে ব্যাপারটা বলা হল তা যে অত সহজ একেবারেই নয় তা বলাই বাহুল্য।

শব্দহীন শব্দ

যে শব্দ আমরা শুনতে পাই না তাকেই আমরা বলি শব্দহীন শব্দ বা সুপারসোনিক সাউণ্ড। এ-জাতীয় শব্দকে কখনো কখনো আলট্রা-সোনিক শব্দও বলা হয়। এ সম্বন্ধে আগেই উল্লেখ করেছি। এখানে শোন শব্দহীন শব্দের নানারকম ব্যবহারের কথা।

সেকেণ্ডে কুড়ি হাজার বারের বেশি যদি কাঁপে কোন জিনিস তবেই শব্দহীন শব্দেরসৃষ্টি হবে, অর্থাৎ যে-জাতীয় শব্দ আমাদের

কানে শুনতে পাই না। বাদুড়ের কথা তো আগেই উল্লেখ করেছি। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, কোন-কোন জাতের ফড়িং সেকেণ্ডে চল্লিশ হাজার বার কম্পন-বিশিষ্ট শব্দহীন শব্দ তৈরি করবার ক্ষমতা রাখে। এ-জাতীয় শব্দ দিয়েই তারা নাকি তাদের জাতভাইদের সঙ্গে কথা-বার্তা চালায়। বিড়াল, ইদুঁর, গিনিপিগ—এদেরও নাকি শব্দহীন শব্দ শোনার ক্ষমতা আছে।

গত যুদ্ধের সময় সমুদ্রের তলায় লুকোনো পাহাড় খুঁজে বের করার কাজে শব্দহীন শব্দ ব্যবহার হয়েছিল। তা ছাড়া বর্তমানে শব্দহীন শব্দ নানা ধরনের কাজে লাগানো হচ্ছে। ধোঁয়ার মধ্যে যে কঠিন বা তরল পদার্থের কণা আছে তা জমাট বাঁধানোর ব্যাপারে শব্দহীন শব্দ কাজে লাগানো হয়। অন্ধ লোক আলট্রা-সোনিকের সাহায্য নিয়ে সহজভাবে রাস্তায় চলাফেরা করতে পারে। খুব তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় পরিষ্কার করার কাজেও শব্দহীন শব্দের বন্দুকগুলো বিশেষ কার্যকরী। তাছাড়া এ-জাতীয় শব্দ নানা রোগ-জীবাণু ধ্বংস করবার ক্ষমতা রাখে।

শব্দহীন শব্দের শক্তিও অসীম। সাধারণভাবে বেশকয়েক হাজার লোক ঘণ্টাদেড়েক কথাবার্তা বললে যে শক্তি সৃষ্টি হয় তা দিয়ে বড়জোর এক কাপ চায়ের জল গরম হতে পারে। কিন্তু শব্দহীন শব্দের স্রোতে কোন মাছ পড়লে নিশ্চয়ই মুহূর্তকাল-মধ্যেই তার প্রাণহানি ঘটবে।

চুম্বকের গল্প

খোকা তার মাকে ম্যাজিক দেখাচ্ছিল। মামার কাছ থেকে সে হাতঘড়ির মত দেখতে একটা যন্ত্র পেয়েছে! মহা খুশি সে ওটা পেয়ে। ঘড়ির মত কাঁটা রয়েছে যন্ত্রটাতে; তার উপর আবার চারদিকে দাগ কাটা। মহা উৎসাহে সে মাকে বললে, 'তোমার যেদিকে খুশি ঘুরিয়ে দাও ওটা। দেখবে, কাঁটা সব সময় একই দিকে থাকবে। আমি যে ওটাকে মন্ত্র দিয়ে জাদু করে রেখেছি!'

খোকার মা খোকার কথা শুনে তো অবাক! পরীক্ষাও করা হল। যেদিকেই গোলাকার যন্ত্রটি ঘোরানো যাক, কাঁটাটি তার ঘুরে ফিরে সেই একই দিকে এসে দাঁড়াচ্ছে। কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করে খোকার মা বলেন, 'তা তুমি দেখছি মস্ত জাদুকর হয়ে উঠেছ!'

উৎসাহিত হয় খোকা। বলে, 'জান, কাঁটাটা সবসময় উত্তর দক্ষিণে থাকে। দেখেছ?'

'তাই বুঝি? তুমি নিশ্চয়ই উত্তর দক্ষিণ দিকে থাকবার জন্যেই জাদু করেছ কাঁটাটাকে?' মা প্রশ্ন করেন।

খোকা দ্বিগুণ উৎসাহে বলে, 'ঠিক তাই।'

খোকার মা বাইরে বিস্ময় প্রকাশ করলেও তিনি ঠিকই জানেন যে, ওটা আসলে একটা কম্পাস। তোমরাও নিশ্চয়ই খোকার জাদুবিদ্যার কথা শুনে অবাক হচ্ছ না। তোমরাও জান, কম্পাসের কাঁটাটা সব সময় উত্তর দক্ষিণ দিকেই মুখ করে থাকে। এই ছোট্ট যন্ত্রটি দিক চেনার ব্যাপারে আমাদের নানাভাবে সাহায্য করে।

ছোট বড় কত রকমেরই না কম্পাস আছে। সমুদ্রগামী জাহাজে যে বড় আকারের কম্পাস ব্যবহার হয় তাকে বলে 'ম্যারিনারস্ (নাবিকের) কম্পাস'। খোকার ছোট্ট কম্পাসটি আর ম্যারিনারস্

কম্পাস আসলে একই জিনিস। তবে ম্যারিনারস্ কম্পাস আকারে বড়, আর বেশি শক্তিশালী। তার উপর সমুদ্রের ঢেউতে জাহাজ সব সময় দোলে। এ দোলানির সঙ্গে যাতে কম্পাসের কাঁটা এদিক সেদিক দুলতে না পারে তার ব্যবস্থা থাকে এ কম্পাসে।

লোড স্টোন

যে-কোন কম্পাসের কাঁটাটি আসলে একটি চুম্বক। আগেকার দিনে খনির মধ্যে একরকম পাথর পাওয়া যেত যার দুটি বিশেষ গুণ রয়েছে বর্তমান। এক, এরা ছোট-ছোট লোহার টুকরো নিজেদের দিকে টেনে নেয়। ভাল বাংলায় বললে আমরা বলতে পারি, আকর্ষণ করে। দুই, এ জাতীয় একটুকরো পাথরকে যদি একটা কাঠির আকার দেওয়া হয়, তারপর যদি তার মাঝখানে একটি সুতো বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তবে দেখা যাবে, সেটি উত্তর দক্ষিণ-মুখো হয়ে রয়েছে। প্রাচীন কালের লোকেরা এ পাথরের এই গুণদুটির কথা জানত। জানত বলেই সেকালে সমুদ্রগামী জাহাজে এ-জাতীয় পাথরের ব্যবহার খুব ছিল। একে বলা হত লোড স্টোন বা লীডিং স্টোন।

যে-কোন জিনিসের উপরের গুণদুটি থাকলেই তাকে বলা হয় চুম্বক। লোড স্টোনকে আমরা প্রাকৃতিক চুম্বক বলতে পারি। আজকাল অবশ্য কৃত্রিমভাবে নানারকম চুম্বক তৈরি করা হচ্ছে। এ-সব চুম্বক যে বহু কাজে লাগছে সে-কথা বলাই বাহুল্য। এ-সব কথায় আমরা পরে আসছি।

যীশুখ্রীস্টের জন্মের প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর আগে গ্রীস দেশে একজন বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। তাঁর নাম থেল্স্। তিনিই নাকি সবচেয়ে প্রথম লোড স্টোনের গুণের কথা প্রচার করেন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে।

চুম্বকের ইংরেজি নাম ম্যাগনেট। কথাটি এসেছে ম্যাগনেসিয়া কথা থেকে। ম্যাগনেসিয়া হল এশিয়া মাইনরের একটি প্রদেশের নাম। ও অঞ্চলে লোড স্টোন পাওয়া যেত প্রচুর। তাই এ নাম।

আগেকার দিনের বহু বইয়ে চুম্বক সম্বন্ধে খুব মজাদার সব গল্প আছে। আরব্য উপন্যাসের একটি গল্পে আছে যে, একখানা জাহাজ একবার এক পাহাড়ের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখা গেল, কাঠের তৈরি জাহাজের কাঠামো থেকে সব পেরেক একই সঙ্গে পটপট করে বেরিয়ে যাচ্ছে। ফলে জাহাজটি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। কারণ আর কিছুই নয়। ঐ পাহাড়টি ছিল লোড স্টোনে তৈরি। ব্যাপার দেখে অন্যান্য জাহাজের নির্মাতারা তাদের জাহাজে লোহার পেরেকের বদলে কাঠের পেরেক ব্যবহার করতে লাগল।

এশিয়া মাইনর অঞ্চলে ইডা নামে একটি পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ের ঢালুতে একটি লোক মেষ চরাতো। লোকটির নাম ম্যাগনেস। একদিন সে অবাক হয়ে দেখল যে, তার হাতের লোহার লাঠিটার একটা মাথা মাটির দিকে ঘুরে যাচ্ছে অনবরত। লোকটি মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করল লোড স্টোনের খনি। অনেকে বলেন, এই ম্যাগনেসের নাম থেকেই এসেছে ম্যাগনেট কথাটি। আসলে এটা গল্পই।

কৃত্রিমভাবে তৈরি চুম্বক

কৃত্রিমভাবে তৈরি ম্যাগনেটের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। ইস্পাতের একটা শলাকা নিয়ে তাকে একখণ্ড লোড স্টোন দিয়ে বারকয়েক ঘষলেই ইস্পাতটা চুম্বক হয়ে যাবে। তার মানে, এ চুম্বকটা লোহার গুঁড়ো আকর্ষণ করবে; আবার সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে দিলে তা উত্তর দক্ষিণ দিকে ঘুরে স্থির হয়ে থাকবে।

শুধু লোড-স্টোন কেন? যে-কোন চুম্বক দিয়ে এক টুকরো লোহা বা ইস্পাতকে বারকয়েক ঘষলেই লোহা বা ইস্পাতের টুকরো চুম্বকত্ব পায়।

অন্যভাবেও চুম্বক বানানো যায়। আসলে শক্তিশালী চুম্বক বানাতে হলে ঘষে তেমন সুবিধে হয় না। এ কাজে ব্যবহার করা যায় তড়িৎ বা ইলেকট্রিসিটি। এ-জাতীয় চুম্বককে বলা হয় ইলেকট্রো-ম্যাগনেট। যদি স্থায়ী চুম্বক বানাতে হয় তবে একখণ্ড ইস্পাত নিতে হবে। ইস্পাত-খণ্ডের চারদিকে ইলেকট্রিক তার জড়িয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালালেই ইস্পাতটি স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হবে। আর যদি অস্থায়ী চুম্বক দরকার হয় তবে নিতে হবে সাধারণ লোহা। যে-রকম আকারের চুম্বক দরকার ঠিক সে-রকম আকারের লোহা নিতে হবে। এবার এর চারদিকে ইলেকট্রিক তার জড়িয়ে তার ভিতর দিয়ে যদি তড়িৎ-প্রবাহ চালানো যায় তবে দেখা যাবে যে, যতটা সময় তড়িৎ-প্রবাহ চলছে ঠিক ততটা সময়ই লোহার টুকরোটা চুম্বকে পরিণত হয়ে রয়েছে। যেই না তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করে দেওয়া হল অমনি লোহাও তার চুম্বকত্ব হারিয়ে ফেলল। এ-জাতীয় অস্থায়ী ইলেকট্রো-ম্যাগনেট, ইলেকট্রিক বেল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়। কোন ভারি লোহার বীম উপরে তুলতে হবে। কিছু ভাবনা নেই। একটি জোরালো এবং অস্থায়ী ইলেকট্রো-ম্যাগনেট দিয়ে সহজেই এ কাজ হাসিল করা যায়।

চুম্বকের দুই মেরু

নানা আকারের চুম্বক দেখতে পাওয়া যায়। কোনটি শলাকার আকারে, কোনটি লম্বা মোটা পাতের মত, আবার কোনটি বাঁকানো, ঘোড়ার পায়ের নালের মত। বাঁকানো চুম্বকের নাম হর্স-শু ম্যাগনেট। লম্বা মোটা পাতের আকারের ম্যাগনেটকে বলা হয়

বার-ম্যাগনেট। চুম্বক নানা কাজে লাগে। যে-কাজে যেমনটি লাগে সেজন্যেই চুম্বকের নানা আকার, নানা আকৃতি। কিন্তু কোন চুম্বক, তা সে বার ম্যাগনেটই হোক বা চুম্বক শলাকাই হোক, ঝুলিয়ে দিলে তা উত্তর দক্ষিণ দিকে থাকবে সে কথা আগেই বলেছি। চুম্বকের যে মাথাটি পৃথিবীর উত্তর দিকে ঘুরে থাকে তাকে বলা হয় উত্তর মেরু বা নর্থ পোল। আর যে মাথাটি ঘুরে থাকে দক্ষিণ দিকে তাকে বলা হয় দক্ষিণ মেরু বা সাউথ-পোল।

কোন চুম্বকের কাছে লোহার গুঁড়ো রাখলে চুম্বক তা আকর্ষণ করে। কিন্তু লোহার গুঁড়োগুলো যদি ক্রমে দূরে সরিয়ে নেওয়া যায় তবে চুম্বকের আকর্ষণ আর তার উপর তেমন কাজ করতে পারবে না, অর্থাৎ গুঁড়োগুলোকে চুম্বক আর আকর্ষণ করতে পারবে না। অবশ্য কতটা দূর থেকে চুম্বক তার আকর্ষণ-ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারবে তা নির্ভর করে চুম্বকের ক্ষমতার উপর। একটা চুম্বক-শলাকা হয়ত সামান্য দূরে রাখা লোহার গুঁড়ো আকর্ষণ করতে পারে না। কিন্তু শলাকার বদলে একখানা বার মাগনেট রাখলে সে অনায়াসেই গুঁড়োগুলো আকর্ষণ করতে পারবে। যতটা জায়গার মধ্যে কোন চুম্বক তার আকর্ষণ করার ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারে তাকে বলা হয় চৌম্বক ক্ষেত্র। ইংরেজি করে বললে বলা হয়, ম্যাগনেটিক ফীল্ড।

কোন চুম্বকের উত্তর মেরু যদি অন্য কোন চুম্বকের উত্তর মেরুর কাছে আনা যায় তাহলে তারা একে অন্যকে দূরে সরিয়ে দেবে বা দেবার চেষ্টা করবে। শুদ্ধ ভাষায় বলা যায়, বিকর্ষণ করবে। আবার কোন চুম্বকের উত্তর মেরু যদি অন্য কোন চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর কাছে আনা যায় তবে দেখা যায় এদের মধ্যে রয়েছে আকর্ষণ, অর্থাৎ এরা একে অন্যকে কাছে টানবে। তাহলে আমরা বলতে পারি, এক জাতীয় চুম্বক-মেরু একে অন্যকে বিকর্ষণ করে, আর ভিন্ন ধরনের চুম্বক-মেরু একে অন্যকে আকর্ষণ করে।

পৃথিবীটা একটা চুম্বক

পৃথিবীর পিঠের উপর যে-কোন চুম্বকই ঝুলিয়ে রাখা যাক না, তাদের উত্তর মেরু সব সময়েই পৃথিবীর উত্তর দিকে ঘুরে থাকে আর দক্ষিণ মেরু পৃথিবীর দক্ষিণ দিকে ঘুরে থাকে। চুম্বকের উত্তর মেরু আকর্ষণ করে অন্য কোন চুম্বকের দক্ষিণ মেরু। তাই যদি হয় তবে পৃথিবীর উত্তর মেরুতে চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর গুণ-বিশিষ্ট একটি মেরু আছে কি? পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুতে আছে কি কোন চুম্বকের উত্তর মেরুর গুণবিশিষ্ট একটি মেরু? আসলে ব্যাপারটা সেইরকমই। কোন একখানা চুম্বক যদি পৃথিবীর উত্তর মেরুতে ঝুলিয়ে দেওয়া যায় তবে দেখা যাবে যে, চুম্বকের উত্তর মেরুটি একেবারে নিচু হয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে রয়েছে। আবার পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুতে যদি কোন চুম্বক ঝুলিয়ে দেওয়া যায় তবে দেখা যাবে যে, তার দক্ষিণ মেরুটি মাটির দিকে ঝুঁকে রয়েছে। এ থেকে আমরা বলতে পারি যে, পৃথিবী আসলে একটা বিরাট চুম্বক, যার উত্তর চুম্বক-মেরুটি রয়েছে দক্ষিণ মেরুর কাছে, আর দক্ষিণ চুম্বক-মেরুটি রয়েছে উত্তর মেরুর কাছে। তোমরা সহজেই অনুমান করতে পারছ যে, কী বিরাট সে চুম্বকটি!

তোমরা মেরু-জ্যোতি বা অরোরার কথা হয়ত জান। মেরু-প্রদেশে ছ-মাস ধরে চলে একটানা দিন, আবার ছ-মাস ধরে চলে একটানা রাত। মেরুপ্রদেশে যখন রাত, তখন মাঝে মাঝে আকাশের গায়ে ফুটে ওঠে অতি সুন্দর আলোর খেলা। একেই বলে অরোরা। উত্তর মেরুপ্রদেশের আকাশে যে আলো দেখা যায় তার নাম অরোরা বোরিয়ালিস। আর দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের আলোর নাম অরোরা অস্ট্রালিস। বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীর নিজের চুম্বকের মত গুণ আছে বলেই এ ব্যাপারটা ঘটে।

নানা ব্যাপারের জন্যেই পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকা দরকার। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিজ্ঞনীরা

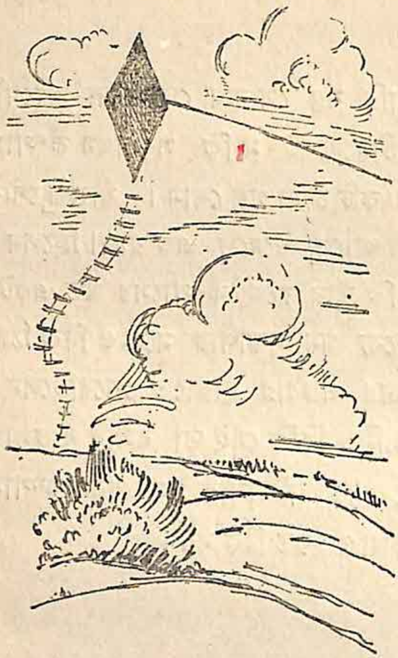
পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র সম্বন্ধে নানান তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

কম্পাসের আবিষ্কার

কম্পাস যে একটি বিশেষ দরকারি যন্ত্র সে কথা তোমাদের আগেই বলেছি। অনেকে বলেন যে, চীনদেশেই নাকি সর্বপ্রথম কম্পাস আবিষ্কৃত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে একটি চীনা গল্প শোন। যীশুখ্রীস্টের জন্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ওদেশে এক রাজা ছিলেন। নাম তাঁর ওয়াং-তি। তিনি নাকি তাঁর রথে কম্পাসের মত একটা যন্ত্র বসিয়েছিলেন। এর সাহায্যে ঘন কুয়াশার মধ্যেও দিক ঠিক করে তিনি নাকি তাঁর শত্রুদের একবার হারাতে পেরেছিলেন। তবে এসব গল্পের যে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই তা বলাই বাহুল্য।

অনেকের ধারণা যে, আরবদেশের অধিবাসীরাই সর্বপ্রথম কম্পাস আবিষ্কার করেন। কিন্তু সে কথাও হয়ত ঠিক নয়।

আকাশে ঘন মেঘের ঘটা। সূর্য ঢেকে গেছে সে মেঘে। শিগগিরই সে মেঘে বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করবে। এ-হেন দিনে কার শখ



ঘুড়ি ওড়াতে! তাও যদি ছেলেমানুষ হয় তবে সে কথা আলাদা। কিন্তু লোকটির বয়স হয়েছে। তিনি কিনা এ মেঘের দিনে আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে দিয়ে মহা খুশিতে তাকিয়ে আছেন আকাশের দিকে!

আকাশের মেঘে বিদ্যুৎ চমকালো। কড়-কড় কড়াৎ! গর্জে উঠল মেঘ। কি সব পরীক্ষা করলেন ভদ্রলোক। খুশিতে মুখে হাসি ফুটল তাঁর।

ভদ্রলোকের নাম বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন। বিজ্ঞানের নানা অদ্ভুত সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন তিনি। লোকে সে সব দেখে হাসত। বলত, পাগল।

নানারকম পাগলামির মধ্যে আকাশে মেঘ দেখলেই একখানা ঘুড়ি উড়িয়ে দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকা বেঞ্জামিনের আর এক পাগলামি।

১৭৫২ সালের একটি দিন। তুমি আমি কাগজ দিয়ে ঘুড়ি বানাই। বেঞ্জামিন কিন্তু ঘুড়ি বানালেন রেশম দিয়ে। সব ব্যাপারেই ভদ্রলোক একটু উদ্ভট প্রকৃতির। ঘুড়িটার মাথার দিকে ছোট্ট একটা লোহার তার উঁচু করে বসিয়ে দেওয়া হল। এই তারটাতেই ওড়াবার সুতো বেঁধে সেটি নিয়ে আসা হল নিজের কাছে। একেবারে শেষের দিকে জুড়ে দেওয়া হল খানিকটা রেশমি সুতো।

আসলে বেঞ্জামিন সেদিন আকাশের বিদ্যুৎকে এ-হেন ব্যবস্থায় টেনে এনেছিলেন মাটির পৃথিবীতে। প্রমাণ করলেন, বিজ্ঞানীর নানা যন্ত্রে যে তড়িৎ তৈরি করা হয় সে তড়িৎ আর আকাশের বিদ্যুৎ একই জিনিস।

ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে হলে আমাদের দীর্ঘদিন পিছিয়ে যেতে হবে। গোড়া থেকেই শুরু করতে হবে।

ঘষেই তড়িৎ বানানো যায়

শীতের দিনে মাথা আঁচড়িয়ে চিরুনিটা টুকরো টুকরো কাগজের কাছে ধরে দেখেছ কখনো? ধরে দেখলে দেখবে, কাগজের টুকরোগুলোকে চিরুনি টেনে আনছে নিজের দিকে। বিজ্ঞানীরা



বলেন, চিরুনির মধ্যে তড়িৎ সৃষ্টি হয়েছে। কি ভাবে? না, চুলের সঙ্গে চিরুনির ঘষাঘষির জন্যে। তাহলে কি আমরা বলতে পারি, দুটো জিনিস ঘষাঘষি করে তড়িতের সৃষ্টি করা সম্ভব? সম্ভব ঠিকই, তবে, যে-কোন দুটি জিনিস ঘষলেই তড়িৎ বানানো যায় না। এর নিয়ম আছে। শোন।

একটা কাচের দণ্ড নিয়ে তার এক মাথা একটুকরো রেশমি কাপড় দিয়ে ঘষলে দেখবে কাচের দণ্ডটিও কাগজের টুকরো টানবার গুণ পেয়েছে। আমরা বলি, কাচের ভিতরে তড়িৎ সৃষ্টি হয়েছে। এবোনাইট বা গাটাপার্চার কোন জিনিসকে যদি পশমি বা রেশমি কাপড়ের টুকরো দিয়ে ঘষা যায় সে-ক্ষেত্রেও এবোনাইট বা গাটা-পার্চার মধ্যে বিদ্যুৎ তৈরি হয়ে থাকে।

দুটি জিনিসের মধ্যে ঘষাঘষি করলে যে তড়িৎ সৃষ্টি হয় সে-কথা প্রাচীন কালের লোকেরাও জানত। তড়িতের ইংরেজি নাম ইলেকট্রিসিটি। বাংলায় আমরা তড়িৎ বা বিদ্যুৎ বলে থাকি। গ্রীক ভাষায় 'ইলেকট্রন' বলে একটা কথা আছে। কথাটির মানে 'অ্যাম্বার'। অ্যাম্বার হল একরকমের রজন-জাতীয় জিনিস। যীশুখ্রীস্টের জন্মের প্রায় ছশো বছর আগে গ্রীসদেশের একজন নামকরা দার্শনিক থেলস্ লক্ষ্য করেছিলেন যে, একখণ্ড অ্যাম্বারকে পশমি কাপড় দিয়ে ঘষলে অ্যাম্বারের মধ্যে একটা মজাদার ধর্ম ফুটে ওঠে। অ্যাম্বার তখন টুকরো টুকরো শুকনো ঘাস, পালক, ধুলো বা ঐ-জাতীয় কোন হালকা জিনিস টেনে নিতে পারে নিজের দিকে। থেলস্ মনে করলেন, এ-গুণটি বোধহয় একমাত্র অ্যাম্বারেরই আছে। অ্যাম্বারের গ্রীক নাম ইলেকট্রন থেকেই আধুনিক কালের ইলেকট্রিসিটি কথাটি আমরা পেয়েছি। অবশ্য পরে আমরা জেনেছি; ছোট ছোট হালকা জিনিস টেনে নেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র অ্যাম্বারেরই নেই, আছে কাচ, কাঠ, এবোনাইট, গাটাপার্চা, রবার, গন্ধক প্রভৃতি বহু জিনিসেরই।

তড়িৎ দু-রকম

বিজ্ঞানীরা আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। তাঁরা দেখলেন, ঘষে ঘষে যে তড়িৎ বানানো যায় তা দু-রকমের। যেমন ধর, কাচকে রেশম দিয়ে ঘষলে যে তড়িৎ বানানো যাবে তা গাটাপার্চাকে

রেশম দিয়ে ঘষলে যে তড়িৎ হবে তা থেকে একেবারেই আলাদা। একেবারে বিপরীতই বলা চলে। অবশ্য দু-ক্ষেত্রেই হালকা জিনিস টেনে নেওয়ার ধর্মটি ঠিকই থাকে। রবারের তৈরি একখানা চিরুনির মধ্যে যে তড়িৎ বানানো হল তা আর একখানা একই ধরনের চিরুনির মধ্যে তড়িৎ সৃষ্টি করে তার কাছে আনলে দেখা যায়, উভয়ের মধ্যে রয়েছে একে অন্যকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার একটা প্রবণতা। শুদ্ধ ভাষায় আমরা যাকে বলি বিকর্ষণ। আবার ঐ চিরুনির একখানা যদি কোন কাচের দণ্ডকে রেশম দিয়ে ঘষে তার কাছে আনা যায় তবে দেখা যাবে যে, এদের মধ্যে রয়েছে একটা টান; বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে আমরা বলি আকর্ষণ। এসব দেখে বিজ্ঞানীরা ঘষে বানানো তড়িৎকে দু-ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। কাচের মধ্যে যে তড়িৎ পাওয়া গিয়েছিল তার নাম তাঁরা দিয়েছেন ধন-বিদ্যুৎ বা পজিটিভ ইলেকট্রিসিটি; আর গাটাপার্চা বা এবোনাইটের মধ্যে যে তড়িৎ পাওয়া যায় তার নাম দেওয়া হল নেগেটিভ ইলেকট্রিসিটি বা ঋণ-বিদ্যুৎ। আমরা আমাদের বোঝবার সুবিধের জন্যে পজিটিভ বিদ্যুৎ আর নেগেটিভ বিদ্যুৎ কথা-দুটিই ব্যবহার করব।

এখানে আর একটা কথা তোমাদের জেনে রাখা ভাল। যে ধরনের বিদ্যুতের কথা আমরা এখানে বলছি তাকে বলা হয় ঘর্ষণ বিদ্যুৎ বা ফ্রিকশনাল ইলেকট্রিসিটি। অনেকে বলেন, স্থির বিদ্যুৎ বা স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি। এ-জাতীয় বিদ্যুৎ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় না কিনা, তাই এ নাম। তবে, বিদ্যুৎ যখন চলতে থাকে কোন তারের ভিতর দিয়ে তখন তাকে আমরা বলি চলমান বিদ্যুৎ বা কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি। এ বিদ্যুতের আরও একটা নাম আছে। চলমান বিদ্যুৎ সম্বন্ধে ভোল্টা নামে এক বিজ্ঞানী বহু আবিষ্কার টাবিষ্কার করেছেন। তাঁর নাম থেকেই কারেন্ট ইলেকট্রিসিটির আর এক নাম ভোল্টাইক ইলেকট্রিসিটি।

আলো জালানো, পাখা ঘোরানো, স্টোভ জালানো—এ সবই কারেন্ট ইলেকট্রিসিটির কারবার। এ সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে বলব।

তড়িৎ আসলে কী?

তড়িৎ জিনিসটা আসলে কী? আমরা সোজা কথায় বলতে পারি, তড়িৎ একপ্রকার শক্তি ; আলো, উত্তাপ বা শব্দের মত তড়িতেরও আছে কাজ করবার ক্ষমতা। কিন্তু তড়িৎশক্তির উৎস কোথায়? অর্থাৎ কোন জিনিসের মধ্যে এমন কী ঘটনা ঘটে যার জন্যে জিনিসটি তড়িৎশক্তি পায়? বলছি। তবে, তা বলার আগে একটুখানি অন্য কথা বলে নিই।

অণু পরমাণুর কথা আগেই বলেছি। দুনিয়ায় যত সব পদার্থ আছে তার কতগুলো যৌগিক পদার্থ বা কম্পাউণ্ড, আর কতগুলো মৌলিক পদার্থ বা এলিমেন্ট। শ-খানেক মৌলিক পদার্থের মধ্যে যোগাযোগ ঘটে সৃষ্টি হয়েছে আমাদের দুনিয়ার সব কিছু। যে-কোন পদার্থ, তা সে মৌলিকই হোক বা যৌগিকই হোক, তৈরি হয়েছে ক্ষুদ্র সব কণিকা দিয়ে। এদের বলা হয় অণু বা মলিকিউল। মলিকিউল আবার তৈরি হয়েছে পরমাণু বা অ্যাটম দিয়ে। আগেকার দিনে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, পরমাণুই পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ যা কোনক্রমেই ভাঙা যাবে না। কিন্তু সে ধারণা আজ আমূল বদলে গেছে।

পরমাণুর চেহারা কী রকম

পরমাণুর গঠনবিধি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের এখনকার ধারণা এই-রকম। পরমাণু তৈরি হয়েছে প্রধানত দু-ধরনের বিদ্যুৎ-কণিকা দিয়ে। এক রকমের নাম ধন-বিদ্যুৎ কণিকা বা প্রোটন। অন্য-রকম হল ঋণ-বিদ্যুৎ কণিকা বা ইলেকট্রন। একটি প্রোটনের

মধ্যে যতটুকু ধন–বিদ্যুৎ থাকে, একটি ইলেকট্রনের মধ্যে থাকে ঠিক ততটুকু ঋণ-বিদ্যুৎ। এর ফলে একটি ইলেকট্রন যদি একটি প্রোটনের সঙ্গে যুক্ত হয় তবে যে কণিকাটির সৃষ্টি হবে তার মধ্যে বিদ্যুৎ থাকবে না একটুও, কিন্তু তার ওজন হবে একটি প্রোটন কণিকারই সমান। কারণ একটি ইলেকট্রনের ওজন একটি প্রোটনের ওজনের তুলনায় একেবারেই সামান্য। ইলেকট্রন ও প্রোটনের মিলনে যে কণিকার সৃষ্টি তাকে বলা হয় নিউট্রন।

পরমাণুর দু-টি অংশ। কেন্দ্রস্থলে যে অংশটি রয়েছে তার নাম কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসে রয়েছে পরমাণুর ভিতরকার সব-কটি প্রোটন ও নিউট্রন। এখানে যতগুলো প্রোটন আছে ঠিক ততগুলো ইলেকট্রন কেন্দ্রীনের চারদিকে বিভিন্ন পথে ঘুরতে থাকে অনবরত। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কেন্দ্রীনের প্রোটন আর নিউট্রন, আর কেন্দ্রীনের বাইরের ইলেকট্রন দিয়েই তৈরি হয়েছে পরমাণু। বিভিন্ন জাতের পরমাণুর কেন্দ্রীনে প্রোটন নিউট্রনের সংখ্যা কম-বেশি। তার ফলে বাধ্য হয়েই কেন্দ্রীনের বাইরে ইলেকট্রনের সংখ্যা আলাদা আলাদা হবে। বিজ্ঞানীরা আরও বলেন যে, কেন্দ্রীনের চার-দিকের যে-সব গোলাকার পথে ইলেকট্রনরা ঘুরপাক খায় তার একেবারে বাইরের পথটিতে যে-সব ইলেকট্রন থাকে তাদের সহজেই পরমাণুর বাইরে সরিয়ে দেওয়া যায়।

সাধারণ অবস্থায় কোন পরমাণুর মধ্যে কোন তড়িৎ থাকে না, অর্থাৎ পরমাণুর মধ্যে যে ক-টি প্রোটন থাকে ঠিক ততটি থাকে ইলেকট্রন। এখন যদি কোন কারণে কোন পরমাণুর ভিতর থেকে কয়েকটি ইলেকট্রনকে বের করে দেওয়া যায় তবে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়? আগে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা ছিল সমান সমান। এখন কয়েকটি ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলে পরমাণুর

ভিতরে ইলেকট্রনের পরিমাণে ঘাটতি পড়বে। ইলেকট্রন আবার নেগেটিভ বিদ্যুতে ভরা। দেখা যাবে যে, পরমাণুর মধ্যে নেগেটিভ বিদ্যুতের ঘাটতি পড়েছে, অর্থাৎ পজিটিভ বা ধন-বিদ্যুতের পরিমাণ হয়েছে বেশি। একেই আমরা এক কথায় বলি, পরমাণুটি পজিটিভ বিদ্যুৎভাবাপন্ন হয়েছে।

কোন পদার্থকে অন্য কিছু দিয়ে ঘষলে অনেকটা এই-ধরনের ব্যাপারই ঘটে। ধরা যাক, কাচের দণ্ডকে রেশম দিয়ে ঘষা হচ্ছে। ঘষার জন্যে কাচ থেকে কিছুসংখ্যক ইলেকট্রন বেরিয়ে গিয়ে ঢুকে গেল রেশমের মধ্যে। ফলে কাচের মধ্যে ইলেকট্রনের ঘাটতি পড়ল, অর্থাৎ কাচ পজিটিভ বিদ্যুৎ-ভাবাপন্ন হল। আর রেশমের মধ্যে ইলেকট্রনের হল বাড়তি। ফলে রেশম হয়ে পড়ল নেগেটিভ বিদ্যুৎ-ভাবাপন্ন। আসলে কাচকে রেশম দিয়ে ঘষলে কাচে যেমন পজিটিভ বিদ্যুৎ তৈরি হয়, তেমনি আবার রেশমে হয় নেগেটিভ বিদ্যুৎ। কাচের মত অন্য যে-কোন পদার্থের বেলাও এই ধরনেরই ব্যাপার ঘটে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, তড়িৎ সৃষ্টি হওয়ার মানে হল কিছু-সংখ্যক ইলেকট্রনের এক পদার্থ থেকে অন্য পদার্থে যাওয়া। ইলেকট্রন জিনিসটি কী তা আমরা জানি। কাজেই ইলেকট্রনের ধারণা থেকে দু-ধরনের বিদ্যুতের ধারণাটাও আমরা বদলে নিতে পারি। ইলেকট্রনের ঘাটতির জন্যেই কোন পদার্থ হয় পজিটিভ বিদ্যুৎ-ভাবাপন্ন, আবার বাড়তির জন্যে কোন পদার্থ হয় নেগেটিভ বিদ্যুৎ-ভাবাপন্ন।

কোন-কোন পদার্থের মধ্যে ইলেকট্রন জমলে তা অনায়াসে জিনিসটির ভিতর দিয়ে চলাফেরা করতে পারে। আবার এমন অনেক পদার্থ আছে যার ভিতর দিয়ে ইলেকট্রনরা চলাফেরা করতে একদম পারেই না। যে-সব জিনিস ইলেকট্রনদের যাতায়াতে কোন বাধা দেয় না তাদের বলা হয় বিদ্যুতের

পরিবাহক বা কণ্ডাকটর। আর যে-সব জিনিস ইলেকট্রনদের অবাধ চলাফেরায় বাধা দেয় তাদের বলা হয় বিদ্যুতের অপরিবাহক বা ইনস্যুলেটর। কাঠ, রবার, এবোনাইট—এসব তড়িতের অপরিবাহক। আর কোন ধাতু, মানুষের শরীর, মাটি-এ-সব তড়িতের ভাল পরিবাহক।

তাহলে তোমরা দেখলে যে, ঘষে তড়িৎ বানানো যায়। কোন গাড়ি, ধর মোটর গাড়ি, যখন চলতে থাকে তখন তার চাকা অনবরত ঘোরে। মাটির উপর ঘষা লেগে লেগে সেখানে তড়িৎ তৈরি হওয়া বিচিত্র নয়। এ তড়িৎ যাতে কোন ক্ষতি করতে না পারে সেজন্যে অনেক গাড়ির পিছন দিকে ঝোলানো থাকে কোন ধাতুর তৈরি সরু সরু শেকল। তড়িৎ তৈরি হলে তা যাতে এই শেকলের গা বেয়ে মাটিতে চলে যেতে পারে তার জন্যেই এ ব্যবস্থা।

কোন জিনিসের মধ্যে তড়িৎ আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার নাম ইলেকট্রোস্‌কোপ। সাধারণত এ যন্ত্র দু-রকমের হয়ে থাকে। ছোট্ট একটি শোলার বল রেশমি সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে রেখে যে ইলেকট্রোস্‌কোপ বানানো হয় তার নাম হল 'পিথ্‌বল ইলেকট্রোস্‌কোপ।' ইংরেজি পিথ কথাটির মানে হল শোলা। আবার আর-এক ধরনের যন্ত্রে ব্যবহার করা হয় সোনার দু-টি খুব পাতলা পাত। এর নাম 'গোল্ড-লীফ ইলেকট্রোস্‌কোপ'।

না ঘষেও তড়িৎ বানানো যায়

ঘষে কোন জিনিসের মধ্যে বিদ্যুৎ তৈরি করা যায়, এ-কথা বোঝা গেল। কিন্তু আর-এক রকম ভাবেও বিদ্যুৎ তৈরি করা সম্ভব। এর জন্যে ঘষাঘষির কোন প্রয়োজন নেই। মনে কর, একটা লোহা বা অন্য কোন পদার্থে পজিটিভ তড়িৎ আছে।

ব্যাপারটার মানে হল যে, জিনিসটির মধ্যে নেগেটিভ বিদ্যুৎ কণা বা ইলেকট্রনের ঘাটতি আছে, অথবা প্রোটন আছে বেশি। এখন, ঐ জিনিসটি যদি কোন পরিবাহকের কাছে আনা যায় তবে ব্যাপারটা কী ঘটে? পরিবাহকটির মধ্যে ইলেকট্রন এবং প্রোটনের সংখ্যা আছে সমান সমান। পজিটিভ বিদ্যুৎ ভরা জিনিসটি যখন এর কাছে আনা হল তখন পরিবাহকটির ভিতর-কার ইলেকট্রনগুলোকে ঐ পজিটিভ বিদ্যুৎ টানতে থাকবে। ফলে পরিবাহকটির যে-ধারটা কাছে আছে-সে ধারে ইলেকট্রন-গুলো এসে ভিড় জমাতে থাকবে। একেবারে ছোঁয়াছুঁয়ি না হলে সেগুলো বেরিয়েও যেতে পারে না। ফলে আমরা দেখি যে, পরিবাহকটির কাছের অংশটার মধ্যে ইলেকট্রনের সংখ্যা বেশি। অন্যভাবে বলতে পারি, এ দিকটা নেগেটিভ বিদ্যুৎ-ভাবাপন্ন হয়েছে। অন্যদিকে রয়েছে ইলেকট্রনের ঘাটতি, অর্থাৎ সে-দিকটা হয়েছে পজিটিভ বিদ্যুৎ-ভাবাপন্ন। দেখা গেল, পরিবাহকটির এক মাথা নেগেটিভ বিদ্যুতে ভরা, অন্য মাথা পজিটিভ বিদ্যুতে। যত সময় পর্যন্ত বিদ্যুৎ-ভরা জিনিসটি পরিবাহকটির কাছে থাকবে ততক্ষণ পরিবাহকটির অবস্থা এরকমই থাকবে। তবে, বিদ্যুৎ-ভরা জিনিসটি ওখান থেকে সরিয়ে নিলে পরিবাহকটির ভিতরকার ইলেকট্রন প্রোটনরা আবার যার-যার পুরোনো জায়গায় ফিরে যাবে। তখন তার ভিতরে আলাদা কোন বিদ্যুতের হদিশই পাওয়া যাবে না। এমনি ধরনে কোন পদার্থের মধ্যে বিদ্যুৎ তৈরি করার নিয়মকে বলা হয় 'ইনডাকশন'। এভাবে আমরা একই সময় দু-রকমের বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারি।

মেঘে তড়িৎ আসে কোত্থেকে

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁর ঘুড়ির সাহায্যে আকাশের মেঘ থেকে তড়িৎ ধরে এনেছিলেন পৃথিবীর বুকে। কিন্তু মেঘে বিদ্যুৎ আসে

কোত্থেকে ? বায়ু যদি হয় গরম, আর তার মধ্যে থাকে যদি বেশি-রকমের জলীয় বাষ্প, তবে তা খুব হালকা হয়ে যায়। হালকা জিনিস আবার থাকে উপরে। জল আর তেল মিশিয়ে দেখেছ ? দেখবে, তেলটা জলের উপরে ভাসছে। কারণ কী ? না, তেল জলের চেয়ে হাল্কা। গরম বায়ুও তাই ছুটে উপরে উঠে যায়। উপরের আকাশে আবার বায়ুমণ্ডলের চাপ কম। কাজেই সেখানে গিয়ে বায়ু হঠাৎ আয়তনে বেড়ে যায়। আয়তনে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা খুব ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। ফলে বায়ুর ভিতরকার জলীয় বাষ্প জমে ছোট ছোট জলকণায় পরিণত হয়। জলকণাগুলো বেশ ভারি, আকাশে ভেসে থাকা সুবিধের হয় না। এরা তখন নিচের দিকে নেমে আসতে থাকে। পথে দেখা উপরে ওঠা গরম বায়ুর সঙ্গে। একদল জোরে নেমে আসছে, আর একদল ছুটে উঠছে উপরে। লেগে যায় হুড়োহুড়ি। এর ফলে জলকণা থেকে কিছু-কিছু ইলেকট্রন ছুটে বেরিয়ে যায় ; জমা হয় পাশের মেঘে। এমনিভাবে চলে বেশ খানিকক্ষণ। যে-সব জলকণা নিচে আসছে তাদের মধ্যে ক্রমে দেখা যায় ইলেকট্রনের ঘাটতি, অর্থাৎ তা পজিটিভ বিদ্যুতে ভরা। আর খুব ছোট-ছোট কণা যারা উপরে উঠে যাচ্ছে তাদের মধ্যে দেখা যায় ইলেকট্রনের বাড়তি, অর্থাৎ সেগুলো নেগেটিভ বিদ্যুতে ভরা। এমনিভাবে চলতে চলতে এক সময় দেখা যায় যে, একখানা মেঘ পুরোপুরি পজিটিভ বিদ্যুতে ভরে গেছে। পাশের মেঘখানা হয়ত ভরে গেছে নেগেটিভ বিদ্যুতে। নেগেটিভ আর পজিটিভ বিদ্যুতের মধ্যে রয়েছে আকর্ষণ। ফলে এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে লাফিয়ে যায় বিদ্যুৎ। একেই আমরা বলি বিদ্যুৎ চমকানো।

কোন একখানা মেঘের মধ্যে পুরোপুরি পজিটিভ বিদ্যুৎ বা নেগেটিভ বিদ্যুৎ থাকতে পারে। এমনও হতে পারে যে, একই মেঘের কিছু অংশে রয়েছে পজিটিভ বিদ্যুৎ, আবার অন্য অংশে রয়েছে নেগেটিভ বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ-ভরা কোন মেঘ যখন কোন বাড়ির

উপরে এসে হাজির হয় তখন ইনডাকশনের জন্যে বাড়ির ছাদের দিকটায় বিপরীত জাতের বিদ্যুৎ তৈরি হবে। মেঘখানায় যদি থাকে পজিটিভ বিদ্যুৎ তবে বাড়ির ছাদের দিকটায় তৈরি হবে নেগেটিভ বিদ্যুৎ। এদের মধ্যে চলবে আকর্ষণের পালা। ফলে কখনো কখনো মেঘ থেকে লাফিয়ে পড়ে বিদ্যুৎ বাড়িটার উপর। একেই আমরা বলি বজ্রপাত। বজ্রপাতে যে কত সময় কত ক্ষতি হয় তা আমাদের অজানা নয়।

বজ্রপাত থেকে বাড়িঘর বাঁচাবার জন্যে ছাদের উপর ত্রিশূলের মত সরু তার খাড়া করে রাখা হয়। তড়িতের একটা বিশেষ ধর্ম হল যে, কোন জিনিসের একেবারে ভিতরে না ঢুকে তা ছড়িয়ে থাকে তার উপরে। আবার, সরু বা সুচোলো জায়গা থেকে ছাদের উপরকার বিদ্যুৎ আকাশে বেরিয়ে যাবার সুযোগ পায়। কাজেই ছাদের উপর বেশি বিদ্যুৎ একসঙ্গে জমতে পারে না। এর ফলে বজ্রপাত থেকে রক্ষা পায় বাড়িঘর।

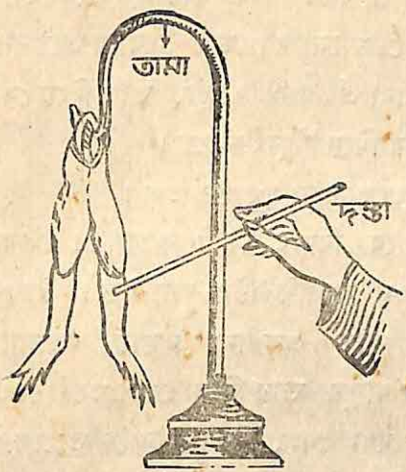
স্থির বিদ্যুৎ তৈরি করবার জন্যে নানারকম যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে। উইলিয়াম গিলবার্ট ছিলেন ইংল্যাণ্ডের রানী এলিজাবেথের একজন চিকিৎসক। তিনিই সর্বপ্রথম দেখান যে, গন্ধক, রজন, কাচ, হিরে এবং অন্যান্য জিনিসকে ঘষেই বিদ্যুৎ-ভাবাপন্ন করা যায়। অটো গেরিক বহুদিন আগেই স্থির বিদ্যুৎ বানানোর জন্যে একটি সহজ যন্ত্র বানিয়েছিলেন।

চল-বিদ্যুৎ বা কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি

ফ্র্যাঙ্কলিনের পরীক্ষার কথা আমরা আগেই বলেছি। এবারে শোন আর এক বিজ্ঞানীর গল্প।

ইটালির বোলোগ্না বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন গ্যালভানি। ইনি বহুদিন ধরেই, শরীরের স্নায়ু কী করে মাংস-পেশীর উপর কাজ করে এ নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। একদিন তিনি

অবাক হয়ে একটা মজার ব্যাপার দেখলেন। একটা পেতলের দণ্ড থেকে ঝোলানো ছিল একটা সদ্য-চামড়া-ছাড়ানো ব্যাঙ। কাছেই ছিল একটা লোহার দণ্ড। হাওয়ায় ব্যাঙের পা-টা গিয়ে যেই না লোহার গায়ে ছোঁয়া লাগল অমনি ব্যাঙের শরীরটা বেশ কুঁচকে উঠল। গ্যালভানি তো অবাক! তিনি বেশ কয়েকবার ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন। না, প্রতিবারই একই ঘটনা ঘটছে। পা-টা লোহার গায়ে লাগলেই ব্যাঙের দেহ কুঁচকে ওঠে। তিনি অনেক ভেবে ঠিক করলেন, দেহটা কুঁচকে ওঠার কারণ হল অন্য কোন শক্তির কাজ। এ শক্তির নাম দিলেন তিনি ইলেকট্রিসিটি। আর এ শক্তিটি আছে ব্যাঙের দেহে।



অনেকে বলেন, গ্যালভানি নাকি তার রুগ্না স্ত্রীর জন্যে ব্যাঙের মাংসের ব্যবস্থা করতে গিয়েই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন। এটা আসলে গল্পই। তা, যেভাবেই হোক, গ্যালভানিই প্রথম কারেণ্ট ইলেকট্রিসিটির কথা বলেছিলেন।

পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ছিলেন ভোল্টা। তিনি গ্যালভানির আবিষ্কারের কথা শুনলেন। শুনে বললেন, ব্যাঙের দেহে ইলেকট্রিসিটি-ফিটি কিচ্ছু না। বিভিন্ন ধরনের ধাতু একসঙ্গে করলেই ওরকমটি হয়। আসলে বিদ্যুৎ রয়েছে ঐ ভিন্ন জাতের ধাতুর মধ্যে, ব্যাঙের দেহে নয়। তিনি তাঁর কথার সত্য মিথ্যা যাচাই করবার জন্যে একটি মজাদার পরীক্ষা করলেন। তিনি রুপো

আর দস্তার কয়েকখানা পাত নিলেন। একের উপরে আর-একখানা নিয়ে পাতগুলো সাজানো হল ; প্রথমে রুপো, তার উপর দস্তা, আবার রুপো, তার উপর দস্তা—এমনিভাবে। প্লেটগুলোর মাঝখানে রাখা হল লবণ জলে ভেজানো কাপড়। এবারে একেবারে উপরের আর নিচের প্লেট দু-খানা একগাছি ধাতুর তার দিয়ে যোগ করলে দেখা গেল, তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলছে।

কারেন্ট ইলেকট্রিসিটির রাজত্বে নতুন যুগ শুরু হল।

ভোল্টা এবারে অন্যভাবে বিদ্যুৎ তৈরি করলেন। একটি কাচের পাত্রে নেওয়া হল লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড। ভিতরে বসিয়ে দেওয়া হল দু-খানা পাত—একখানা দস্তার, অন্যখানা তামার। বাইরে থেকে কোন ধাতুর তার দিয়ে যোগ করে দেওয়া হল ধাতুর পাত দু-খানা। দেখা গেল, বিদ্যুৎ চলছে তারের গা বেয়ে। এ যন্ত্রটিকে আমরা বলি তড়িৎ-কোষ বা ইলেকট্রিক সেল।

বিদ্যুৎ-প্রবাহ আসলে কী

বিদ্যুৎ চলেছে তারের গা বেয়ে। বেশ, ভাল কথা। কিন্তু বিদ্যুৎ-প্রবাহ আসলে কী? স্থির-বিদ্যুতের বেলা আমরা বলেছি যে, এক জিনিস থেকে অন্য জিনিসে বিদ্যুৎ যাচ্ছে। কথাটার মানে হল যে, এক জিনিস থেকে অন্য জিনিসে ইলেকট্রনরা চলছে। এখানেও সেই ব্যাপার। 'তারের গা বেয়ে বিদ্যুৎ চলে' কথাটার মানে হল, যে দিকে বিদ্যুৎ চলছে তার উলটো দিকে চলেছে লক্ষ-লক্ষ ইলেকট্রন, খুব তাড়াতাড়ি। ইলেকট্রনরা চলবে কেন? আমরা জানি, যেখানে ইলেকট্রন বেশি আছে সেদিক থেকে ইলেকট্রনরা চলবে যেখানে ওরা সংখ্যায় কম সেদিক পানে। কাজেই এমন ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে যাতে করে একদিকে সব সময়েই থাকবে বেশি-সংখ্যক ইলেকট্রন, অন্য দিকে থাকবে কম। নানা উপায়ে এ কাজটি করা

যেতে পারে। তড়িৎ-কোষে কোন রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যেই ব্যাপারটা ঘটানো হয়েছে এখানে।

ইলেকট্রনরা এমনিভাবে ছুটে যদি দু-দিকে ওদের সংখ্যা সমান সমান করে দিতে পারে তবে আর তড়িৎ-প্রবাহ চলবে না। কোন কোষে যদি এরকম অবস্থা হয় তবে বলব, ওখানে আর তড়িৎ-প্রবাহ ঘটাবার মত কেউ নেই, অর্থাৎ রাসায়নিক ক্রিয়া ওখানে বন্ধ হয়ে গেছে।

টর্চের ব্যাটারি

টর্চের ব্যাটারি আসলে একটি তড়িৎ-কোষ। এর মধ্যে থাকে নানা ধরনের রাসায়নিক মশলা। দস্তার তৈরি একটি বাটির মধ্যে মশলাগুলো পুরে তার মধ্যে বসিয়ে দিতে হয় কার্বনের একটি দণ্ড। কার্বনের দণ্ডটি এবং দস্তার তৈরি বাটিটি দুটি আলাদা পাতের কাজ করবে। এখন এ-দুটি কোন ধাতুর তার দিয়ে যোগ করে দিলেই তারের গা বেয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলবে। ঠিকমত বলতে হলে বলতে হয় যে, যেদিকে প্রবাহ চলছে তার উলটো দিকে চলছে ইলেকট্রনরা। টর্চের মধ্যে আলাদা কোন তার ব্যবহার করা হয় না। কার্বনের দণ্ড আর দস্তার তৈরি বাটির ভিতরে যোগাযোগ ঘটে টর্চের গায়ের মাধ্যমে। টর্চের ব্যাটারিকে আমরা বলি শুকনো ব্যাটারি বা ড্রাই সেল।

টর্চের ব্যাটারির মত আরও অনেক রকম ব্যাটারি আছে যার ভিতরে বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করার জন্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়। আমরা বলতে পারি, রাসায়নিক শক্তিই এখানে বিদ্যুৎ বা তড়িৎশক্তিতে পরিণত হয়েছে। মোটর গাড়িতে যে ধরনের ব্যাটারি ব্যবহার করা হয় তা তৈরির মূল কথাও এখানেই। আজকাল ট্র্যানজিস্টার রেডিওর ছড়াছড়ি। এখানেও ব্যবহার করা হয় ঐ শুকনো ব্যাটারি বা ড্রাই সেল।

তবে বাড়িঘরে আমরা বিজলি বাতি জালাই, পাখা চালাই। বিদ্যুৎ-সাহায্যে কলকারখানা চলে। এ-সব কাজে কিন্তু ব্যাটারির বিদ্যুৎ দিয়ে কাজ চালানো সুবিধাজনক হয় না। এ-সব কাজের জন্যে তড়িৎ বানানো হয় অন্যভাবে।

ইলেকট্রিক জেনারেটর

তড়িতের ব্যবহার আজ নানা কাজে। বাড়ি-ঘরের আলো পাখা ছাড়া আরও কত রকমে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ কাজে লাগানা হয় তা আর বলে শেষ করা যায় না। বিদ্যুৎ ছাড়া আধুনিক সভ্যতা এক পা-ও চলতে পারে না। কলকাতার মত বড় শহরের কোন অংশে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ হলে কী দুর্ভোগ হয় তা হয়ত তোমাদের মধ্যে অনেকের জানা আছে।

এ-সব কাজের জন্যে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয় যে যন্ত্রে, তার নাম জেনারেটর।

ডেনমার্কের একজন নাম-করা পদার্থবিদ ছিলেন ওর্স্টেড। তিনি আবিষ্কার করেন যে, কোন তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চললে সে তার কোন কম্পাসের কাঁটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারে, যেমন পারে একখানা চুম্বক কোন চুম্বক-শলাকাকে।

আমরা বলতে পারি, বিদ্যুতেরও চুম্বকের মত আকর্ষণ করবার ক্ষমতা আছে।

মাইকেল ফ্যারাডের নাম তোমরা হয়ত শুনে থাকবে। বিদ্যুৎ সম্বন্ধে ইনি যে সব গবেষণার কাজ করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না। ওর্স্টেডের পরীক্ষার দিকে এঁর নজর পড়ল এক সময়ে। তিনি এ সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন।

দু-খানা চুম্বক নেওয়া হল। একখানা চুম্বকের উত্তর মেরু আর অন্যখানার দক্ষিণ মেরু বেশ কাছাকাছি রাখা হল। একগাছি ইলেকট্রিক তারকে গোল করে একটা বৃত্তের মত করা হল। তারের

ভিতরে কিন্তু বিদ্যুৎ-প্রবাহ নেই। এবারে তারের বৃত্তটি চুম্বকের উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুর মাঝখানকার জায়গায় রেখে দেওয়া হল। এখন কোন উপায়ে তারের বৃত্তটি ঐখানটায় ঘোরাতে পারলে দেখা যাবে যে, তারের ভিতর দিয়ে একটি তড়িৎ-প্রবাহ চলছে। এও দেখা যাবে, একবার পুরোপুরি ঘুরে আসবার মধ্যে তারের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহের দিক বদলে যায়। জেনারেটরে বিদ্যুৎপ্রবাহ তৈরি করার উপায়টি অনেকটা এমনি ধরনেরই। অবশ্য যত সহজে কথা-ক-টি বলা হল কাজের বেলা ব্যাপারটা তা-নয়।

এরকমভাবে বিদ্যুৎ তৈরি করার ব্যাপারটা আবিষ্কার করেন ফ্যারাডে।

নানা রকমের জেনারেটর আছে। কোনটাকে বলে ডাইরেক্ট কারেন্ট জেনারেটর, কোনটি আবার অলটারনেট কারেন্ট জেনারেটর। বিজ্ঞান সম্বন্ধে উঁচু ক্লাসে পড়াশুনো করলে এ সব ব্যাপারের খুঁটিনাটি জানতে পারবে তোমরা।

তড়িতের মাপজোখ

বাজারে আলু কিনতে গিয়ে আমরা কিলো হিসেবে আলু কিনি। কিন্তু যদি কলা কিনতে যাই? কলা কেনা হয় গুণে গুণে। কলা এক-একটার দাম ক-পয়সা, এই হবে আমাদের কলা কেনার মাপকাঠি। শব্দ আমরা কিভাবে মাপি, উত্তাপ মাপার উপায়ই বা কী, তা আমরা আগেই বলেছি। এমনিভাবেই বিদ্যুৎ মাপার মাপকাঠিও একটা আমরা ঠিক করে নিয়েছি।

ইলেকট্রনরা খুবই ছোট। বিদ্যুতের পরিমাণ থাকে এদের মধ্যে যৎসামান্য। কাজেই এদের জন্যে ঐ কলা কেনার মাপকাঠির মত কোন মাপকাঠি যে ব্যবহার করা যাবে না তা বুঝতেই পারছ। এ কাজে যে মাপকাঠি ব্যবহার করা হয় তার নাম কুলাম্ব্। ফরাসী-দেশের এক বিজ্ঞানীর নাম অনুসারেই এ নাম। ৬২৮-র পর যদি

ষোলটা শূন্য বসাও তবে যে সংখ্যাটি মিলবে ততগুলো ইলেকট্রনকে বলা হয় এক কুলাম্ব্। অর্থাৎ ঐ-সংখ্যক ইলেকট্রনের মধ্যে যে পরিমাণ নেগেটিভ বিদ্যুৎ আছে তা-ই হল এক কুলাম্ব্। বুঝতেই তো পারছ, ওরা যেমন ছোট, আমাদের মাপকাঠিটি তেমনি বড়।

ধরা যাক, কোন তারের ভিতর দিয়ে দশ কুলাম্ব্ বিদ্যুৎ চলেছে পাঁচ সেকেণ্ড ধরে। আমরা বলতে পারি, প্রতি সেকেণ্ডে দু-কুলাম্ব্ বিদ্যুৎ চলছে তারের ভিতর দিয়ে। 'প্রতি সেকেণ্ডে দু-কুলাম্ব বিদ্যুৎ চলছে' না বলে আমরা আরও সহজে কথাটা প্রকাশ করতে পারি। আমরা বলতে পারি যে, তারের ভিতর দিয়ে ২ অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলছে। ফরাসী-দেশের বিজ্ঞানী অ্যাম্পিয়ারের নাম থেকেই এ নাম। আমরা যে-সব জিনিসে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি তার জন্যে কী পরিমাণ বিদ্যুৎপ্রবাহ বা কারেন্ট দরকার হয় তা সহজে বোঝবার জন্যে আমরা এখানে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। একটা সাধারণ বিজলি বাতি জ্বালাতে বিদ্যুৎপ্রবাহ বা কারেন্ট দরকার হয় আধ অ্যাম্পিয়ার, ইলেকট্রিক স্টোভে দরকার পড়ে ৫ অ্যাম্পিয়ারের মত। একটি বড় ইলেকট্রিক মোটর চালাতে ৭৫ অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ দরকার। একটি বড় ইলেকট্রিক চুল্লি চালাতে কম-সে-কম দশ হাজার অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ দরকার পড়ে।

বিদ্যুতের পরিমাণ মাপবার জন্যে আমরা আরও দুটি কথার ব্যবহার করি। একটি ভোল্ট, অন্যটি ওম। ইলেকট্রনরা যাতে চলতে পারে তার ব্যবস্থা ঠিক রাখার জন্যে যে কথাটি ব্যবহার হয় তার নাম ভোল্ট। একটা তারের দুটি বিন্দুর মধ্যে যদি ভোল্টের পার্থক্য বেশি থাকে তবেই ইলেকট্রনরা খুব তাড়াতাড়ি ছুটবে। ভোল্টের পার্থক্য কম হলে ওদের গতি হবে মন্থর। আর যদি ভোল্টের পার্থক্য না থাকে তবে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলবেই না, অর্থাৎ ইলেকট্রনরা হয়ে পড়বে গতিহীন। ইলেকট্রনদের চালাবার জন্যে আমাদের বাড়ি-ঘরে সাধারণত ২২০ ভোল্টে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালানো

হয়। ভোল্ট কথাটি এসেছে ভোল্টার নাম থেকে। ছুটি বিন্দুর মধ্যে ভোল্টের পার্থক্য বোঝাবার জন্যে আমরা 'পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স' কথাটি ব্যবহার করে থাকি।

কোন পদার্থের মধ্য দিয়ে বিছ্যুৎ-প্রবাহ চলবার সময় পদার্থটি বিছ্যুৎপ্রবাহে বাধা দেয়। বাধা দেওয়াকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে রেজিস্ট্যান্স। মাপকাঠির একক হল ওম।

যখন ভোল্টের পার্থক্য থাকে এক, তখন যদি কোন তারের ভিতর দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার বিছ্যুৎ-প্রবাহ চলে তবে যে শক্তি পাওয়া যায় তার নাম এক ওয়াট। আমরা যে-সমস্ত বিজলি বাতি ব্যবহার করি তার উপরে লেখা থাকে ২৫-ওয়াট, ১০০-ওয়াট এমনি সব কথা। এসব কথার মানে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছ। সোজা হিসেবে, ভোল্ট আর অ্যাম্পিয়ারকে গুণ করলেই ওয়াটের পরিমাণ পাওয়া যায়।

বিছ্যুৎ-প্রবাহের ফল

কোন তারের ভিতর দিয়ে বিছ্যুৎ-প্রবাহ চললে সেখানে নানা ধরনের পরিবর্তন হয়ে থাকে। এ-সব পরিবর্তনকে আমরা মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। কোন তারের ভিতর দিয়ে বিছ্যুৎ-প্রবাহ চললে তারের চারদিকে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। কাজেই তারটির কাছকাছি কোন চুম্বক-শলাকা রাখলে সেটি একটি নির্দিষ্ট দিকে ঘুরে যাবে। কোন্ দিকে কতটা ঘুরবে তা নিদিষ্ট আইন মেনে চলে। অ্যাম্পিয়ারের নিয়ম এ-রকমেরই একটি নিয়ম। নিয়মটি ভারি মজার। শোন।

মনে কর, একটি লোক যেদিকে বিছ্যুৎ-প্রবাহ চলছে সেদিকে সাঁতরে যাচ্ছে। যে তারের ভিতর দিয়ে বিছ্যুৎ-প্রবাহ চলছে লোকটির মুখ ফেরানো রয়েছে সব সময় সেদিকে। এবারে

তারের সমান্তরালভাবে যদি একটি চুম্বক-শলাকা রাখা যায় তবে তার উত্তরমেরু লোকটির বাঁ হাতের দিকেই সরে যাবে।

এ তো গেল বিদ্যুৎ-প্রবাহ আর চুম্বকের সম্পর্কের কথা। কিন্তু দুটি তারের ভিতর দিয়ে যখন বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলে তখন তাদের মধ্যেও ঘটে আকর্ষণ বিকর্ষণের কাজ। দুটি তার কাছাকাছি রাখা হল সমান্তরালভাবে। এখন যদি তারদুটির ভিতর দিয়ে একই দিকে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলে তবে দেখা যাবে, তারদুটি একে অন্যকে কাছে টানছে। আর বিদ্যুৎ-প্রবাহের গতি হয় যদি ভিন্ন-মুখী তবে দেখা যাবে, তারদুটি একে অন্যকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। বিদ্যুৎ-প্রবাহের এই যে আকর্ষণ বিকর্ষণ, এ-সব অতি সুন্দর সুন্দর পরীক্ষা দিয়ে দেখানো যায়। তাছাড়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ এবং চুম্বকের মধ্যে যে সম্পর্ক তা বিদ্যুৎ মাপজোখের কাজে লাগানো হয়। এ-সব নিয়মকানুনের সাহায্য নিয়ে তৈরি করা হয় নানা ধরনের যন্ত্র। অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, গ্যালভানোমিটার প্রভৃতি হল এরকমেরই কয়েকটি যন্ত্র। কত পরিমাণ বিদ্যুৎ চলছে কোন্ তারের ভিতর দিয়ে তা মাপা যায় অ্যামিটার যন্ত্রটি দিয়ে। আবার তারের পোটেনসিয়্যাল ডিফারেন্স বা বিভব প্রভেদ কত তা মাপা যায় ভোল্টমিটার যন্ত্রটি দিয়ে।

কোন তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চললে তারটি গরম হয়। কী পরিমাণ বিদ্যুৎ চললে তারটি কতটা গরম হবে, তারটি মোটা হলে গরম হবে বেশি বা কম, কত সময় বিদ্যুৎ-প্রবাহ চললে উত্তাপের পরিমাণই বা কত হবে—এ সব জানবার জন্যে যে নিয়মটি আছে তার নাম জুলের নিয়ম। জুলের নিয়ম থেকে আমরা জানতে পারি যে, একই পরিমাণ বিদ্যুৎ-প্রবাহ যদি কোন নির্দিষ্ট সময় ধরে চলে কোন তারের ভিতর দিয়ে তবে তারটি মোটা হলে গরম হবে কম, আর সরু হলে গরম হবে বেশি। একই পরিমাণ বিদ্যুৎ-প্রবাহ একই তারে বেশি

সময় ধরে চললে তারটি গরম হয় বেশি, কম সময় ধরে চললে গরম হয় কম। আমরা যে বিজলি বাতি, স্টোভ প্রভৃতি ব্যবহার করি সে-সব ক্ষেত্রে জুলের এসব নিয়ম নানাভাবে কাজে লাগানো হয়।

বিদ্যুৎ-প্রবাহ দিয়ে নানাধরনের রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটানো হয়। আবার রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যেই বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করা যায়। নানা ধরনের ব্যাটারি তৈরির মূল কথা এখানেই।

কয়েকটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র

আমরা এবারে কয়েকটি যন্ত্রের কথা উল্লেখ করছি যাদের আমরা অনবরত ব্যবহার করি বা নানাভাবে সাহায্য নিই।



গ্র্যাহাম বেল আবিষ্কার করেন টেলিফোন।

প্রথমেই বলা যেতে পারে ইলেকট্রিক বেলের কথা। আগেই বলেছি, কোন লোহার দণ্ডের চারদিক দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালালে লোহার দণ্ডটি সাময়িকভাবে চুম্বক হয়ে যায়।

বিদ্যুৎ বন্ধ করলেই তা আবার যেমনটি ছিল তেমনই হয়ে যায়। এ-জাতীয় বিদ্যুৎ-চুম্বক বা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটেরই সাহায্য নেওয়া হয় ইলেকট্রিক বেলে। একটি বাঁকানো লোহার দণ্ডের চারদিকে থাকে ইলেকট্রিক তার জড়ানো। দণ্ডের সামনে থাকে লোহার একটি হাতুড়ি। হাতুড়ির উলটো দিকে থাকে একটি ঘণ্টা। তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালালেই লোহা চুম্বকে পরিণত হয়। সে তখন টানে সামনের হাতুড়িকে আর হাতুড়ি তখন ঘা মারে ঘণ্টায়। শব্দ ওঠে ঠং করে। হাতুড়িটা সরে আসার জন্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। লোহাও আর চুম্বক থাকে না। হাতুড়ি তাই চলে যায় তার আগের জায়গায়। আবার চলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ। ঘটে আগেকার সব ব্যাপারগুলো। আবার শব্দ ওঠে—ঠং। এমনিভাবে চলে ইলেকট্রিক বেলের ঠং-ঠং শব্দ।



আধুনিক টেলিগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করেন মোর্স

এরপর ধর, টেলিফোনের কথা। টেলিফোনেও বিদ্যুৎ চুম্বকের সাহায্য নেওয়া হয়। টেলিফোনের যেখানটায় আমরা

কথা বলি সেখানে আছে একখানা ধাতুর পর্দা। কথার সঙ্গে-সঙ্গে ধাতুর পর্দা কাঁপে। ফলে বিদ্যুৎ-প্রবাহের কমতি বাড়তি ঘটে। এর ফলে যেখানে আমরা কথা শুনি সেখানকার পর্দা-খানা কাঁপতে থাকে, যেমনভাবে কথা বলা হয়েছে ঠিক তেমনি-ভাবে। আমরা শুনি কথা, ঠিক যা বলা হচ্ছে অপর দিক থেকে।

টেলিগ্রাফ যন্ত্রে কথার বদলে বিদ্যুতের সাহায্যে পাঠানো হয় কতগুলো সঙ্কেত। সঙ্কেতগুলোর মানে আমাদের জানা থাকে। কাজেই কী কথা বলা হয়েছে তাও আমরা বুঝতে পারি সহজে। বিজ্ঞান চেতনার পরবর্তী খণ্ডে এ সম্বন্ধে সবিস্তারে বলা হবে।

এক্স-রের কথা

বায়ুর ভিতর দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চলে না, অর্থাৎ কিনা, বায়ু হল বিদ্যুতের অপরিবাহী। কিন্তু প্রায়-বায়ুশূন্য জায়গার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলে। চলতে গিয়ে কিসব ব্যাপার ঘটে শোন।

এক্স-রে আবিষ্কার সম্বন্ধে একটি গল্প চালু আছে। জার্মানির একজন নামকরা বিজ্ঞানী ছিলেন রন্ট্‌জেন। একটি কাচের নলের ভিতর দিকে বায়ু বের করে তার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালাবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কাচের নলটি ছিল কালো কাগজে মোড়া। তাঁর পরীক্ষাগারের ড্রয়ারে কালো কাগজে জড়ানো ছিল কয়েকটা ফোটোগ্রাফিক প্লেট। তিনি একদিন দেখলেন যে প্লেটগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, অর্থাৎ আলোতে বের করলে প্লেটের যে অবস্থা হয় সে-রকম অবস্থাই হয়ে গেছে প্লেটগুলোর। কারণটা খুঁজে পেলেন না রন্ট্‌জেন। ভুল করে তিনি কি কখনো এগুলো আলোতে বের করেছিলেন ? না তো, তাও তো নয়। তবে ? প্লেটগুলো তিনি ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন। আবার কি ভেবে, ওগুলো ফেলে না দিয়ে ডেভেলপ করে নিলেন। অদ্ভুত ব্যাপার ! প্লেটের গায়ে ফুটে উঠেছে একটি চাবির ছবি। চাবিটি ছিল টেবিলের উপরে।

রন্‌ট্‌জেন বুঝলেন, এ হল কোন অদৃশ্য রশ্মির কাজ। এ রশ্মি টেবিলের কাঠ আর কালো কাগজ ভেদ করেই প্লেটের উপর কাজ করেছে। ছবি তুলেছে চাবিটির। আর এ রশ্মি নিশ্চয়ই এসেছে কাচের নলটি থেকে, যা নিয়ে তিনি কাজ করছিলেন।

এ অজানা রশ্মির নাম রাখলেন তিনি এক্স-রে। কোন অজানা জিনিসকে আমরা বাংলায় ক অক্ষরটি দিয়ে অনেক সময় প্রকাশ করে থাকি। ইংরেজিতে ব্যবহার করা হয় × অক্ষরটি। সেদিন থেকে এ রশ্মির নাম এক্স-রে। অনেক সময় আবার রন্‌ট্‌জেন-রশ্মিও বলা হয় একে।

এক্স-রের ব্যবহার আজ নানা কাজে। হাড় ভেঙে গেছে, তোল এক্স-রে। বোঝা যাবে কোন্‌খানটায় ভেঙেছে। বুক ব্যথা করে, তোল বুকের এক্স-রে। বোঝা যাবে বুকে কোন খারাপ রোগ বাসা বেঁধেছে কি না। অপারেশন করতে হবে কোন রোগীকে তার পেটের কোন খারাপ রোগের জন্যে, তোল এক্স-রে। দেখে নিতে হবে কোন্‌খানটায় কিভাবে অপারেশন করতে হবে। ক্যানসারের মত বিশ্রী রোগেরও আজকাল চিকিৎসা চলছে এক্স-রে দিয়ে। এ সব ছাড়া বড় কলকারখানায়ও এক্স-রের ব্যবহার আছে নানা কাজে। বড় একটা লোহার বীম বানানো হচ্ছে। বীমটা আবার লাগানো হবে একটি পুল তৈরির কাজে। কাজেই ওর মধ্যে সামান্য খুঁতও থাকা চলবে না। বীমটার এক্স-রে নেওয়া হল। যদি একটুও খুঁত থাকে কোনখানে তবে ধরে ফেলা শক্ত হবে না মোটেই। এমনি আরও বহুতর কাজে ব্যবহার আছে এক্স-রের।

অ্যাটমও ভাঙা যায়

অ্যাটমের মাঝখানে আছে নিউক্লিয়াস, আর তার চারদিকে ইলেকট্রন। ইলেকট্রনদের সহজেই অ্যাটমের আওতা থেকে বের

করে দেওয়া যায়, কিন্তু নিউক্লিয়াস ভারি শক্ত। সহজে একে ভাঙা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা নাছোড়বান্দা। তাঁরা আবিষ্কার করলেন এমন সব অস্ত্র যা দিয়ে নিউক্লিয়াসও ভাঙা গেল। উপরি পাওয়া গেল শক্তি। এ-জাতীয় শক্তির পরিমাণ অসীম। ধ্বংসের কাজে লাগাতে গেলে এ যেমন চরম সর্বনাশ করতে পারে, তেমনি আবার শান্তির কাজেও এ শক্তির ক্ষমতা বিপুল।

প্রকৃতিতে কতগুলি বিশেষ ধরনের মৌলিক পদার্থ আছে। এদের বলা হয় রেডিও-অ্যাকটিভ এলিমেণ্ট। রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি এ জাতীয় মৌলিক পদার্থ বা এলিমেণ্ট। রেডিয়াম আবিষ্কার করে ম্যাদাম কুরি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন সে খবর হয়ত তোমাদের জানা আছে। এ-সব মৌলিক পদার্থ থেকে আপনা-আপনি তিন রকমের অদৃশ্য রশ্মি বেরোয়। এদের নাম হল, আল্‌ফা-রশ্মি, বিটা-রশ্মি, আর গামা-রশ্মি। আল্‌ফা-রশ্মি হল পজিটিভ বিদ্যুৎ-কণিকা দিয়ে তৈরি। বিটা-রশ্মিতে রয়েছে ইলেকট্রন। আর গামা-রশ্মি আলোর মত ইথারের ঢেউ ছাড়া আর কিছুই নয়।

পরীক্ষায় দেখা গেল যে, ইউরেনিয়াম ধাতুর নিউক্লিয়াসকে যদি উপযুক্ত অস্ত্র দিয়ে ভেঙে ফেলা যায় তবে তা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। উপরি পাওয়া যায় শক্তি, যার পরিমাণ অসীম। অস্ত্রের কাজে লাগানো যেতে পারে নিউট্রন কণিকা। অ্যাটম বোমার নাম তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। অ্যাটম বোমা তৈরির মূল কথা এখানেই।

অ্যাটম বোমার শক্তির হিসেব নিকেশ করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার মূলে ছিল দুটি মাত্র অ্যাটম বোমা। জাপানের নাগাসাকি আর হিরোশিমা শহর পুড়ে ছাই হয়েছিল এ দুটি বোমার দাপটে।

আমাদের সামনে প্রশ্ন ওঠে, ধ্বংস করবার জন্যে যখন বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য যখন মানুষের সুখ সুবিধে বাড়িয়ে দেওয়া,

তখন বিজ্ঞান কেন মাঝে মাঝে মেতে ওঠে ধ্বংসের খেলায়? এটা কি বিজ্ঞানের দোষ? নিশ্চয়ই নয়। স্বার্থপর মানুষের হাতে পড়ে বিজ্ঞানকে কখনো-কখনো যা-তা কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সে তো বিজ্ঞানের দোষ নয়! অ্যাটমের ভিতরকার অসীম ক্ষমতা যদি আমরা মানুষের মঙ্গলের জন্যে ব্যবহার করতে পারি, মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কাজে লাগাতে পারি এ শক্তি, সার্থক হবে তাহলে বিজ্ঞান সাধনা।

———

বিজ্ঞান চেতনা ৩

রসায়নের কথা

কুঞ্জবিহারী পাল

পদার্থের কথা

কত শত জিনিস দিয়েই না গড়ে উঠেছে আমাদের পৃথিবী। জল, বাতাস, ধুলোবালি, পাহাড়-পর্বত হতে শুরু করে গাছপালা, জীবজন্তু, পোকামাকড়,—আরও কত কি। এর কি শেষ আছে! সকলের উপরে রয়েছে অবশ্য মানুষ। মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসেরও কি অভাব আছে! খাওয়া-পরা থেকে শুরু করে অবসর-বিনোদন পর্যন্ত মানুষের প্রয়োজন হয় বহু ধরনের জিনিসের। এত সব জিনিসের কথা মনে রাখা যে কত অসুবিধেজনক তা আর তোমাদের বলে বোঝাতে হবে না। তবে, বিজ্ঞানীরা এত সব জিনিসকে একটি-মাত্র কথা দিয়েই বুঝিয়ে দিয়েছেন। কথাটি হল 'বস্তু' বা ম্যাটার। যে জিনিস খানিকটা জায়গা নিয়ে থাকবে আর তার ওজন অথবা ভর থাকবে তাকেই বলা হয় বস্তু।

তোমরা প্রশ্ন করতে পার, সবই যখন বস্তু তখন পার্থক্যটা কোনখানে? চেয়ারখানাও বস্তু, আবার জলও বস্তু। চেয়ারখানা বসার জন্যে, আর জল খাওয়ার জন্যে। তাই যদি হয় তবে উভয়কে 'বস্তু' কথাটি দিয়ে প্রকাশ করতে যাওয়া বিপজ্জনক বৈকি! কিন্তু কোন বিজ্ঞানী বলবেন, জলের মধ্যে রয়েছে দুটি মূল বস্তু; এরা হল হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। আর চেয়ারখানার কাঠ তৈরি হয়েছে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক তিনটি মূল বস্তু দিয়ে। তার উপর চেয়ারখানার কাঠগুলো আটকানো হয়েছে পেরেক দিয়ে। পেরেক আবার লোহা দিয়ে তৈরি। লোহাও আর একটি মূলবস্তু। কাজেই আমাদের চারদিকে যে সব বস্তু রয়েছে

সে-সব তৈরি হয়েছে অন্য কতগুলো মূল বস্তু দিয়ে। কোন বস্তুর মধ্যে কী কী মূল বস্তু রয়েছে, তাদের পরিমাণই বা কত—এ সব জানতে পারলেই আমরা বুঝতে পারব বস্তুটি কী জাতীয়। আগেই বলেছি, জলের মধ্যে রয়েছে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামে দুটি মূল বস্তু। এ পর্যন্ত বললেই কিন্তু যথেষ্ট বলা হল না। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন থাকলেই যে বস্তুটি জল হবে এমন কোন কথা নেই। হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড নামে একটি বস্তু ডাক্তারখানায় কিনতে পাওয়া যায়। কাটা-ঘা পরিষ্কার করতে এ বস্তুটির ব্যবহার আছে। এ দেখতে জলেরই মত; আবার এর ভিতরে রয়েছে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামে দুটি মূল বস্তু। জলের মত দেখতে হলেও জল থেকে এ জিনিসটি কিন্তু একেবারেই আলাদা। পরীক্ষায় দেখা গেছে, যে পরিমাণ হাইড্রোজেনের সঙ্গে যে পরিমাণ অক্সিজেন মিলে জল তৈরি হয়েছে তা, আর হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড তৈরি করতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ একেবারেই আলাদা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, দুটি আলাদা বস্তুর মধ্যে মূল বস্তু এক রকম হতে বাধা নেই।

রসায়ন বিজ্ঞান কাকে বলে

সে যাই হোক, যে বিজ্ঞান পড়লে বস্তুর উপাদান, গঠন, বস্তুর নানারকম আচার ব্যবহার, বস্তুর রকমারি পরিবর্তন—এ সব সম্বন্ধে আমরা বুঝতে পারি তাকেই বলা হয় রসায়ন শাস্ত্র বা কেমিস্ট্রি। এক কথায়, রসায়নকে আমরা বস্তু-বিজ্ঞান বা ম্যাটার সায়েন্স বলতে পারি। আমরা চারদিকে যে সব জিনিস দেখছি সেসব কি চিরদিনই একরকম থাকে? তাদের কি কোন পরিবর্তন হয় না? নিশ্চয়ই হয়। চকচকে ছুরিখানা কদিন ধরে টেবিলের উপর পড়ে আছে। কদিন পরে দেখা গেল, তার চাকচিক্য নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা বলি, মরচে ধরেছে। লোহার মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটেছে,

এই তো ? রসায়নবিদ খুঁজে দেখবেন, কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে লোহার মধ্যে। কাজেই কোন বস্তুর মধ্যে যে নানা পরিবর্তন অনবরত ঘটে চলেছে সে সব সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়াও রসায়নবিদের কাজ। তেলের বোতলটা কী দিয়ে তৈরি হয়েছে ? বলা হল, তৈরি হয়েছে বর্ণহীন একটা শক্ত বস্তু দিয়ে, নখ দিয়ে আঁচড় কাটলে যে বস্তুর



রসায়নবিদ তাঁর পরীক্ষাগারে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছেন

গায়ে দাগ পড়ে না। তবে হ্যাঁ, হীরকের ধারালো টুকরো দিয়ে দাগ কাটলে দাগ পড়ে তার গায়ে। তুমি বলতে পার, তেলের বোতলটি তৈরি করা হয়েছে কাচ দিয়ে। কিন্তু আমি যদি বলি, না, কাচ দিয়ে নয়, কোয়ার্টজ পাথর বা প্ল্যাস্টিক দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বোতলটি তবে কি ভুল বলা হল ? নিশ্চয়ই নয়। রসায়নবিদ কিন্তু এ-জাতীয় এলোমেলো কথা বলবেন না। তিনি তাঁর পরীক্ষাগারে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে খোঁজখবর নেবেন। তারপর বলবেন, বোতলটি তৈরি হয়েছে কাচ দিয়ে।

রসায়নবিদ কোন পদার্থের আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও খোঁজখবর নেবেন। তাছাড়া কোন বস্তুর আচার-ব্যবহার অন্য কোন বস্তু থেকে কেন আলাদা ? কেন একটি বস্তু বেশ কঠিন, আবার অন্য একটি বস্তু কেন নরম ? লবণ কেন জলে গুলে যায় ? তামার তারের ভিতর

দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ কেন চলে? কাঠ কেন জ্বলে? অ্যাসবেসটস কেন জ্বলে না? লোহায় কেন মরচে ধরে? সোনায় কেন ধরে না? এমনি হাজারো রকমের প্রশ্নের জবাব দিতে হয় রসায়নবিদকে।

প্রকৃতির ভাণ্ডারে কত রকম জিনিসই না রয়েছে। সে সব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করে তা মানুষের সুখ-সুবিধের কাজে লাগানোও রাসায়নিকের কাজ। নিত্য নতুন জিনিস তৈরি করাও বাদ যায় না রসায়নবিদের পরীক্ষাগারে।

কী করে গড়ে উঠল রসায়ন বিজ্ঞান

রসায়ন কথাটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ রস থেকে। পারদের এক নাম রস। প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাশাস্ত্র বেশ উন্নতি লাভ করেছিল। এ শাস্ত্রের নাম ছিল আয়ুর্বেদ। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন ভারতে রসায়ন শাস্ত্রের চর্চা শুরু হয়েছিল। পারদ বা রসকে আয়ুর্বেদে সব রোগের প্রতিষেধক বলেই মনে করা হত। কাজেই রসের গুণধর্ম বিচার এবং তার ব্যবহার সম্বন্ধে নানারকম চর্চা করা হত যে শাস্ত্রে তারই নাম দেওয়া হয়েছিল রসায়ন শাস্ত্র।

রসায়নের ইংরেজি নাম কেমিস্ট্রি। প্রাচীন কালে মিশর দেশের একটি নাম ছিল 'কালো মাটির দেশ'। এই কালো মাটির দেশেই সেকালে রসায়ন শাস্ত্রের চর্চা হত। মিশরীয় শব্দ 'কিমিয়া' মানে কালো মাটি। কিমিয়া শব্দ থেকেই 'কেমিস্ট্রি' কথাটির সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য আজকের দিনে কেমিস্ট্রি বলতে আমরা যা বুঝি সেকালে তা বোঝাতো না। পুরোহিত শ্রেণীর একদল লোক আপ্রাণ চেষ্টা করত কী করে লোহা বা ঐজাতীয় কোন ধাতুকে সোনায় পরিবর্তিত করা যায়। এদের বলা হত অ্যালকেমিস্ট। এরপর আর-একদল রসায়নবিদের সৃষ্টি হল যাদের কাজ হল এমন ওষুধ বানানো যা খেলে মানুষ চিরযৌবন লাভ করবে। তোমরা স্বর্গের অমৃতের কথা শুনে

থাকবে যা খেয়ে দেবতারা নাকি অমর হয়েছিলেন। এ-জাতীয় কোন ওষুধ বানাবার চেষ্টা হয়েছিল সেকালে। এ কাজে যারা নিযুক্ত ছিল তাদের বলা হত 'ইয়াট্রো কেমিস্ট'।

এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। গ্রীস এবং এশিয়া মাইনরের তখন খুব নাম-ডাক। জ্ঞান বিজ্ঞানে এ সময় গ্রীসের তুলনা পৃথিবীর অন্য কোথাও ছিল না। গ্রীক দার্শনিকদের তখন বিশ্বজোড়া নাম। তাঁরা অনেকটা দার্শনিকের মতবাদ দিয়ে রসায়ন শাস্ত্রের চর্চা শুরু করেছিলেন। তাঁরা বলতেন, এ দুনিয়ার সব কিছুই তৈরি হয়েছে চারটি মূল পদার্থ দিয়ে। এগুলি হল, আগুন, বাতাস, জল ও মাটি। তাঁদের যুক্তি ছিল অনেকটা এরকম। বাতাস না হলে কোন প্রাণী বাঁচতে পারে না। কাজেই বাতাস একটি মূল পদার্থ না হয়ে যায় না। জলের এক নাম জীবন, এ কে না জানে! প্রাণী বা যে-কোন গাছপালার কথাই ধরা যাক না কেন, জল না হলে সে তো বাঁচতে পারে না কোনক্রমে। কাজেই জলও একটি মূল বস্তু। আমাদের পৃথিবীটার উপরটাতেই রয়েছে মাটি। জন্মের পর থেকেই মাটির সঙ্গে যোগাযোগ আমাদের অচ্ছেদ্য। কাজেই মাটি না হলে আমাদের বেঁচে থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এর পর আগুন। আগুনের আছে অশেষ শক্তি। আগুনকে মানুষ বা অন্য কোন প্রাণী ভয় পায়, ভয় পেয়ে পুজো করে। কাজেই এ-হেন আগুনকে মূল পদার্থের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে কোন্ সাহসে? অতএব গ্রীক দার্শনিকদের মতে—এই চারটি মূল পদার্থ ই এ দুনিয়ার সৃষ্টির কারণ।

অনেকটা এ রকমের মতবাদই সেকালে আমাদের ভারতবর্ষেও প্রচলিত ছিল। তবে ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে মূল পদার্থ চারটি নয়—পাঁচটি। এরা হল, ক্ষিতি (মাটি), অপ্ (জল), তেজ (আগুন), মরুৎ (বাতাস) এবং ব্যোম (আকাশ)। এদের একসঙ্গে বলা হয় পঞ্চভূত। পঞ্চভূতেই তৈরি হয়েছে দুনিয়ার সব কিছু।

এ-জাতীয় দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে সেকালের অধিবাসীদের কেউ কোন প্রমাণ চায় নি। একবাক্যে তারা এ-সব মেনে নিয়েছে। কোন অর্বাচীন যদি কখনো পরীক্ষা দিয়ে ব্যাপারটার প্রমাণ চেয়ে থাকে তবে একটি মজাদার উদাহরণ দেওয়া হত। একখণ্ড কাঁচা কাঠ আগুনে পোড়ালে কী ঘটে দেখা যাক। আগুনের কী অসীম শক্তি! আগুনের তেজে কাঁচা কাঠের ভিতরকার জল বাষ্প হয়ে উড়ে যেত। দার্শনিক বলতে পারেন, কাঠখানা থেকে বাষ্প বা বায়ু বেরিয়ে যাচ্ছে। পুরোপুরি জ্বলে গেলে পড়ে থাকত খানিকটা ছাই। দার্শনিক বলবেন, এটি হল আসলে মাটি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পদার্থ তৈরি হয়েছে জল, বাতাস, মাটি আর আগুন দিয়ে।

আজকের দিনে এ ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ তোমরা যে একবাক্যে হেসে উড়িয়ে দেবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেকালে এর চেয়ে বড় প্রমাণের জন্যে কেউ মাথা ঘামাতো না। সাধারণ লোক চিরদিনই সাধারণ লোক। রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে কোথায় কী, কিভাবে হচ্ছে তা নিয়ে কজন সাধারণ লোকের কী আসে যায় আজকের দিনেও! তবে কখনো কখনো যে আপত্তি কিছু উঠত না তা অবশ্য নয়। সে সব আপত্তির জবাব দিতে গিয়ে দার্শনিকরা এমন সব জটিল তত্ত্বের অবতারণা করতেন যার গোলক-ধাঁধায় সাধারণ লোক তো দূরের কথা, অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির মাথাও গুলিয়ে যেত। কাজেই রসায়নশাস্ত্র দার্শনিক যুক্তির বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে নি দীর্ঘদিন।

কিন্তু পুরোনো বিশ্বাসের ভিতে একটু একটু করে চিড় দেখা যেতে লাগল। নিত্য নতুন নতুন মূল পদার্থের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটতে লাগল। ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞান। বহু বিজ্ঞানীর বহু দিনের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় যুক্ত হয়ে এ বিজ্ঞানের নানা দিকে নানা ধরনের উন্নতি হয়েছে। পুরোনো দিনের ধ্যান ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। যিনি সকলের আগে

এদিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন তাঁর নাম রবার্ট বয়েল। ইনি ছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের লোক। পণ্ডিত মহলে ইনি 'আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের জনক' বলেই পরিচিত।

এরপর শুরু হল নতুন যুগান্তর। এক একজন বিজ্ঞানী এক একটা পুরোনো ধারণাকে বদলে নতুন সত্যের আবিষ্কার করলেন। রসায়নশাস্ত্র এঁদের দানে দিন দিন উন্নতি লাভ করতে লাগল। গড়ে উঠল নব্য রসায়ন।

মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ

প্রাচীনকালের দার্শনিকরা ভাবতেন, চার বা পাঁচটি মূল পদার্থ দিয়েই তৈরি হয়েছে দুনিয়ার সব কিছু। কিন্তু আজ আমরা জানি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই গড়ে উঠেছে ১০৩টি মৌলিক পদার্থ দিয়ে। এই ১০৩টি মৌলিক বা মূল পদার্থের মধ্যে ১১টি আবার মানুষেরই তৈরি। বিজ্ঞানীরা তাঁদের পরীক্ষাগারে কৃত্রিমভাবে এদের তৈরি করেছেন। বাকি ৯২টির মধ্যে কতগুলি কঠিন, কতগুলি তরল, আবার কতগুলি গ্যাস। কারো কারো আছে নানা ধরনের রঙ, কেউ কেউ বা বর্ণহীন। আবার গন্ধও আছে কোন-কোন মৌলিক পদার্থের। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন নামগুলির সঙ্গে হয়ত তোমাদের পরিচয় আছে। এগুলো গ্যাস-জাতীয় মৌলিক পদার্থ। এরা বর্ণহীন, গন্ধহীনও বটে। লোহা, তামা টিন, দস্তা, নিকেল, ক্রোমিয়াম, সোনা, রুপো, প্ল্যাটিনাম—এগুলোও মৌলিক পদার্থ, তবে, কঠিন। এদের আমরা বলি ধাতু। ব্রোমিন এবং পারদ—এ দুটি মৌলিক পদার্থ তরল।

মৌলিক পদার্থ কথাটির আমরা অনেকবারই উল্লেখ করেছি। কিন্তু মৌলিক পদার্থ কাকে বলে?

মৌলিক পদার্থ হল এমন বস্তু, যা রাসায়নিক উপায়ে ভেঙে অন্য কোন সহজ বস্তুতে পরিণত করা যায় না। সোজা কথায়, এদের আমরা মূল পদার্থ বলতে পারি। মৌলিক বা মূল পদার্থকে ইংরেজিতে বলা হয় এলিমেন্ট।

একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আশা করি পরিষ্কার হবে তোমাদের কাছে। ম্যাগনেসিয়াম একটি ধাতু। এটিও একটি মৌলিক পদার্থ বা এলিমেন্ট, অর্থাৎ ম্যাগনেসিয়ামকে খুব ছোট ছোট করে ভেঙেও ম্যাগনেসিয়াম ছাড়া অন্য কিছুই পাওয়া যাবে না। সামান্য একটুখানি ম্যাগনেসিয়ামের গুঁড়ো নিয়ে যদি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া যায় তবে বেশ উজ্জ্বল আলো দিয়ে ম্যাগনেসিয়াম জ্বলতে থাকবে। পড়ে থাকবে সাদা সাদা ছাই। যদি ছাইটুকুর ওজন নেওয়া যায় তবে দেখা যাবে যে, ছাইয়ের ওজন যতটুকু ম্যাগনেসিয়াম গোড়ায় নেওয়া হয়েছিল তা থেকে বেশি। ম্যাগনেসিয়াম যদি আগুনে পুড়ে সহজ পদার্থে বদলে যেত তবে ছাইয়ের ওজন নিশ্চয়ই কম হত। কোন-ক্রমেই বেশি হত না। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, ছাইয়ের ওজন বেশি। কাজেই পোড়ার পরে ম্যাগনেসিয়াম একটি বেশি জটিল পদার্থে পরিণত হয়েছে। আসলে ব্যাপারটা ঘটেছে এরকম। ম্যাগনেসিয়ামের সঙ্গে বায়ুর ভিতরকার অক্সিজেনের একটি যোগাযোগ ঘটেছে। তৈরি হয়েছে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড নামে একটি জটিল পদার্থ। ফলে এর ওজন হয়েছে বেশি। কাজেই এ পরীক্ষাটি থেকে আমরা বলতে পারি যে, ম্যাগনেসিয়াম একটি এলিমেণ্ট। একে ভেঙে অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় না।

এবারে দেখা যাক, যৌগিক পদার্থ বা কম্পাউণ্ড কাকে বলে। দুই বা দুইয়ের বেশি মৌলিক পদার্থ রাসায়নিক উপায়ে মিলিত হয়ে যে সব পদার্থ তৈরি করে তাকে আমরা বলি কম্পাউণ্ড (compound), বা যৌগিক পদার্থ।

সাধারণ একটুকরো খড়িমাটি বা চক নেওয়া যাক। এর ভিতরে রয়েছে তিনটি মৌলিক পদার্থ—ক্যালসিয়াম, কার্বন আর অক্সিজেন। প্রথম দুটি কঠিন, আর শেষেরটি গ্যাস। সুতরাং আমরা বলতে পারি, চক একটি যৌগিক পদার্থ। জলও একটি যৌগিক পদার্থ বা কম্পাউণ্ড। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন দুটি মৌলিক পদার্থ। এদের রাসায়নিক মিলনেই তৈরি হয়েছে জল।

একখানা পাকা বাড়ি বানাতে দরকার হয় ইট, চুন, সুরকি, বালি, কাঠ, লোহা ইত্যাদির। তোমাদের পাড়ায় কত রকম বেরকমের বাড়িই না আছে। একতলা থেকে শুরু করে সাততলা পর্যন্ত উঁচু বাড়ি আছে তোমাদের পাড়ায়। বাড়িগুলোর নক্সাও এক-একটির এক-এক রকম। কোন বাড়িটা দেখতে একেবারে একখানা জাহাজের মত, কোনটা আবার একখানা উড়োজাহাজের মত। এত সব বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি বাড়ি কিন্তু তৈরি করতে লেগেছে ইট, কাঠ, চূন, সুরকি, বালি, লোহা ইত্যাদি। কাজেই এখানে আমরা বলতে পারি, চুন, ইট, বালি ইত্যাদিই হল বাড়ি তৈরির মূল জিনিস। অনায়াসেই এদের এলিমেণ্টের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বাড়িগুলো হল যেন এক একটি যৌগিক পদার্থ বা কম্পাউণ্ড।

আবার দেখ, সিমেণ্টের সঙ্গে বালি মেশানোর একটা নির্দিষ্ট হার আছে। তবেই না মিশ্রণটি বেশ মজবুত হয়। ঠিক সেইরকমই মৌলিক পদার্থরা যখন মিশে যৌগিক পদার্থ তৈরি করে তখন তাদের মধ্যেও একটা নির্দিষ্ট মাপ থাকে। কোন একটি মৌলিকের নির্দিষ্ট পরিমাণের সঙ্গে অন্য কোন মৌলিকের নির্দিষ্ট পরিমাণের যোগাযোগ ঘটলেই তৈরি হবে নির্দিষ্ট একটি যৌগিক পদার্থ। অন্যভাবে আমরা বলতে পারি যে, কোন যৌগিক পদার্থের মধ্যে যে সব মৌলিক পদার্থ আছে তাদের পরিমাণ কম বেশি হলে যৌগিক পদার্থটি আলাদা হতে পারে।

জলের মধ্যে রয়েছে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামে দুটি মৌলিক গ্যাস। ২ ভাগ ওজনের হাইড্রোজেনের সঙ্গে ১৬ ভাগ ওজনের অক্সিজেনের মিলনে তৈরি হয় ১৮ ভাগ ওজনের জল। জল পাওয়া যায় নানা উৎস থেকে। বৃষ্টির জল, সমুদ্রের জল, পুকুরের জল, ঝরনার জল, আরও কত কী! তাছাড়া রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে কৃত্রিমভাবেও জল বানানো যায়। আবার কলকাতার লোকেরা যেমন জল খায়, বিলেতের লোকরাও জল খায়; আমেরিকায়ও জল অচল নয়। কিন্তু রসায়নের বিচারে, জলের মধ্যে হাইড্রোজেন ১ ভাগ আর অক্সিজেন ৮ ভাগ থাকতেই হবে। অবশ্য তা যদি খাঁটি জল না হয়ে অন্য কিছু হয় তবে সে কথা আলাদা। আমেরিকার জল বলে হাইড্রোজেনের পরিমাণ একটু বেশি থাকুক, আমাদের এ বাংলাদেশের জল বলে হাইড্রোজেনের পরিমাণ থাকুক খানিকটা কম, এ রকম হতেই পারে না। যতক্ষণ জলের গুণধর্ম একই থাকবে ততক্ষণ তার মধ্যে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকতেই হবে, অন্যথা হবার জো নেই। তবে ২ ভাগ ওজনের হাইড্রোজেনের সঙ্গে যদি ৩২ ভাগ ওজনের অক্সিজেনের যোগাযোগ ঘটানো যায় কোনক্রমে তবে যে যৌগিক পদার্থটি আমরা পাব সেটি আর জল থাকবে না, সেটি হবে অন্য একটি তরল যৌগিক পদার্থ। নাম তার হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড।

এসব মৌলিক পদার্থ এবং এদের দুই বা দুইয়ের বেশি মৌলিক পদার্থের মিলনে তৈরি অসংখ্য যৌগিক পদার্থ দিয়েই তৈরি হয়েছে দুনিয়ার সব কিছু। আমাদের পৃথিবীর কথাই ধরা যাক। পৃথিবীর বুকে রয়েছে স্থল আর জলভাগ। আর পৃথিবীর চারিদিকে ঘিরে আছে তার বায়ুমণ্ডল। পণ্ডিতেরা হিসেব করে দেখেছেন যে, মাটি, জল আর বায়ুমণ্ডলের অর্ধেকই তৈরি হয়েছে অক্সিজেন দিয়ে। বাকি অংশের মূল উপাদান সিলিকোন (শতকরা ২৬ ভাগ), অ্যালুমিনিয়াম (শতকরা ৭·৫ ভাগ) আর লোহা (শতকরা ৪·৭ ভাগ)। আবার

এমন কতগুলি মৌলিক পদার্থ আছে প্রকৃতিতে যাদের পরিমাণ খুবই সামান্য। ক্রিপটন নামে একটি গ্যাসীয় মৌলিক পদার্থের খবর আমরা জানি। বায়ুমণ্ডলের দুই কোটি ভাগের মধ্যে ক্রিপটন আছে এক ভাগ মাত্র।

মিশ্রণ আর যৌগিক পদার্থ

যৌগিক পদার্থ কাকে বলা হয় তা আশা করি তোমরা বুঝেছ। মৌলিক পদার্থ আর যৌগিক পদার্থ ছাড়া আর এক ধরনের পদার্থের সঙ্গে আমাদের হামেশাই দেখা মেলে। একে আমরা বলি সাধারণ মিশ্রণ বা শুধু মিশ্রণ। যৌগিক পদার্থের বেলা আমরা দেখেছি যে, দুই বা দুইয়ের বেশি মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক মিলনে যৌগিক পদার্থ তৈরি হয়। কাজেই যৌগিক পদার্থও এক ধরনের মিশ্রণ, একথা আমরা বলতে পারি। তবে, শুধু মিশ্রণ না বলে রাসায়নিক মিশ্রণ বললেই ঠিক বলা হয়। কারণ, যৌগিক পদার্থের মধ্যে মৌলিক পদার্থগুলির নিজস্ব গুণ বা ধর্ম একদম বজায় থাকে না। হাইড্রোজেন একটি গ্যাস, অক্সিজেনও একটি গ্যাস। এ দুটি মিলে তৈরি হয় জল, একটি তরল পদার্থ। জলের মধ্যে হাইড্রোজেনের গুণও নেই, আবার অক্সিজেনের গুণও নেই। কাজেই জলকে আমরা হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের একটি রাসায়নিক মিশ্রণ বলতে পারি। এখানে আরও একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। জলের মধ্যে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের পরিমাণ নির্দিষ্ট।

কিছু পরিমাণ হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন যদি মিশিয়ে রাখা যায় তবেই কি জল পাব আমরা? নিশ্চয়ই নয়। এ জাতীয় মিশ্রণের মধ্যে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন উভয়েরই গুণ থাকে বর্তমান। অথচ এও একটি মিশ্রণ। একে আমরা হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের একটি সাধারণ মিশ্রণ বলতে পারি। ইংরেজি

করে বললে বলা যায় 'মেকানিক্যাল মিকশ্চার'। এ মিশ্রণটির মধ্যে হাইড্রোজেন বা অক্সিজেনের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকার প্রয়োজন নেই। হাইড্রোজেনের পরিমাণে যেমন খুশি রাখা চলে, তেমনি আবার অক্সিজেনের পরিমাণও বাড়ালে কমালে কিছু যায় আসে না। কিন্তু জল বানাতে হলে শুধু হাইড্রোজেনের বা অক্সিজেনের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখলেই চলবে না, ঐ মিশ্রণটির ভিতর দিয়ে একটি তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গও চালাতে হবে। কাজেই আমরা বলতে পারি, যে মিশ্রণের ভিতরে মিশ্রিত পদার্থগুলির নিজ-নিজ গুণ বা ধর্ম বজায় থাকে তাকেই বলা হয় সাধারণ মিশ্রণ।

কোন যৌগিক পদার্থ থেকে তার মৌলিক পদার্থগুলি সহজে আলাদা করা যায় না। এ করতে হলে নানারকম রাসায়নিক উপায়ের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু সাধারণ মিশ্রণের ভিতর থেকে মিশ্রিত পদার্থগুলি সাধারণ উপায়ের সাহায্য নিয়েই আলাদা করা সম্ভব। যে কোন দুই তিনটি জিনিস, তা সে মৌলিকই হোক বা যৌগিকই হোক—মিশলেই তাকে অনায়াসে একটি সাধারণ মিশ্রণ বলতে পারি। তবে, দেখতে হবে, মিশ্রণের মধ্যে যেন কোনক্রমেই কোন রাসায়নিক ক্রিয়া না ঘটে।

খানিকটা বালির সঙ্গে চিনি মিশিয়ে নেওয়া হল। একে আমরা একটি সাধারণ মিশ্রণ বলতে পারি। কারণ কী? না, এ মিশ্রণটির মধ্যে চিনি এবং বালি পাশাপাশি রয়েছে; এদের মধ্যে কোন রাসায়নিক মিলন ঘটে নি। তাছাড়া মিশ্রণটির মধ্যে বালি আর চিনির উভয়েরই গুণ রয়েছে বর্তমান। এক গ্লাস জলে খানিকটা চিনি মিশিয়ে নাড়াচাড়া করা হল। আমরা পেলাম জল আর চিনির



জলে চিনি গুলে আমরা পাই চিনির জল

একটি মিশ্রণ ; সোজা কথায় চিনির মিশ্রণ। খানিকটা গন্ধকের গুঁড়ো নিয়ে লোহার গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হল। লোহা আর গন্ধকের একটি সাধারণ মিশ্রণ পাওয়া গেল। এ মিশ্রণটির ভিতরেও লোহা আর গন্ধক উভয়েরই গুণ আছে বর্তমান। দরকার মনে করলে সহজেই এদের আলাদা করে নেওয়া যেতে পারে। এবারে যদি এ মিশ্রণটির খানিকটা নিয়ে বেশ করে গরম করা যায়, তবে যে জিনিসটি পাওয়া যাবে সেটি কিন্তু একেবারেই আলাদা জিনিস। তার মধ্যে না আছে লোহার গুণ, না আছে গন্ধকের। একেই আমরা বলি যৌগিক পদার্থ বা রাসায়নিক মিশ্রণ।

পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় খনি থেকে, তা তোমরা জান। পেট্রোলিয়াম এ ধরনেরই একটি সাধারণ মিশ্রণ। এর মধ্যে আছে নানা রকমের গ্যাস, ভিন্ন ভিন্ন তরল পদার্থ এবং বহু রকমের কঠিন পদার্থ। আমরা যে দুধ খাই তাও একটি সাধারণ মিশ্রণ। এর শতকরা ৮৭ ভাগই জল ; বাকি ৪ ভাগ চর্বি, ৩·৩ ভাগ কেসিন, ৫ ভাগ চিনি, আর আছে সামান্য পরিমাণ ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ।

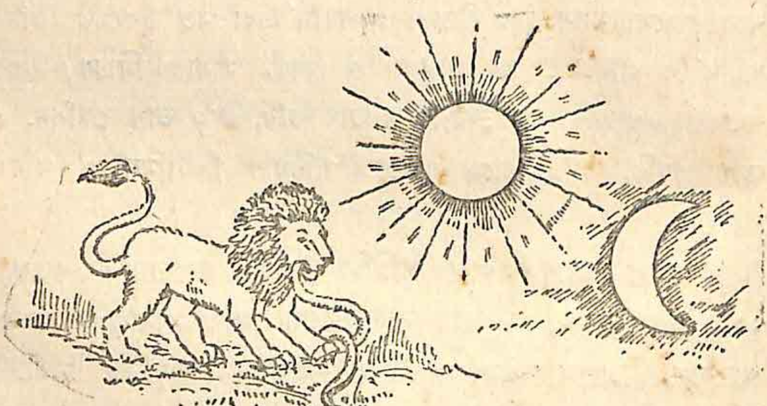
সাধারণ মিশ্রণের সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হল বায়ু। শতকরা ২১ ভাগ অক্সিজেন, ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন আর সামান্য পরিমাণে আরগন, হিলিয়াম, নিয়ন, কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতির মিশ্রণেই তৈরি হয়েছে আমাদের চারিদিককার বায়ু।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, তিন রকমের জিনিস নিয়েই আমাদের কাজ-কারবার—মৌলিক পদার্থ, যৌগিক পদার্থ আর সাধারণ মিশ্রণ। এ সব পদার্থের গঠনবিধি বের করা, এ সবের উপর নানা ধরনের শক্তির ক্রিয়ায় যে ধরনের পরিবর্তন ঘটে তা লক্ষ্য করা এবং মানুষের সুখ সুবিধের জন্যে নতুন নতুন জিনিস বানানো—এ সবই হল আধুনিক রসায়নবিদের কাজ।

মৌলিক পদার্থের নামকরণ

আগেই বলেছি, মৌলিক পদার্থের সংখ্যা সাধারণত ৯২টি। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, লোহা, তামা প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের নামের সঙ্গে আমাদের হামেশাই পরিচয় মেলে। এতগুলো মৌলিক পদার্থের নামকরণও বেশ কঠিন কাজ, সন্দেহ নেই। তাছাড়া নামকরণের পেছনে যে-সব চমৎকার যুক্তি বর্তমান রয়েছে তা শুনলে তোমাদের ভাল লাগবে বলেই মনে হয়।

অ্যালকেমিস্টদের নাম আগেই উল্লেখ করেছি। এরা এদের রাসায়নিক কার্যকলাপ সাধারণ লোকে না জানতে পারে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করত। আসলে ঘন রহস্যের মেঘে ঢেকে রাখত এরা এদের কাজ-কারবার। এ করতে গিয়ে সাধারণ জিনিসপত্তরেরও এমন সব নাম এরা দিত যাতে করে এসব অদ্ভুত বলেই মনে হত সকলের



অ্যালকেমিস্টরা নানা সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করত

কাছে। তাছাড়া নানারকম সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়েই প্রকাশ করত সব কিছু। নিজেদের গোষ্ঠীর লোকজন ছাড়া অন্য কেউ এসব বুঝত না। একদল অ্যালকেমিস্ট যে ধরনের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করত অন্যদল করত তা থেকে আবার আলাদা সাঙ্কেতিক চিহ্ন। এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে যে, একমাত্র পারদ বোঝাবার জন্যে কমসে কম

২০ রকম সাঙ্কেতিক চিহ্ন এবং ৩৫ রকমের সাঙ্কেতিক নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে অ্যালকেমিস্টদের কাজ-কারবার সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্যই ছিল।

প্রাচীন রহস্যের ঘোর কাটিয়ে উঠল দিন-দিন রসায়ন বিজ্ঞান। বর্তমান রসায়নশাস্ত্রের প্রধান বলা হয় ফরাসী রসায়নবিদ লাভয়সিয়েরকে। অবশ্য এ মতটা অনেকে আবার মানতে চান না। অনেকে বলেন, সুইডিশ বিজ্ঞানী শীলেই হলেন আধুনিক রসায়ন বিদ্যার পথপ্রদর্শক। রাশিয়ার বিখ্যাত রসায়নবিদ লোমোনোশোভও এ-ধরনের কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। সে যাই হোক, এ সব বিখ্যাত রসায়নবিদও মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থের পুরো নামের বদলে সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার করতেন। তবে তা তেমন সুবিধেজনক ছিল না। বর্তমানকালে আমরা যে ধরনের সংক্ষিপ্ত নামের সঙ্গে পরিচিত তা প্রবর্তন করেন জন জেকব বার্জেলিয়াস।

প্রতিটি মৌলিক পদার্থের যে নাম দেওয়া হয়েছে তার একটি করে বিশেষ অর্থ আছে। অবশ্য ঠিক সেই অর্থ অনুসারে মৌলিক পদার্থটির ধর্ম সব সময় যে মিলে যায় তা নয়। যেমন, অক্সিজেন কথাটির মানে অম্ল-উৎপাদক। কিন্তু অক্সিজেন যে সব সময় অম্ল বা অ্যাসিড উৎপাদন করবে এমন কোন কথা নেই। নাইট্রোজেন কথাটির মানে হল, 'আমি নাইটার তৈরি করি'। আবার হাইড্রোজেন কথাটির মানে হল, 'জল উৎপাদক'। বহু মৌলিক পদার্থের নামকরণ হয়েছে ল্যাটিন শব্দ থেকে। আয়োডিনের বাষ্পের রঙ বেগুনি। এ থেকেই আয়োডিনের নামটি এসেছে। আবার ক্লোরিনের রঙ সামান্য সবুজ। সেজন্যেই এর এই নাম। আবার হিলিয়াম নামে মৌলিক গ্যাসটির নাম এসেছে সূর্য থেকে। কারণ হিলিয়াম গ্যাসটি সূর্যের মধ্যে বর্তমান। কোন-কোন মৌলিক পদার্থের নাম হয়েছে কোন বিশেষ জায়গার নাম থেকেই। স্কটল্যাণ্ডে স্ট্রনসিয়ান নামে একটি জায়গা আছে। এই স্থানের নাম অনুসারেই নামকরণ করা হয়েছে স্ট্রনসিয়াম ধাতুটির।

রাশিয়ার রুথেনিয়া নামে যে স্থানটি আছে তা থেকেই রুথেনিয়াম মৌলিকটির নাম। এখনও দেখা যায় যে, কোন বিশেষ আবিষ্কারের নামে থেকেও কোন-কোন মৌলিক পদার্থের নামকরণ হয়েছে। ইউরেনাস নামে একটি গ্রহ আছে একথা তোমাদের অজানা নয়। এই ইউরেনাস থেকেই ইউরেনিয়াম ধাতুটির নাম। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় এক পৌরাণিক দেবতার নাম থর। তাঁর নাম থেকেই থোরিয়াম নামটি এসেছে। গ্রীক পুরাণের রাজা ট্যাণ্টালাসের নাম হতে ট্যাণ্টালাম, আর তাঁর কন্যা নিয়োবির নাম থেকেই নিয়োবিয়াম নামটি এসেছে। ক্যালিফোর্নিয়াম, আমেরিকিয়াম, কুরিয়াম প্রভৃতি নামগুলি যে কোথেকে এসেছে তা আশা করি আর বলে দিতে হবে না তোমাদের।

সাঙ্কেতিক চিহ্নের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। যে-কোন মৌলিক পদার্থের পুরো নামের বদলে যে সংক্ষিপ্ত নাম দেওয়া হয় তাকেই বলে প্রতীক চিহ্ন। যেমন, হাইড্রোজেনকে শুধু H দিয়ে, অক্সিজেনকে O দিয়ে, কার্বনকে C দিয়ে প্রকাশ করার রীতি আছে। আবার কোন যৌগিক পদার্থকে সংক্ষেপে লেখা হয় সঙ্কেত বা ফর্মুলার সাহায্যে। এতে করে রসায়ন বিজ্ঞানে নানা ধরনের সুবিধে হয়। অ্যালকেমিস্টরাও যে নানা ধরনের প্রতীক চিহ্ন এবং সাঙ্কেতিক নাম ব্যবহার করত সে-কথার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে।

অণু পরমাণুর কথা

মৌলিক পদার্থ আর লক্ষ লক্ষ যৌগিক পদার্থ নিয়েই রসায়নবিদের কারবার। কিন্তু পদার্থ—তা সে মৌলিকই হোক বা যৌগিকই হোক, তার ভিতরে কী আছে? কী দিয়ে তৈরি নানা পদার্থ? প্রাচীন কালের দার্শনিক পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে নানা মতই প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে আবার গ্রীক পণ্ডিতদের বিশেষ নাম আছে। তবে, গ্রীক

দার্শনিকদের বহু পূর্বেই ভারতীয় দার্শনিক কণাদ প্রচার করেছিলেন যে, পদার্থ অতি ক্ষুদ্র সব কণিকা দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতদের মতগুলি একত্র করলে যা দাঁড়ায় তা হল এই। পদার্থ বিচ্ছিন্ন। সকল পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশের নাম পরমাণু। পদার্থের ভিতরের পরমাণুগুলোর মাঝে প্রচুর ফাঁকা জায়গা আছে। তাছাড়া পরমাণুগুলো স্থির হয়ে বসে নেই কখনো। আসলে গতিশীলতাই হল পদার্থের ধর্ম। তাঁরা আরও বলেছেন, পরমাণু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, পরমাণুর কোনরূপ পরিবর্তন করা বা তাকে বিনষ্ট করাও সম্ভব নয়।

প্রাচীনকালের এ সব মতবাদ সবই ছিল কল্পনার উপর ভিত্তি করে। কিন্তু প্রাচীন মতবাদ আর কিছু আধুনিক পরীক্ষার ফল



ড্যাল্টনের পরমাণুবাদ রসায়ন বিজ্ঞানে আমূল পরিবর্তন এনেছিল।

মিলিয়ে জন ড্যাল্টনই প্রথম তাঁর পরমাণুবাদ প্রচার করেছিলেন। পরমাণুবাদের ইংরেজি নাম 'অ্যাটমিক থিওরি'।

ড্যাল্টনের এ-তত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পারি যে, সকল পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশের নাম পরমাণু বা অ্যাটম। মৌলিক বা যৌগিক যে-

কোন পদার্থ ই হোক না কেন, তার ক্ষুদ্রতম অংশই হল পরমাণু। এ সব পরমাণু কোনক্রমেই ভাঙা যায় না। একই মৌলিক পদার্থের পরমাণুরা একই রকম। যখন পদার্থের মধ্যে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে তখন তা ঘটে এইসব পরমাণুর মধ্যেই।

যদিও ড্যাল্টনের এ মত পুরোপুরি সত্যি নয়, তবুই পরমাণুবাদ রসায়ন বিজ্ঞানে এক আমূল পরিবর্তন এনেছিল।

মৌলিক পদার্থের পরমাণুকে ড্যাল্টন বলেছেন সহজ পরমাণু বা সিম্পল অ্যাটম, আর যৌগিক পদার্থের পরমাণুর নাম দেওয়া হয়েছে যৌগিক পরমাণু বা কম্পাউণ্ড অ্যাটম। আজ অবশ্য আমরা জানি যে, যৌগিক পরমাণুরাই হল অণু বা মলিকিউল। বর্তমান ধারণা অনুসারে আমরা বলতে পারি যে, মৌলিক বা যৌগিক যে-কোন পদার্থেরই অতি ক্ষুদ্র অংশের নাম অণু বা মলিকিউল। অণুগুলি স্বাধীনভাবে থাকতে পারে। কোন পদার্থের ধর্ম বলতে তার অণুর ধর্মই বোঝায়। যে-কোন অণুই আবার কতগুলি পরমাণু দিয়ে তৈরি। পরমাণু হল কোন মৌলিক পদার্থের অতি ক্ষুদ্র অংশ, যা শুধু রাসায়নিক ক্রিয়ার সময়ই অংশ গ্রহণ করে। অন্য সময় এদের কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নেই।

একখণ্ড খড়িমাটির কথাই ধরা হোক না। খড়িমাটি তৈরি হয়েছে অতি ক্ষুদ্র সব কণিকা দিয়ে। এ কণাগুলোতে খড়িমাটির ধর্মই রয়েছে বর্তমান। রসায়নের ভাষায় খড়িমাটিকে বলা হয় ক্যালসিয়াম কার্বনেট। এর ভিতরে আছে ক্যালসিয়াম, কার্বন ও অক্সিজেন নামে তিনটি মৌলিক পদার্থ। রাসায়নিক উপায়ে এরা মিলিত হয়েই তৈরি করেছে খড়িমাটি বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট। খড়িমাটির এ-সব ক্ষুদ্র কণিকার মধ্যেও খড়িমাটির গুণ রয়েছে অর্থাৎ প্রতিটি কণাই আসলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট। কাজেই এই ক্ষুদ্র কণাগুলোকেই আমরা বলব খড়িমাটির অণু। হাইড্রোজেন একটি মৌলিক পদার্থ। হাইড্রোজেনের অতি ক্ষুদ্র কণাকেও আমরা

বলব হাইড্রোজেনের অণু। হাইড্রোজেনের অণুগুলোর মধ্যেও রয়েছে হাইড্রোজেন গ্যাসের ধর্ম। অক্সিজেনও একটি মৌলিক পদার্থ। এও তৈরি হয়েছে অক্সিজেনের অণু দিয়ে। আমরা সোজা কথায় বলতে পারি, যে-কোন পদার্থই হল তার অসংখ্য অণুর সমাবেশ মাত্র। হাইড্রোজেনের অণুগুলি আবার তৈরি হাইড্রোজেনের পরমাণু দিয়ে, অক্সিজেনেরও তাই। একটি হাইড্রোজেন অণুতে পরমাণু আছে দুটি। আবার একটি অক্সিজেনের অণুতেও বর্তমান অক্সিজেনের দুটি পরমাণু। খড়িমাটির বেলা কিন্তু ব্যাপারটা আলাদা। খড়িমাটির একটি অণুতে রয়েছে একটি ক্যালসিয়াম পরমাণু, একটি কার্বন পরমাণু আর তিনটি অক্সিজেন পরমাণু, অর্থাৎ তিন জাতীয় আলাদা আলাদা পরমাণু দিয়েই তৈরি হয়েছে খড়িমাটির অণু।

আমরা জানি, হাইড্রোজেনের আর অক্সিজেনের মিলনে তৈরি হয় জল। এ ব্যাপারটা কিভাবে ঘটে দেখা যাক। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন উভয়েই রয়েছে অণুর আকারে। রাসায়নিক মিলনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের অণুগুলি ভেঙে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের পরমাণুতে পরিণত হল। এখন এই দু-জাতের পরমাণুর মধ্যেই রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটল। তৈরি হল জলের অণু। কাজেই দেখা যাচ্ছে, পরমাণুরা কেবল রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। অথচ অণুদের আলাদা অস্তিত্ব থাকলেও তারা কিন্তু রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। যে-কোন রাসায়নিক ক্রিয়ার পূর্বে তাদের অবশ্যই পরমাণুতে পরিণত হতে হবে।

পরমাণুরা কত ছোট? ওজনও বা তাদের কত কম? অণু বা পরমাণু খুব ছোট, কিন্তু এত ছোট যে, খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যেও এদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। হিসেবে দেখা যায় যে, এক সেন্টিমিটার লম্বা, এক সেন্টিমিটার চওড়া এবং এক সেন্টিমিটার উঁচু অর্থাৎ এক ঘন-সেন্টিমিটার জায়গার মধ্যে ৩-এর পর উনিশটি শূন্য বসালে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় ঠিক ততগুলি হাইড্রোজেন

পরমাণুর জায়গা হতে পারে অনায়াসে। আবার, একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন হল ১·৬৭ কে ১-এর পর ২৪টি শূন্য বসালে যে সংখ্যাটি হয় তা দিয়ে ভাগ করলে যে সংখ্যা দাঁড়ায় তত গ্রাম। গ্রাম, সেন্টিমিটার প্রভৃতির সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে নিশ্চয়ই। সবচেয়ে ভারি যে পরমাণু তার ওজন হল হাইড্রোজেনের ২৩৮ গুণ। হাইড্রোজেন অবশ্য হালকা জাতের পদার্থ। সবচেয়ে ভারি মৌলিক পদার্থ হল ইউরেনিয়াম। তবে, আজকাল আবার ইউরেনিয়ামের চেয়েও ভারি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে।

এত ক্ষুদ্র সংখ্যা নিয়ে কাজ-কারবার করা ভারি অসুবিধেজনক। তাই রাসায়নিকরা এ সমস্যার সমাধান করে নিয়েছেন এক চমৎকার উপায়ে। কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুকে একক হিসেবে ধরে একটি তুলনামূলক সংখ্যা দিয়ে অন্য যে-কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজন প্রকাশ করেছেন তাঁরা। প্রমাণ-বস্তু হিসেবে অক্সিজেনের পরমাণুকেই ধরা হয়েছে। একটি অক্সিজেন পরমাণুর ওজন ধরা হয়েছে ১৬। এ হিসেবে একটি কার্বন পরমাণুর ওজন দাঁড়ায় ১২, নাইট্রোজেন পরমাণুর ওজন দাঁড়ায় ১৪ আর সবচেয়ে ভারি পদার্থ ইউরেনিয়ামের পরমাণুর ওজন দাঁড়ায় ২৩৮। এ তুলনামূলক সংখ্যাকে বলা হয় পারমাণবিক ভর বা অ্যাটমিক ওয়েট। হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক ওয়েট ১-এর চেয়ে সামান্য একটুখানি বেশি।

অণু-পরমাণুর কথা সংক্ষেপে বলা হল। এবারে দেখা যাক পদার্থের মধ্যে অণুরা কিভাবে থাকে, গতিবিধিই বা তাদের কিরূপ?

আগেই বলেছি, পদার্থ তিন অবস্থায় থাকতে পারে—কঠিন, তরল এবং বায়বীয়। যে-কোন অবস্থায়ই থাক না কেন পদার্থের অণুগুলো সবসময়ই ছুটোছুটি করতে থাকে, চুপচাপ বসে নেই কেউই। অবশ্য পদার্থ যখন গ্যাসের আকারে থাকে তখনই তার ভিতরকার

অণুগুলির ছুটোছুটির পরিমাণ অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। কোন পাত্রে কিছু পরিমাণ গ্যাস ধরে রাখা গেলে দেখা যাবে যে, অণুগুলি নিজেদের মধ্যে সবরকম ঠোকাঠুকি তো করছেই, উপরন্তু পাত্রের সবকটি দেয়ালের উপরও অনবরত ঘা মারছে। কোন গ্যাসকে যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায় তবে বোঝা যাবে এ-কথার সত্যতা। গ্যাসের কণাগুলি দেখা যাবে এদিক সেদিক ছুটেই চলেছে। যদি গ্যাসের তাপ বাড়ানো যায় তবে অণুগুলির ছুটোছুটির পরিমাণও বাড়বে, তাপ কমালে কমবে। আসলে তাপশক্তি পদার্থের অণুদের ধাক্কাধাক্কির পরিমাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। যে তাপে জল জমে বরফ হয় তা থেকে যদি ২৭৩ ডিগ্রি তাপ কমিয়ে দেওয়া যায় কোন জিনিসের তবে দেখা যাবে যে, এই উষ্ণতায় অণুগুলো একদম নড়াচড়া বন্ধ করেছে।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাপের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের অণুর ছুটোছুটির পরিমাণ বেড়ে যায়। ছুটোছুটির পরিমাণ বেড়ে যাওয়া মানে, ধাক্কাধাক্কিটাও বেশ বেশি হওয়া। ফলে কোন গ্যাসের তাপ বাড়ালে তার চাপও বেড়ে যেতে বাধ্য। ধরা যাক, কোন পাত্রে কোন নির্দিষ্ট তাপে কিছু গ্যাস আছে। গ্যাসের অণুগুলি পাত্রের দেয়ালে ঘা মারছে অনবরত। কিন্তু যেই না পাত্রের উত্তাপ বাড়ানো হল, গ্যাসের অণুদের ছটফটানি বাড়ল, দেয়ালের গায়ে ধাক্কার পরিমাণও সে অনুপাতে বেড়ে যাবে। একেই আমরা বলছি চাপ বেড়ে যাওয়া। আবার যদি চাপ সমান রাখতে চাই তবে উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের আয়তন বেড়ে যেতে বাধ্য। কোন গ্যাসের তাপ, চাপ আর আয়তন— এ তিনটির ভিতরে তাহলে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্ককেই আমরা বলি চার্লস আর বয়েলের নিয়ম।

গ্যাসের কথা ছেড়ে এবারে তরল পদার্থের কথা ভাবা যাক।

প্রথমেই একটা কথা বলা ভাল যে, পদার্থের অণুগুলো যখন অনবরত ছুটোছুটি করছে তখন সেগুলো পদার্থের বাইরে বেরিয়ে যেদিক খুশি সেদিক চলে যায় না কেন? এর কারণ হল এই যে,

অণুগুলোর মধ্যে একটা টান আছে। একে বলা হয় আণবিক টান। এ টানের জন্যে অণুগুলো যতই ছুটোছুটি করুক না কেন পদার্থের সীমানার বাইরে চলে যায় না কখনো। গ্যাসের কথা অবশ্য আলাদা। কঠিন পদার্থের অণুগুলোর ভিতরকার টান খুবই বেশি। তরলের বেলা এ টান বেশ কম। আর গ্যাসের বেলা এ টানটা একরকম নেই বললেই চলে। তাপ বাড়ালে এ টানের পরিমাণ কমে, তাপ কমালে টান বাড়ে। কোন গ্যাসের উত্তাপ যদি কমানো যায় তবে অণুগুলো বড় ঢিলে মেজাজের হয়ে পড়ে। ভিতরকার আণবিক টানটা যায় বেড়ে; ফলে এরা বেশি দূরের পাল্লায় ছুটতে পারে না। তারপর উত্তাপ আরও কমালে অণুগুলো বড় ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে। এর ফলে পদার্থটি তরল আকার নেয়। আবার তরল পদার্থকে যদি ঠাণ্ডা দেওয়া যায় বেশি পরিমাণে তবে অণুদের গতিবেগ আরও কমে যায় আণবিক টানটা হয় অসম্ভব রকমের বেশি; পদার্থের তখন যে অবস্থা তাকেই আমরা বলি কঠিন অবস্থা। অবশ্য কঠিন অবস্থায় থাকলে পদার্থের অণুগুলোর যে কোন গতি থাকে না তা নয়। গতি থাকে, তবে খুবই কম। অনেকটা এক জায়গায় বসে ছটফট করা আর কি।

ভিজে কাপড় মেলে দিলে তা শুকিয়ে যায়। এখানে কাপড়ের সঙ্গে আটকানো জলের অণুগুলি বায়ুর ভিতরে চলে যায় বাষ্পের আকারে। একেই আমরা বলি কাপড় শুকোনো। কোন তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হতে হলে তখন খানিকটা তাপের দরকার হয়। এ তাপটা পদার্থটি নেয় চারধার থেকে। ফলে চারধারের উত্তাপও খানিকটা কমে যায়। আবার যে তরল পদার্থ যত তাড়াতাড়ি বাষ্পে পরিণত হবে, চারধারের উত্তাপ তার কমে যাবে তত বেশি। ইথার বা স্পিরিট হাতে পড়লে হাতটা অত ঠাণ্ডা লাগে কেন? কারণ ইথার বা স্পিরিট খুব তাড়াতাড়ি বাষ্পে পরিণত হয়ে যায়, ফলে বাষ্পে পরিণত হবার জন্যে যে তাপ প্রয়োজন তা এরা নিয়ে নেয় হাত থেকে।

এর জন্যেই হাত বেশ ঠাণ্ডা লাগে। কোন তরল পদার্থের উত্তাপ যদি বাড়ানো যায় তবে তরলের অণুগুলো তরল পদার্থের সীমানা ছড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় ; একেই আমরা বলি বাষ্পীভবন। সোজা কথায়, কোন তরল পদার্থের বাষ্পে পরিণত হওয়া আর কি।

কঠিন পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে আণবিক টান খুবই বেশি। কঠিন পদার্থের কতগুলোর আকার স্ফটিক বা ক্রিস্ট্যালের মত। আবার কতগুলোকে বলা হয় অনিয়তাকার (অ্যামরফাস্) ; এদের ক্রিস্ট্যালের মত চেহারা নেই। বিজ্ঞানীরা বলেন, বহু কঠিন পদার্থের দানা বা স্ফটিকের ভিতরকার অণুগুলোর এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করবার কোন ক্ষমতাই নেই। স্ফটিকের মধ্যে এরা কতগুলো বিশেষ বিশেষ জায়গায় অনেকটা স্থির হয়েই বসে থাকে। নিজের নিজের জায়গায় বসে একটুখানি ছটফট করে, এই যা। এ-জাতীয় জিনিসের মধ্যে অ্যাসবেসটাস, হীরক এবং গ্র্যাফাইটের নাম করা যেতে পারে। তবে কোন ধাতুর স্ফটিকের মধ্যে বিশেষ-বিশেষ স্থান গ্রহণ করে কিন্তু ধাতুর পরমাণুরা। আবার কঠিন আকারের কোন লবণের স্ফটিকের বিশেষ বিশেষ স্থানে থাকে লবণের পরমাণুরা,—অবশ্য এ-সব পরমাণুর সঙ্গে একটুখানি করে তড়িৎ কণিকা যুক্ত থাকে। তড়িৎ-যুক্ত কোন পরমাণুকে বলা হয় আয়ন (ion)। তাহলে আমরা বলতে পারি, লবণের স্ফটিকের বিশেষ বিশেষ জায়গায় থাকে কতগুলো আয়ন।

কোন তরল পদার্থকে ঠাণ্ডা করলে তা কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। কিন্তু এ কঠিন পদার্থটির মধ্যে অণুগুলো থাকে বিশেষ অগোছালো অবস্থায়। না আছে এদের কোন সুন্দর চেহারা, না অন্য কিছু। সেজন্যেই এ-জাতীয় কঠিনকে বিজ্ঞানীরা বলেন অনিয়তাকার পদার্থ বা অ্যামরফাস সলিড। দানা-বাঁধা কঠিনকে বলা হয় খাঁটি কঠিন পদার্থ বা ট্রু সলিড। অনিয়তাকার কঠিনের সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হল কাচ।

কোন কঠিনকে উত্তাপ দিলে তা তরলে পরিণত হয়। উত্তাপের সঙ্গে-সঙ্গে কঠিনের ভিতরকার অণুগুলির ছটফটানি বাড়ে। তারপর একসময় এরা তরলে পরিণত হয়ে যায়। অণুগুলোর ভিতরের আনবিক টান যায় কমে। এমন অনেক কঠিন পদার্থও আছে যাদের উত্তাপ দিলে তা সরাসরি গ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। মাঝখানকার অবস্থায় অর্থাৎ তরল অবস্থায় এরা আসে না। কর্পূর, আয়োডিন এ-জাতীয় কঠিন পদার্থ। সাধারণত যে-সব দানা-বাঁধা পদার্থের ক্ষুদ্র অংশগুলি অণুদিয়ে তৈরি তাদেরই এ ধরনের পরিবর্তন হয়। এ-জাতীয় পরিবর্তনের নাম সাব্‌লিমেশন।

দেখা গেল, অণুরা অনবরত চলাফেরা করে পদার্থের ভিতরে। অবশ্য তরল, কঠিন বা বায়বীয় পদার্থের ভিতরে এ গতি আলাদা আলাদা। আবার তাপমাত্রা বাড়া কমার সঙ্গে সঙ্গেও এ গতি কম বেশি হয়। কিন্তু এ গতিবেগ কত তা শুনলে তোমরা অবাক হবে। যে তাপে জল জমে বরফ হয় তা হল ০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ০ ডিগ্রিতে অক্সিজেন গ্যাসের অণুগুলো কত জোরে ছোটে জান? ঘণ্টায় তা প্রায় হাজার মাইলের মত হবে বৈকি! সবচেয়ে দ্রুতগামী উড়োজাহাজ ঘণ্টায় কত মাইল চলতে পারে? জোর পাঁচ-ছশো মাইলের বেশি নিশ্চয়ই নয়। সুতরাং সহজেই ধারণা করতে পারছ অণুদের প্রচণ্ড গতির কথা।

আকারেও অণুরা যে কত ছোট সে সম্বন্ধেও তোমরা কিছু ধারণা আগেই করেছ। আমাদের চারদিকে অণুদের সংখ্যা কী রকম তা জানবার জন্যে একটি সহজ উদাহরণ নিলে মন্দ হয় না। ইউনাইটেড নেশন্‌স্ বা ইউ. এন. ও-র কথা তোমরা জান। ইউ. এন্. থেকে ধর একবার ঘোষণা করা হল যে, এক ঘন-ইঞ্চি বায়ুতে যে পরিমাণ অণু আছে তা গুণে বার করতে হবে। এই অণুগুলো পৃথিবীতে যত লোক আছে তাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হল। এও ঘোষণা করা হল যে, প্রতি লোককে লক্ষ অণু গোণার জন্যে পাঁচ পয়সা

করে দেওয়া হবে। তুমি যদি প্রতি সেকেণ্ডে তিনটি করে অণু গুণতে পার আর এভাবে দিনরাত একটুও বিশ্রাম না করে গোণার কাজ যদি চালিয়ে যাও, তবে তোমার কাজ শেষ হতে সময় লাগবে ১২৫ বছর। জানি তোমার পক্ষে এটা সম্ভব হচ্ছে না। তুমি ইচ্ছে করলে কোন যন্ত্রের সাহায্যে গোণার কাজটি সমাধান করতে পার। এতে করে তুমি নাওয়া খাওয়ার সময় পাবে। এইভাবে যন্ত্রের সাহায্যে গুণে তুমি যে টাকাটা দাবি করবে তার পরিমাণও নিতান্ত অবহেলা করবার নয়। টাকার সংখ্যা হবে দশ হাজার। তোমার মত পৃথিবীর প্রতিটি নরনারীও কিন্তু এই পরিমাণ টাকা দাবি করতে পারবে। এবারে একটুখানি হিসেব করে নাও মোট অণুর সংখ্যা। এবার বুঝতে পারছ কী পরিমাণ অণু দিয়ে রসায়নবিদের কারবার। এক ঘন-ইঞ্চি বায়ুরই যখন এ অবস্থা, তখন সমগ্র পৃথিবীতে কী পরিমাণ অণু রয়েছে তার হিসেব করতে গেলে মাথা ঠিক রাখা সম্ভব কি?

রাসায়নিক মিলন কেন হয়

আমাদের চারদিকে অনবরত চলছে নানা ধরনের পরিবর্তন। ছোট্ট গাছের চারা। দু-দিন যেতে না যেতেই কেমন বড় হয়ে উঠছে। কয়েক বছরের মধ্যেই সেই ছোট্ট চারাটি রীতিমত একটা গাছে পরিণত হচ্ছে। সেদিনকার ছোট্ট খোকাটি দেখতে দেখতে কেমন বড় হয়ে উঠল। আজ সে রীতিমত একজন যুবক। উনুন-ভর্তি কয়লা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সব কয়লা পুড়ে যায়, পড়ে থাকে সামান্য একমুঠো ছাই। সমুদ্রের অশ্রান্ত ঢেউ অনবরত পাড়ের উপর আছড়ে পাড় ভাঙছে। আবার অন্য জায়গায় গড়ে উঠছে বিরাট চড়া।

যত রকমের পরিবর্তন আমরা দেখছি, তা সে তাড়াতাড়িই হোক বা আস্তে আস্তেই হোক না কেন—এদের দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। ভৌতিক পরিবর্তন, আর রাসায়নিক পরিবর্তন। ইংরেজি

করে বললে বলা যায়, ফিজিক্যাল চেঞ্জ আর কেমিক্যাল চেঞ্জ। ভৌতিক পরিবর্তনে পদার্থের ভিতরকার অণুদের কোন পরিবর্তন হয় না, কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তনে পদার্থের অণুদেরই হয় পরিববর্তন। বরফ গলে জল হয়, জলকে গরম করলে তা বাষ্পে পরিণত হয়। কিন্তু এ ধরনের পরিবর্তনে জলের অণুদের ভিতরে কোন পরিবর্তন হয় না, পরিবর্তন শুধু বাইরের চেহারাতেই। কিন্তু জলের সঙ্গে একটুখানি অ্যাসিড মিশিয়ে তার ভিতর দিয়ে যদি তড়িৎ প্রবাহ চালানো যায় তবে জল ভেঙে যাবে—আমরা পাব হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামে দুটি মৌলিক পদার্থ। এখানে আসলে জলের অণুগুলোই ভেঙে গিয়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন অণুতে পরিণত হয়েছে। কাজেই এ পরিবর্তন রাসায়নিক।

আমরা যদি দু-ভাগ আয়তনের হাইড্রোজেন ও এক ভাগ আয়তনের অক্সিজেন মিলিয়ে তার ভিতর দিয়ে একটি তড়িৎ প্রবাহ চালিয়ে দিই তবে দেখা যাবে যে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মধ্যে একটি রাসায়নিক মিলন ঘটেছে। তৈরি হয়েছে জল। এটিও একটি রাসায়নিক পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ দু-ভাগ আয়তনের হাইড্রোজেন আর একভাগ আয়তনের অক্সিজেন মিলিয়ে এক জায়গায় রেখে দিলেই কিন্তু জল তৈরি হয় না। জলে তৈরি করবার জন্যে একটি তড়িৎ প্রবাহ দরকার হয়েছে। একটি মোমবাতি জ্বলছে—মোমবাতির ভিতরে যে সব পদার্থ আছে তা রাসায়নিক উপায়ে বদলে গিয়ে অন্য নানা ধরনের পদার্থ তৈরি করছে। এখানেও মোমবাতিটি জ্বালাবার জন্যে আগুনের প্রয়োজন হচ্ছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কোনরকম রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাতে হলে বাইরে থেকে অন্য কোন শক্তির প্রয়োজন হয়। অবশ্য ভৌতিক পরিবর্তন ঘটানোর জন্যেও কখনো কখনো বাইরের শক্তির যে প্রয়োজন হয় না এমন নয়।

রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটলে সব সময়েই কতগুলো বিশেষ নিয়মে ঘটেবে। যেমন ধর, যখন কোন রাসায়নিক মিলন ঘটে তখন পদার্থের

অণুদের মধ্যে পরিবর্তন চললেও মোট বস্তু বা পদার্থের কোন ঘাটতি বা বাড়তি ঘটে না। একটা সোজা উদাহরণ নিলে মন্দ হয় না।

এক টুকরো কয়লা নিয়ে তা পুড়িয়ে ছাই করা হল। কয়লা পোড়ানো একটা রাসায়নিক ক্রিয়া। দেখা যাচ্ছে, যে ছাইটুকু রয়েছে তার ওজন কয়লার ওজনের চেয়ে খুবই কম। এক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে রাসায়নিক ক্রিয়ায় বস্তুর ঘাটতি পড়েছে তবে ভুল বলা হবে। কারণ এখানে কয়লার সঙ্গে বায়ুর ভিতরকার অক্সিজেনের একটি মিলন ঘটে তৈরি হয়েছে কার্বন ডাই-অক্সাইড। কার্বন ডাই-অক্সাইড একটি গ্যাস। সেটি বায়ুর ভিতরে চলে গেছে। কাজেই আমরা দেখছি কয়লার বিনাশ ঘটেছে। কিন্তু যে কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুর ভিতরে গিয়ে স্থান নিয়েছে তা যদি আটকে রাখার ব্যবস্থা করা যায় তবে আমরা দেখব যে, কার্বন ডাই-অক্সাইডের ওজন কয়লার চেয়ে বেশিই হয়ে গেছে। তাহলে কি বলব, রাসায়নিক ক্রিয়ায় পদার্থের ওজন বাড়ছে? না, তাও বলা যাবে না। ঠিক এ ধরনের আর-একটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

একটুকরো ম্যাগনেসিয়ামের তার নেওয়া যাক। বাজির দোকানে যে ম্যাগনেসিয়ামের তার কিনতে পাওয়া যায় সে তারের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে নিশ্চয়ই। এ তার আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলে তা উজ্জ্বল আলো দেয়। সে যাই হোক, এক টুকরো ম্যাগনেসিয়ামের তার জ্বালানো হল। পাওয়া গেল সাদা সাদা ছাই। এবারে এ ছাইয়ের ওজন নিলে দেখা যাবে যে, গোড়ায় যতটা ম্যাগনেসিয়াম নেওয়া হয়েছিল তা থেকে এ ছাইয়ের ওজন বেশি। কারণ কী? এখানেও একটি রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটেছে। ম্যাগনেসিয়ামের সঙ্গে মিলন ঘটেছে বায়ুর ভিতরকার অক্সিজেনের। তৈরি হয়েছে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড। ঐ যে ছাই পড়ে ছিল তারই রাসায়নিক নাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড কঠিন জিনিস—কার্বন ডাই-অক্সাইডের মত তা বায়ুতে চলে যেতে পারে নি। আগে

তেলের সঙ্গে হাইড্রোজেন গ্যাসটির রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটলে তৈরি হয় বনস্পতি। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় তেলের সঙ্গে হাইড্রোজেনের এই রাসায়নিক মিলন ঘটানো যায় না। কাজেই সাহায্য নেওয়া হয় একটি বিশেষ ধরনের ক্যাটালিস্টের। ক্যাটালিস্টটি এখানে নিকেল ধাতুর মিহি গুঁড়ো। অবশ্য মিলন-শেষে অর্থাৎ বনস্পতি তৈরি হয়ে গেলে নিকেলের গুঁড়ো তাড়িয়ে দিতে হয় ভালভাবে ভেজিটেবল ঘি থেকে।

পরমাণুর গঠন

যে-কোন মৌলিক পদার্থের সবচেয়ে ছোট অংশ পরমাণু। এতদিন আমরা জানতাম এদের ভাঙা যায় না। এরা অবশ্য স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না। কোন রাসায়নিক ক্রিয়া যখন ঘটে তখনই এরা কাজে লেগে যায়। এ সব কথা আমরা আগেই বলেছি।

পরমাণু সম্বন্ধে এমনি ধরনের ধারণা ছিল বিজ্ঞানী মহলে। তা প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্তই হবে। কিন্তু এ সময় কতগুলো যুগান্তকারী আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের ধ্যান ধারণা একেবারে পাল্টে দিয়ে গেল। মাদাম কুরীর রেডিয়াম আবিষ্কার, টমসনের ইলেকট্রন আবিষ্কার, রাদারফোর্ডের প্রোটন আবিষ্কার, চাডউইকের নিউট্রন আবিষ্কার—এসব ড্যাল্টনের সাধের পরমাণুর চেহারার খোল নলচে বদলে দিল।

আজ আমরা জানি পরমাণুও ভাঙা যায়। পরমাণুর ভিতরে রয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন। কিন্তু কিভাবে তারা থাকে পরমাণুর ভিতরে? এ-কথা বলবার আগে, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন জিনিসগুলো আসলে কী সে সম্বন্ধে বললে আশা করি তোমাদের ভালই লাগবে।

বিদ্যুৎ একপ্রকার শক্তি। বিজ্ঞানীরা বলেন, বিদ্যুৎ আছে দু-জাতের—পজিটিভ আর নেগেটিভ। বাংলা করে আমরা ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক বলতে পারি। ধনাত্মক বিদ্যুতে ভরা সবচেয়ে ক্ষুদ্র কণিকাকে

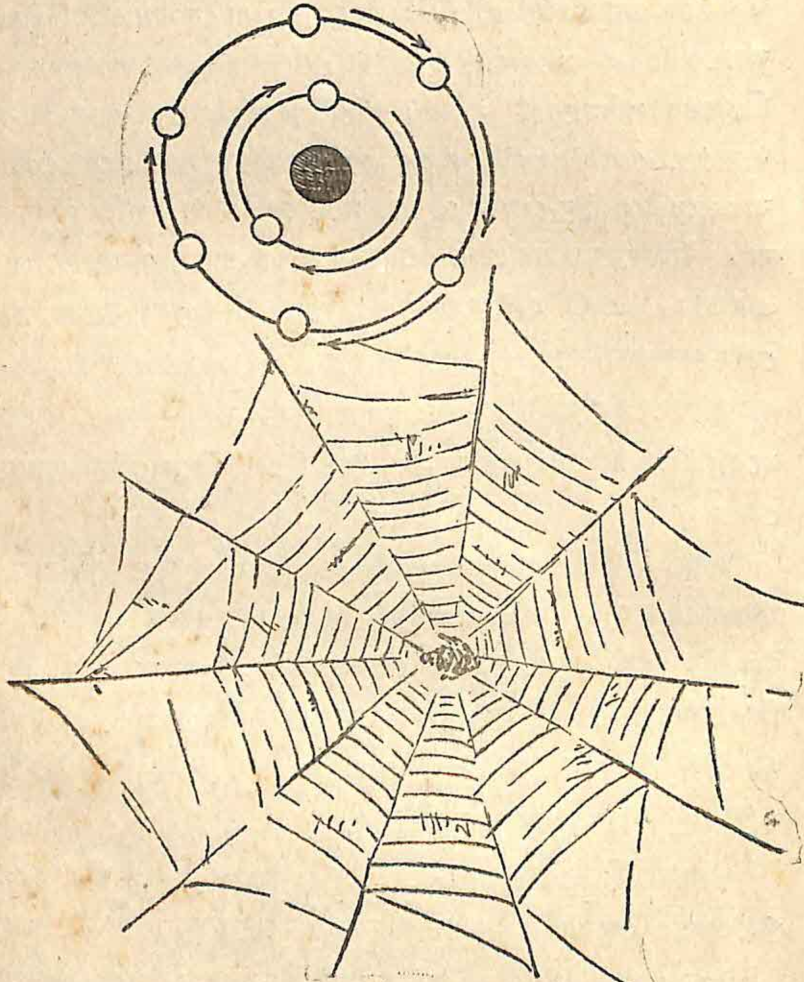
বলা হয় প্রোটন। একটি প্রোটনের ভর বা মাস্ একটি হাইড্রোজেন পরমাণুরই সমান। কিন্তু একটি হাইড্রোজেন পরমাণুতে কোন বিদ্যুৎ নেই, প্রোটনে কিন্তু আছে। আবার ঋণাত্মক বিদ্যুৎভরা অতি ক্ষুদ্র কণিকাকে বলা হয় ইলেকট্রন। ইলেকট্রনের মধ্যে যে সামান্য পরিমাণে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ আছে তার পরিমাণ প্রোটনের ভিতরকার ধনাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণেরই সমান। তবে, বিপরীতধর্মী। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, একটি ইলেকট্রনকে যদি একটি প্রোটনের সঙ্গে রেখে দেওয়া যায় তবে ইলেকট্রন-প্রোটন জোড়ের মধ্যে কোন বিদ্যুৎ-শক্তি থাকবে না। ইলেকট্রনের ভর একটি প্রোটনের ভরের প্রায় দু-হাজার ভাগের এক ভাগ। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর যে খুবই সামান্য, তা তোমাদের জানা আছে। কাজেই এহেন সামান্য ভরের আবার দু-হাজার ভাগের এক ভাগ যে আরও সামান্য হবে তা কি আর বলতে হবে! বিজ্ঞানীরা তাই কাজের সময় ইলেকট্রনের ভরকে তেমন আমল দেন না।

একটি ইলেকট্রন এবং একটি প্রোটনকে একসঙ্গে রাখলে কি রকম অবস্থা হয় তার আভাস একটু দিয়েছি। এহেন একজোড়া ইলেকট্রন-প্রোটনের ভর একটি প্রোটনের ভরের সমান, কিন্তু এই মিলিত কণিকা-জোড়ায় কোন বিদ্যুৎ নেই। কণিকাজোড়াই বা বলি কী করে! একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রোটন মিলে একটি কণিকাই সৃষ্টি করে। একেই বলা হয় নিউট্রন।

পদার্থের ভিতরকার এমনি ধরনের মৌলিক কণিকাগুলোর কথা বলতে আর-এক ধরনের কণিকার কথাও মনে পড়ল। এদের নাম পজিট্রন। পজিট্রনের ভর ইলেকট্রনের ভরের সমান। তবে, এগুলি ধনাত্মক বিদ্যুতে ভরা।

ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন—এই তিন ধরনের মূল কণা দ্বারাই যে-কোন মৌলিক পদার্থের পরামাণু তৈরি হয়েছে। কিন্তু এরা পরমাণুর মধ্যে আছে কিভাবে? শোন।

প্রতি পরমাণুর দুটি অংশ। ভিতরের অংশের নাম কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে কতকগুলো প্রোটন আর নিউট্রন। যতগুলো প্রোটন আছে নিউক্লিয়াসে ঠিক ততগুলো



মাকড়সার জালে সুতোর পরিমাণ খুবই সামান্য। তেমনি অ্যাটমের মধ্যে ইলেকট্রন-প্রোটন সামান্য জায়গা নিয়েই থাকে।

ইলেকট্রন কণিকা নিউক্লিয়াসের বাইরের অংশে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনবরত। গতি এদের প্রচণ্ড। ইলেকট্রনরা ঘোরে নিউক্লিয়াসের

চারদিকে বিভিন্ন বৃত্তাকার পথে। এ পথগুলো আবার দুরে দূরে। এ যেন এক ক্ষুদে সৌরজগত। সৌরজগতের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য, আর তার চারদিকে বিভিন্ন পথে ঘুরপাক খাচ্ছে পৃথিবী, বুধ, মঙ্গল, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহেরা। পরমাণুর ভিতরটাও অনেকটা এমনিভাবে গঠিত। আবার দেখা যায়, সৌরজগতের অধিকাংশ জায়গাই ফাঁকা —এখানে-সেখানে কয়েকটা গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি রয়েছে বর্তমান। ঠিক এইভাবেই পরমাণুর ভিতরকার অধিকাংশ জায়গাই ফাঁকা—কটা ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন আর কতটুকুই বা জায়গা দখল করে থাকবে? মাকড়সার জাল দেখেছ নিশ্চয়ই। একটা জালে যতটা জায়গা থাকে তার সবটাই ফুটো ফুটো—জালের সুতোর পরিমাণ খুব সামান্যই। পরমাণুর অবস্থাও অনেকটা এরকমই।

পরমাণুর চেহারা নাকি গোল, একটা খুদে মার্বেলের মত। কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াসকেও গোল কল্পনা করা হয়েছে। কেন্দ্রীনের ব্যাস সাধারণত এক ইঞ্চির চার কোটি ভাগের একভাগ। এমন পরমাণুও আছে যার কেন্দ্রীনের ব্যাস এক ইঞ্চির এক কোটি ভাগের এক ভাগের মত। একটা পরমাণুতে যতটুকু জায়গা আছে তার এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র জায়গা জুড়ে রয়েছে নিউক্লিয়াস।

যে-কোন একটা পরমাণু বিদ্যুৎভাবাপন্ন নয়। আর তা হবেই বা কী করে? নিউক্লিয়াসের মধ্যে যতগুলো প্রোটন আছে তাদের সকলের পজিটিভ বিদ্যুৎ হল বাইরে ঘুরছে যে ইলেকট্রনরা তাদের নেগেটিভ বিদ্যুতের সমান। কারণ, আগেই বলেছি, পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন আর প্রোটনের সংখ্যা সমান সমান এবং একটি ইলেকট্রনের নেগেটিভ বিদ্যুৎ একটি প্রোটনের পজিটিভ বিদ্যুতের সমান।

কোন পরমাণুর গুণাগুণ, তার ভর প্রভৃতি নির্ভর করে তার নিউক্লিয়াসের গঠনের উপর। ইলেকট্রনের ভর তো বিজ্ঞানীরা আমলেই আনতে চান না।

একটা প্রশ্ন তোমরা করতে পার। ইলেকট্রনরা যখন অনবরত ছুটোছুটি করছে তখন এরা ছিটকে বেরিয়ে যায় না কেন পরমাণুর সীমানা ছাড়িয়ে? সাধারণ অবস্থায় এরা পালাতে পারে না, নিউক্লিয়াসের আকর্ষণের জন্যেই। মহাকর্ষের জন্যে গ্রহ উপগ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে তা তোমাদের জানা আছে। যদিও এদিক-ওদিকে যাওয়ার জায়গা অনেক, কিন্তু গ্রহরা একটা নির্দিষ্ট পথে ঘুরছে চিরটা কাল। ইলেকট্রনদের বেলাও এ-কথা খাটে। তবে হ্যাঁ, ইলেকট্রনদের সহজেই পরমাণুর বাইরে নিয়ে যাওয়া যায়। পরমাণুতে পরমাণুতে ধাক্কাধাক্কিই এ কাজের পক্ষে যথেষ্ট। তবে নিউক্লিয়াসে যে-সব প্রোটন-নিউট্রন আছে তাদের কিন্তু সহজে নিউক্লিয়াস থেকে বাইরে নেওয়া যায় না। এ কাজটি করা চলতে পারে বিশেষ সব ব্যবস্থা করে। বলতে কি, পরমাণু ভাঙার কাজ করে যে সব বিস্ময়কর ব্যাপারের সঙ্গে পরিচয় ঘটছে দিন দিন সে সব হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের মূল কথা। অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমার নাম তোমরা শুনেছ। এ-সব বানানোর গোড়ায় রয়েছে পরমাণু ভাঙা।

এবারে দেখা যাক, বিশেষ-বিশেষ জাতের পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রনরা আছে কিভাবে? সংখ্যায়ই বা এরা কত?

সবচেয়ে হালকা মৌলিক পদার্থ হল হাইড্রোজেন। এর নিউক্লিয়াসে রয়েছে একটি মাত্র প্রোটন, কোন নিউট্রন নেই এখানে। নিউক্লিয়াসের চারদিকে একটি মাত্র ইলেকট্রন ছুটে চলেছে অনবরত। এর পারমাণবিক ভর বা অ্যাটমিক ওয়েট ধরা হয়েছে এক। হাইড্রোজেনের পরে ভারি যে মৌলিকটি রয়েছে তার নাম হিলিয়াম। হিলিয়ামের নিউক্লিয়াসে রয়েছে দুটি প্রোটন আর দুটি নিউট্রন। বাইরে ঘুরছে দুটি ইলেকট্রন। এর পারমাণবিক ভর চার। হিলিয়ামের চেয়ে একটু ভারি যে মৌলিক পদার্থটি তার নাম লিথিয়াম। এটি একটি ধাতু। এর নিউক্লিয়াসে আছে তিনটি প্রোটন, আর চারটি

নিউট্রন। নিউক্লিয়াসের চারদিকে প্রথম পথটিতে দুটি, আর তার বাইরে দ্বিতীয় পথটিতে রয়েছে একটি ইলেকট্রন। কারণ প্রথম পথে দুটির বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারে না। লিথিয়ামের পারমাণবিক ভর সাত। এমনিভাবে নিউক্লিয়াসে প্রোটন নিউট্রনের সংখ্যা ক্রমে বেড়ে গিয়ে ভারি জাতের পরমাণু সৃষ্টি হয়েছে। সবচেয়ে ভারি মৌলিকটি হল ইউরেনিয়াম। এর নিউক্লিয়াসে আছে ৯২টি প্রোটন, আর ১৪৬টি নিউট্রন। নিউক্লিয়াসের বাইরে ৯২টি ইলেকট্রন ছুটছে বিভিন্ন পথে। এর পারমাণবিক ভর ২৩৮।

এখানে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করবার। দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে হালকা হাইড্রোজেন থেকে শুরু করে যদি সবচেয়ে ভারি ইউরেনিয়াম পর্যন্ত মৌলিক পদার্থগুলি পর-পর সাজিয়ে যাওয়া যায় তবে নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটনের সংখ্যা একটি-একটি করে বাড়িয়ে এক এক জাতের পরমাণু পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই বাইরের অংশেও একটি একটি করে ইলেকট্রন বেড়ে যাবে।

কোন ক্লাসে যতগুলো ছেলেমেয়ে আছে তাদের ধর লাইন করে মাঠে ড্রিল করানো হচ্ছে। লাইনে দাঁড়াবার নিয়ম হল, সবচেয়ে যে লম্বায় কম সে দাঁড়াবে প্রথম, তারপর তার চেয়ে যে একটু বেশি লম্বা সে দাঁড়াবে—এমনিভাবে। সবচেয়ে লম্বা যে ছেলেটি সে দাঁড়াবে সবচেয়ে শেষে। এখানে আর একটা কথা বলে রাখা ভাল। ক্লাসের ছেলেদের উচ্চতা প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা। ক্লাসে যেমন রোল নম্বর থাকে তেমনিভাবে ছেলেদের একটা করে রোল নম্বর দেওয়া হল। সবচেয়ে ছোট ছেলেটির রোল নম্বর হল এক, তার পরেরটির দুই, তার পরেরটির তিন—এমনিভাবে। মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক ভর অনুসারে যদি এগুলি সাজিয়ে রাখা যায় তবে হাইড্রোজেনের রোল নম্বর হবে এক, হিলিয়ামের দুই, লিথিয়ামের তিন, আর সর্বশেষ মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়ামের বিরানব্বই। আরও একটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করবে যে, যার যত রোল নম্বর

তার নিউক্লিয়াসে আছে ততগুলো প্রোটন, আর বাইরে ঘুরছে ততগুলো ইলেকট্রন। বিজ্ঞানের ভাষায় মৌলিক পদার্থের এই রোল নম্বরের নাম হল 'অ্যাটমিক নাম্বার'।

রাসায়নিক মিলন কিভাবে ঘটে

মৌলিক পদার্থের মধ্যে নানা ধরনের মিলন ঘটে তৈরি হয় যৌগিক পদার্থ। মৌলিক পদার্থ আর বহু যৌগিক পদার্থ নিয়েই আমাদের দুনিয়া, এসব কথা আগেই বলেছি। এখানে এ কথাটা তোমাদের মনে জাগে নিশ্চয়ই—মৌলিক পদার্থের মধ্যে মিলন ঘটে কেন, আর তা ঘটে কিভাবে ?

প্রথমেই মনে রাখতে হবে, আলাদা জাতের মৌলিক পদার্থের মধ্যে মিলন ঘটা আসলে তাদের অ্যাটম বা পরমাণুদের মধ্যেই মিলন ঘটা। যে-কোন রাসায়নিক মিলনের গোড়ার কথা হল যে, বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে আকর্ষণ-শক্তি বর্তমান। একে আমরা রাসায়নিক আকর্ষণ বা কেমিক্যাল অ্যাট্রাকশন বলতে পারি। পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে রাসায়নিক আকর্ষণ আসলে ভিন্ন জাতের তড়িতের ভিতরে আকর্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

রাসায়নিক মিলনের কথা বলতে গেলে আরও একটি বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় থাকা ভাল। বিষয়টির নাম যোজ্যতা বা ভ্যালেন্সি। ভ্যালেন্সি হল কোন মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক মিলনের ক্ষমতা। পরীক্ষায় দেখা যায়, কোন মৌলিক পদার্থ অন্য একটি মৌলিক পদার্থের সঙ্গে সহজেই মিলন ঘটাতে পারে, আবার তৃতীয় কোন মৌলিকের সঙ্গে রাসায়নিক মিলন মোটে ঘটেই না। সোডিয়াম, ক্লোরিন এবং তামা—তিনটি মৌলিক পদার্থ। সোডিয়ামের সঙ্গে ক্লোরিনের সহজেই মিলন ঘটে, কিন্তু তামার সঙ্গে ক্লোরিনের মিলন

তেমনটি সহজে ঘটে না। আমরা বলি, সোডিয়াম আর ক্লোরিনের মধ্যে রাসায়নিক আকর্ষণ খুব বেশি, আর তামা আর ক্লোরিনের মধ্যে এ আকর্ষণ কম। এই যে আকর্ষণ-শক্তি বা ক্ষমতা একেই বলা হয় ভ্যালেন্সি।

আমরা জানি, যখন মৌলিক পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক মিলন ঘটে তখন তাদের পরমাণুরাই অংশ গ্রহণ করে, অর্থাৎ একের এক বা একের বেশি পরমাণু অন্যের এক বা একের বেশি পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হয়। এ মিলনটা কিন্তু সব সময়েই গোটা-গোটা পরমাণুর ভিতরে ঘটবে। কোন একটি পরমাণুর সঙ্গে অন্য জাতের পরমাণুর দেড়খানা বা আড়াইখানার মিলন ঘটবে না কোনক্রমেই। এমনিভাবে পরমাণুতে পরমাণুতে মিলন ঘটলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় দেখা যাক।

এক অণু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মধ্যে রয়েছে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু আর একটি ক্লোরিন পরমাণু। এক অণু জলের মধ্যে আছে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু আর একটি অক্সিজেন পরমাণু। এক অণু অ্যামোনিয়া গ্যাসের মধ্যে দেখা যাচ্ছে তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু আর একটি নাইট্রোজেন পরমাণু। আবার এক অণু মিথেনের মধ্যে রয়েছে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু আর একটি কার্বন পরমাণু। এমনিভাবে যদি ভিন্ন জাতের হাজার হাজার অণু পরীক্ষা করি তবে আমরা দেখতে পাব যে, হাইড্রোজেন পরমাণুর মিলন-ক্ষমতা অর্থাৎ যোজ্যতা সবচেয়ে কম। কাজেই হাইড্রোজেন পরমাণুর যোজ্যতা বা ভ্যালেন্সি ধরা হয়েছে এক। সেদিক দিয়ে বিচার করে অক্সিজেনের যোজ্যতা দুই, নাইট্রোজেনের তিন, কার্বনের চার ধরা হয়েছে। এমনিভাবে যত মৌলিক পদার্থ আছে তাদের সকলেরই যোজ্যতা জানা থাকলে আমরা অনায়াসেই বলে দিতে পারি যে, কোন রাসায়নিক মিলনের সময় এর ক-টি পরমাণুর সঙ্গে অন্যের ক-টি পরমাণুর মিলন ঘটবে।

কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ভ্যালেন্সি যে সব সময় একই থাকবে, এমন কোন কথা অবশ্য নেই। এমনও দেখা যায়, একই পদার্থ ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে ভিন্ন-ভিন্ন ভ্যালেন্সি অনুসারে কাজ করে। ব্রোমিন, আয়োডিন প্রভৃতির ভ্যালেন্সি দেখা যায় পাঁচ রকম—এক, দুই, তিন, চার এবং পাঁচ। আবার এমন মৌলিক পদার্থ দেখা যায় যাদের কোন ভ্যালেন্সি নেই। তার মানে, এরা সাধারণত কারো সঙ্গে রাসায়নিক মিলন ঘটায় না। এদের নাম নিষ্ক্রিয় বা অলস গ্যাস। হিলিয়াম, নিয়ন প্রভৃতি এ ধরনের গ্যাস।

ভ্যালেন্সি ব্যাপারটা অন্যভাবেও বিচার করা যায়। আমরা জানি, পরমাণু গঠিত হয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে। নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরছে ইলেকট্রনরা বিভিন্ন বৃত্তাকার পথে। নিউক্লিয়াসের সবচেয়ে কাছে যে পথটি সেখানে দুটির বেশি ইলেকট্রন থাকবে না কখনো। কোন পরমাণুর মধ্যে যখন দুইয়ের বেশি ইলেকট্রন থাকবে তখন দুটি ইলেকট্রন প্রথম পথটিতে, আর বাকিগুলো দ্বিতীয় পথটিতে ঘুরতে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় পথটিতে আবার আটটার বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারে না কোন সময়েই। যদি দ্বিতীয় পথে আটের চেয়ে বেশি হয় ইলেকট্রন তবে বাড়তিগুলো চলে যাবে তৃতীয় পথটিতে। তৃতীয় পথটিতেও আট-এর বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারে না। বিজ্ঞানীরা বলেন, কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রীনের সবচেয়ে বাইরের পথটিতে যে ক-টি ইলেকট্রন থাকবে তার ভ্যালেন্সি সাধারণত ততই। একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীনের বাইরে রয়েছে একটি ইলেকট্রন। সুতরাং তার ভ্যালেন্সি হবে এক। হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীনের বাইরে আছে দুটো ইলেকট্রন। এটি একটি অলস গ্যাস, অর্থাৎ এর ভ্যালেন্সি শূন্য। এ কারোর সঙ্গেই রাসায়নিক ক্রিয়া করে না। এর কারণ কী? কারণ হল যে, এর কেন্দ্রীনের বাইরের প্রথম

পথটির ইলেকট্রন সংখ্যা পূর্ণ হয়ে গেছে, অর্থাৎ এ পথটিতে যে কটা ইলেকট্রন থাকার কথা তাই থেকে গেছে। লিথিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতি মৌলিকগুলির পরমাণুর কেন্দ্রীনের বাইরে সবথেকে দূরের পথটিতে রয়েছে একটি করে ইলেকট্রন। কাজেই এদের ভ্যালেন্সি সাধারণত এক। আবার অলস গ্যাস আরগন, নিয়ন, ক্রিপটন প্রভৃতির কেন্দ্রীনের সবচেয়ে বাইরের পথটিতে রয়েছে আটটি ইলেকট্রন। কাজেই এদের ভ্যালেন্সি শূন্য। কারণ এদের কেন্দ্রীনের একেবারে বাইরের পথে আটটির বেশি ইলেকট্রন থাকার কথা নয়। ক্লোরিন গ্যাসটির কথা ধরা যাক। এর পরমাণু কেন্দ্রীনের চারদিককার সবচেয়ে বাইরের পথে আছে সাতটি ইলেকট্রন। কাজেই এর ভ্যালেন্সি সাধারণত সাত। আগেই বলেছি, মৌলিক পদার্থের ভ্যালেন্সি নির্দিষ্ট থাকে না। এক ভ্যালেন্সিওয়ালা ক্লোরিন নিয়েই হামেশাই কারবার আমাদের। তবে হ্যাঁ, ক্লোরিনের সঙ্গে যখন অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলন ঘটে তখন কিন্তু ক্লোরিনের সাত ভ্যালেন্সিই কার্যকরী হয়।

পরমাণুদের আরও একটা বিশেষ গুণ আছে। প্রতিটি পরমাণুরই ঐকান্তিক ইচ্ছে, সে যাতে কোন স্থায়ী অবস্থায় পৌঁছতে পারে। স্থায়ী অবস্থা হল এমন অবস্থা যখন পরমাণুর কেন্দ্রীনের সবচেয়ে বাইরের পথটি তার নির্দিষ্ট ইলেকট্রন নিয়ে পূর্ণ হয়ে বসতে পারে। যেমন ধর, ক্লোরিনের পরমাণু-কেন্দ্রীনের সবচেয়ে বাইরের পথটিতে আছে সাতটি ইলেকট্রন। তার একান্ত ইচ্ছে, সে কোনমতে আর একটা ইলেকট্রন ধার করে তার বাইরের পথটা পূর্ণ করে নেয়। সুবিধে সুযোগ মত সে যদি অন্য কোন আলাদা জাতের পরমাণুকে হাতের কাছে পায় তবে তার কাছ থেকে একটি ইলেকট্রন ধার করতে পেছপাও হবে না সে। এবারে তার সবচেয়ে বাইরের পথে ইলেকট্রনের সংখ্যা দাঁড়াবে আট। একেই আমরা বলেছি স্থায়ী অবস্থা। ক্লোরিন তো ধার করে কাজ চালিয়ে নিল, কিন্তু এমন অনেক

পরমাণুও আছে যারা ধার করার চেয়ে তাদের বাড়তি ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়েও স্থায়ী অবস্থায় যেতে চায়। যেমন ধর, সোডিয়াম পরমাণু। এর কেন্দ্রীনের সবচেয়ে বাইরের পথে রয়েছে একটি মাত্র ইলেকট্রন। এ-যদি স্থায়ী অবস্থায় যেতে চায় তবে সে কাজটি এ দু-ভাবে করতে পারে। এক হল, একটি ইলেকট্রনের মায়া ছেড়ে দেওয়া ; দু-নম্বর হল, অন্য কারো কাছ থেকে সাতটা ইলেকট্রন ধার করে নেওয়া। কিন্তু সাতটা ইলেকট্রন ধার করার চেয়ে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়া অনেক সহজ কাজ। আসলে সোডিয়াম পরমাণু এই দ্বিতীয় কাজটিরই পক্ষপাতী।

এবারে দেখা যাক, একটি সোডিয়াম পরমাণু আর একটি ক্লোরিন পরমাণু কাছাকাছি এলে কি ব্যাপার ঘটে। ক্লোরিন পরমাণু তো ধার করার জন্যে হাত বাড়িয়েই আছে। আর সোডিয়াম, সেও তো ধার দিতে পারলে বেঁচে যায়। কাজেই ক্লোরিন সোডিয়াম থেকে একটি ইলেকট্রন ধার করে নিল। ফলে সে একটা স্থায়ী অবস্থা পেল। সোডিয়ামও একটি ইলেকট্রন ধার দিয়ে স্থায়ী অবস্থা পেয়ে গেছে। দু-জনেই খুশি। তবে, বিপদ ঘটল অন্য দিক থেকে। শোন।

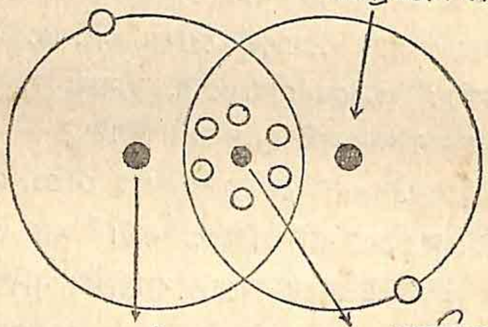
আমরা আগেই বলেছি, পরমাণুরা সাধারণ অবস্থায় বিদ্যুৎভাবাপন্ন নয়। তার মানে পরমাণুর মধ্যে যতগুলো প্রোটন আছে, ইলেকট্রনও আছে ঠিক ততগুলো। সোডিয়াম ও ক্লোরিন পরমাণুর অবস্থাও ওরকমই ছিল, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে বিদ্যুতের নামগন্ধও ছিল না আর কি। কিন্তু কাছাকাছি আসতেই ব্যাপার দাঁড়াল অন্য রকম। সোডিয়াম পরমাণু একটি ইলেকট্রন ছেড়ে দিল। ইলেকট্রন আবার নেগেটিভ বিদ্যুৎ কণিকা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কাজেই সোডিয়াম পরমাণুর মধ্যে নেগেটিভ বিদ্যুতের ঘাটতি পড়ল একটু-খানি। অন্যভাবে বলতে পারি, সোডিয়াম পরমাণু পজিটিভ বিদ্যুৎ-ভাবাপন্ন হল। ক্লোরিন পরমাণু ধার করেছে একটি ইলেকট্রন। ফলে তার ভিতরে নেগেটিভ বিদ্যুৎ একটুখানি বেশি হল, অর্থাৎ

সে ঋণ বা নেগেটিভ বিদ্যুৎভাবাপন্ন হল। নেগেটিভ বিদ্যুৎ আবার পজিটিভ বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে। ফলে সোডিয়াম আর ক্লোরিন পরমাণু-দুটি একে অন্যকে টেনে রাখল খুব কাছাকাছি। আমরা পেলাম একটি সোডিয়াম ক্লোরাইডের অণু। আমরা যে নুন ব্যবহার করি এরই রাসায়নিক নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড। এই যে সোডিয়াম আর ক্লোরিন পরমাণুর মধ্যে আকর্ষণ, একেই বলা হয় রাসায়নিক আকর্ষণ। তাহলে দেখা গেল, রাসায়নিক আকর্ষণ বা কেমিক্যাল অ্যাট্রাকশন আসলে বৈদ্যুতিক আকর্ষণই।

এমনিভাবে ইলেকট্রন ধার দেওয়া বা ধার নেওয়া করেই যে সবরকমের রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে তা অবশ্য নয়। আর একভাবেও এ কাজটি ঘটে। একটা উদাহরণ দিয়েই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। তবে, যেভাবেই রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটুক না কেন তাদের মূলে রয়েছে সেই ইলেকট্রনই।

হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের মিলনে তৈরি হয় জল। দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু রাসায়নিক উপায়ে মিলিত হয় একটি অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে। আমরা পাই এক অণু জল। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীনের বাইরে ঘুরছে একটি ইলেকট্রন। হাইড্রোজেন পরমাণু যদি স্থায়ী অবস্থায় আসতে চায় তবে তার চাই দুটি ইলেকট্রন। এদিকে অক্সিজেন পরমাণুর কেন্দ্রীনের সবচেয়ে বাইরের পথে ঘুরপাক খাচ্ছে ছটি ইলেকট্রন। স্থায়ী অবস্থায় আসতে হলে অক্সিজেন পরমাণুর চাই আরও দুটি ইলেকট্রন, অর্থাৎ কেন্দ্রীনের সবচেয়ে বাইরের পথটিতে আটটি ইলেকট্রন দরকার। কাজটি সমাধান করে অক্সিজেন এমনিভাবে। দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে একটি অক্সিজেনের পরমাণু কাছে টেনে নেয়। তারপর ওদের ইলেকট্রন দুটির উপর ভাগ বসায়। ফলে, অক্সিজেনের নিজের ছটি, আর ওদের দুটি, মোট দাঁড়াল আটটি ইলেকট্রন। কাজেই অক্সিজেনের মনোবাসনা পূর্ণ হল। হাইড্রোজেন পরমাণু-

দুটি আবার দরকার মত অক্সিজেন পরমাণু কেন্দ্রীনের সবচেয়ে বাইরের যে-কোন দুটি ইলেকট্রনের উপর দাবি পেশ করে নিজেদের মনোবাসনা পূর্ণ করে নিল। কারণ স্থায়ী অবস্থার জন্যে



হাইড্রোজেন পরমাণুর চাই দুটি ইলেকট্রন। এ যেন অনেকটা সেই শেয়াল পণ্ডিতের কুমিরের বাচ্চা দেখানোর ব্যাপার আর কি! একটি বাচ্চাই বারবার দেখিয়ে কুমিরকে ঠকিয়েছিল শেয়ালপণ্ডিত, সে গল্প তোমাদের অজানা নয় নিশ্চয়। এখানেও অনেকটা সেইরকম একই ব্যাপার। একই ইলেকট্রনের উপর হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উভয়ই সুবিধেমত দাবি পেশ করে নিজের নিজের কাজ হাসিল করে নিচ্ছে।

পরমাণুরা একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে কিভাবে নতুন জাতের অণু গঠন করে এ ব্যাপারটা আশা করি পরিষ্কার হয়েছে তোমাদের।

নানা রকমের যৌগিক পদার্থ

বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক মিলন ঘটে, তৈরি হয় কত শত যৌগিক পদার্থ বা কম্পাউণ্ড। এ মিলন কিভাবে ঘটে

এবং কেন ঘটে, তা আগেই বলেছি। এবারে আমরা বলতে চাই, এই যে হাজার হাজার কম্পাউণ্ড তৈরি হল তাদের ধরন-ধারন আচার ব্যবহার কী রকম। আমাদের জানা আছে যে, মৌলিক পদার্থের কতগুলোকে বলা হয়েছে ধাতু, কতগুলোকে আবার অধাতু, আবার কতগুলোকে ধাতু এবং অধাতুর মাঝামাঝি। এতে কাজের সুবিধে অনেক। ঠিক তেমনিভাবে কাজের সুবিধের জন্যেই হাজারো রকমের যৌগিক পদার্থকে বিজ্ঞানীরা কতগুলো বিশেষ ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। প্রধান ভাগে তিনটি : অ্যাসিড (অম্ল), বেস (ক্ষার) এবং সল্ট (লবণ)।

অ্যাসিডের আস্বাদ টক। তাছাড়া যে কোন অ্যাসিডের একটি প্রধান গুণ হচ্ছে যে, লিটমাস নামে একটি রাসায়নিক পদার্থের রঙ সে পালটে দেয়। লিটমাস দু-রকম রঙের হতে পারে—লাল আর নীল। খানিকটা অ্যাসিডের সঙ্গে একটুখানি নীল লিটমাস মেশালে তা লাল হয়ে যায়। আমরা সহজেই বলে দিতে পারি যে, যে জিনিসটির সঙ্গে নীল লিটমাস মেশানো হয়েছে তা একটি অ্যাসিড বা অম্ল। এমন অনেক অ্যাসিডও আছে যার সঙ্গে কোন বিশেষ বিশেষ ধাতু মেশালে অ্যাসিডের সঙ্গে ধাতুটির একটি রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে। তৈরী হয় হাইড্রোজেন গ্যাসটি। অ্যাসিডের এসব ব্যাপার-স্যাপার দেখে শুনে বিজ্ঞানীরা অ্যাসিডের জুতসই একটি সংজ্ঞা খাড়া করেছেন। তাঁরা বলেন, যে-কোন অ্যাসিডের মধ্যেই হাইড্রোজেন নামে মৌলিক পদার্থটি উপস্থিত থাকবে। আর এ হাইড্রোজেনের সবটা, কখনো বা অংশবিশেষ, কোন ধাতুর সাহায্যে সরিয়ে দেওয়া যাবে। ধাতুর সঙ্গে অ্যাসিডটির যে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটবে তার পর যা পড়ে থাকবে তা হল একটি লবণ। তোমরা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতির নাম শুনে থাকবে। এর যে-কোন একটি অ্যাসিড পরীক্ষা করলেই তার যে সব গুণের কথা বলা হল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

সালফিউরিক অ্যাসিডটির কথাই ধরা যাক। এক মলিকিউল সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে রয়েছে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু, একটি সালফার বা গন্ধক পরমাণু এবং চারটি অক্সিজেন পরমাণু। সালফিউরিক অ্যাসিড নীল লিটমাসের রঙ লাল করে দেয়। জিঙ্ক একটি ধাতু। পাতলা সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে খানিকটা জিঙ্ক মিশিয়ে দিলে অ্যাসিডের ভিতরকার হাইড্রোজেন গ্যাসটি পুরোপুরি বেরিয়ে যায়। পড়ে থাকে যে পদার্থটি তার রাসায়নিক নাম জিঙ্ক সালফেট! এ একটি লবণ। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সংজ্ঞা অনুসারে সালফিউরিক অ্যাসিডের সব-কটি গুণই আছে। নানা ধরনের অ্যাসিড নিয়ে তাদেরও আবার আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। যেমন, কতগুলো অ্যাসিডকে বলা হচ্ছে অক্সি-অ্যাসিড, কতগুলো আবার হাইড্রা-অ্যাসিড, এমনি সব নাম।

আগেই বলেছি, কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণু তৈরি হয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে। পরমাণুরা সাধারণ অবস্থায় বিদ্যুৎভাবাপন্ন নয়। যদি কোন পরমাণুর ভিতরে ইলেকট্রনের বাড়তি বা ঘাটতি হয় তবে পরমাণুটি বিদ্যুৎভাবাপন্ন হয়। এ অবস্থায় পরমাণুটিকে বলা হয় আয়ন। কোন অ্যাসিডের ভিতরকার হাইড্রোজেন পরমাণুরা অ্যাসিড থেকে সহজেই আলাদা হয়ে যায় হাইড্রোজেন আয়ন আকারে। আমরা বলতে পারি, অ্যাসিড হল হাইড্রোজেন আয়নের একটি ঘাঁটি। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডটি জলে গুললে তা হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন আয়নে ভাগ হয়ে যায়। হাইড্রোজেন হয় পজিটিভ বিদ্যুৎভাবাপন্ন, আর ক্লোরিন হয় নেগেটিভ বিদ্যুৎভাবাপন্ন। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যে উপায়ে তার আয়নে ভাগ হয়ে যাচ্ছে তাকে বলা হয় আয়োনাইজেশন। কোন সলিউশনে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ মাপা হয় যে বৈজ্ঞানিক কথা দিয়ে, তাকে বলা হয় পি. এইচ।

অ্যাসিডের কথা বলতে গিয়ে আমরা লবণ কথাটির ব্যবহার করেছি। রান্নাবান্নার কাজে যে লবণ ব্যবহার করা হয় তাকেই আমরা সাধারণত লবণ বলে জানি। কিন্তু কোন রাসায়নিকের কাছে ঐটিই একমাত্র লবণ নয়। লবণ কথাটির মানে রসায়নশাস্ত্রে ব্যাপক। কোন অ্যাসিড থেকে কোন ধাতুর সাহায্যে হাইড্রোজেন তাড়িয়ে দিলে যা পড়ে থাকে তা-ই হল রাসায়নিকের লবণ বা সল্ট। অবশ্য রান্নাবান্নার কাজে আমরা যে লবণ ব্যবহার করি অন্যান্য লবণ থেকে তাকে আলাদাভাবে বোঝবার জন্যে শুধু লবণ কথাটির বদলে সাধারণ লবণ বা কমন সল্ট কথাটি ব্যবহার করে থাকি আমরা। এই লবণটির রাসায়নিক নাম হল সোডিয়াম ক্লোরাইড। এমনিভাবে পটাসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম সালফেট, জিঙ্ক সালফেট প্রভৃতি কত শত যে লবণ আছে রসায়নশাস্ত্রে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। জলের মধ্যে গুলে গেলে লবণও অ্যাসিডের মত আয়নিত হয়ে যায়। অবশ্য সবরকমের লবণই যে জলে গুলে যাবে এমন কোন কথা নেই। এমন অনেক লবণ আছে যা জলে গুলে যায় না। লবণেরও নানা উপ-বিভাগ আছে। কতগুলো লবণের নাম দেওয়া হয়েছে নর্ম্যাল সল্ট, কতগুলোর নাম অ্যাসিড সল্ট, আবার আর এক দলের নাম বেসিক সল্ট।

এবারে দেখা যাক, বেস কাকে বলে। কোন ধাতুর সঙ্গে যখন অক্সিজেনের মিলন ঘটে তখন যে জিনিসটি আমরা পাই তাকে এক কথায় বলা হয় অক্সাইড, যেমন—সোডিয়াম অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, কপার অক্সাইড ইত্যাদি। আবার কোন ধাতুর সঙ্গে যখন হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের একটি একটি পরমাণু মিলিতভাবে যোগাযোগ ঘটায় তখন যে পদার্থটি আমরা পাই তাকে বলা হয় হাইড্রোক্সাইড—যেমন, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্রভৃতি। বেস আসলে কোন ধাতুর অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড। এ কোন অ্যাসিডের সঙ্গে রাসায়নিক উপায়ে

মিলিত হয়ে তৈরি করে কোন লবণ এবং খানিকটা জল। বিশেষ জাতের বেসকে বলা হয় অ্যালকালি। এ জাতীয় বেস জলে সহজেই গুলে যায়। যে দ্রবণটি পাওয়া যায় তা আবার লাল রঙের লিটমাসকে নীল রঙে বদলে দেয়। অ্যালকালির মধ্যে কস্টিক সোডা বা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং কস্টিক পটাস বা পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের নাম তোমাদের কাছে হয়ত অজানা নয়। যে-সব বেস জলে গুলে যায় তারাও অ্যাসিডের মত আয়নিত হয়ে থাকে।

এখানে বলে রাখা ভাল যে, অ্যাসিড এবং বেসের ধর্ম একেবারেই বিপরীত। তাছাড়া কোন অ্যাসিডের সঙ্গে যদি কোন বেসের রাসায়নিক মিলন ঘটে তবে অ্যাসিড এবং বেস উভয়েই তাদের নিজস্ব ধর্ম হারিয়ে ফেলে। ক্রিয়া শেষে তৈরি হয় একটি লবণ। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, আর কস্টিক সোডা (একটি বেস, এখানে অ্যালকালি)—এ-দুটির মধ্যে একটি রাসায়নিক মিলন ঘটাতে পারলে আমরা পাব সোডিয়াম ক্লোরাইড নামে একটি লবণ, আর খানিকটা জল।

লক্ষ-লক্ষ যৌগিক পদার্থ বা কম্পাউণ্ড নিয়ে রাসায়নিকদের কারবার। এদের মধ্যে প্রধান তিনটি জাত নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করলাম মাত্র।

পর্যায় সারণী

আগেই বলেছি, শতাধিক মৌলিক পদার্থ বা এলিমেন্ট আর লক্ষ লক্ষ যৌগিক পদার্থ বা কম্পাউণ্ড নিয়েই রাসায়নিকের কারবার। এত সব পদার্থের ধরন-ধারন, তাদের আচার-ব্যবহার প্রভৃতির সঙ্গে বিশেষ পরিচয় রাখতে হয় রাসায়নিককে। কাজটি যে তেমন সহজ ব্যাপার নয় তা তোমাদের আশা করি বলে দিতে হবে না। এ সব অসুবিধে উতরে ওঠবার জন্যে নানারকম কৌশলের সাহায্য নিতে

হয়। নানারকম যৌগিক পদার্থের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আগেই যা বলা হয়েছে সেও হল এই ধরনের একটি কৌশল। আমরা এখানে মৌলিক পদার্থের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

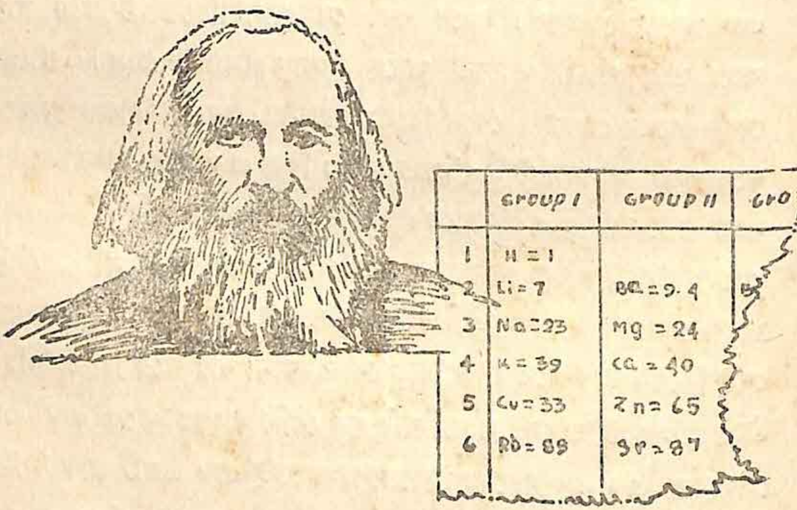
প্রশ্ন উঠতে পারে, শ-খানেক তো মৌলিক-পদার্থ। এর আবার অত শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজনটা কোনখানে? বিজ্ঞানী বলেন, প্রয়োজন আছে। কারণটা বলি।

মনে করা যাক, একটা লাইব্রেরিতে বেশ কিছু বই আছে। এর মধ্যে কতগুলো ভ্রমণ-কাহিনী, কতগুলো উপন্যাস, কতগুলো শিকার কাহিনী, কতগুলো গল্প, কতগুলো কবিতা, এমনি সব। লাইব্রেরির আলমারিতে যদি এমনভাবে বইগুলো সাজিয়ে রাখা যায় যে, এক-একটি আলমারিতে এক-এক ধরনের বই রাখা আছে, তবে যে-কোন বই খুঁজে বার করার কাজটি বেশ সহজ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এখানেও একটা অসুবিধে হবে। মনে কর, যে আলমারিতে উপন্যাস রাখা আছে তার পাঁচটি তাকেই আছে নানা ধরনের উপন্যাস। কাজেই কোন বিশেষ লেখকের কোন বিশেষ ধরনের একখানা উপন্যাস খুঁজতে হলে পুরো আলমারিটাই খুঁজতে হবে। কিন্তু এ কাজটা আমরা আরও সহজ করতে পারি এমনিভাবে। এক-একটি তাকে যদি ঠিক একই ধরনের উপন্যাসগুলো আমরা রাখতে পারি তবে যেই না বলা যে অমুক লেখকের একখানা ঐতিহাসিক উপন্যাস চাই, সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সেই বিশেষ তাকটাতে হাত দিয়ে সে বইখানা বার করে দিতে পারি। ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংখ্যা যদি খুব বেশি দাঁড়ায় তবে এক এক লেখকের এক এক ধরনের উপন্যাসের জন্যেই এক একটি তাক নির্দিষ্ট করে রাখা যেতে পারে। এমনিভাবে বই সাজালে বই খুঁজে পাওয়া যেমন সহজ হয়, তেমনি যে-কোন আলমারির যে কোন তাকের দিকে দৃষ্টি দিলেই সহজেই বলে দেওয়া যায় যে, ওখানে অমুক ধরনের বই রাখা আছে। অনেকটা এই ধরনের শ্রেণীবিভাগই করা হয়েছে মৌলিক পদার্থদের নিয়ে। যেভাবে এ কাজটি করা হয়েছে সে

সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করলেই যে-কোন মৌলিক পদার্থের গুণ-ধর্ম, তার আচার ব্যবহার, সেটি থেকে তৈরি নানা জাতের যৌগিক পদার্থের ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে সহজেই একটা অনুমান করা সম্ভব হয়। তাছাড়া সেই মৌলিক পদার্থটির কাছাকাছি যে-সব মৌলিক পদার্থ রয়েছে তাদের সম্বন্ধেও একটা ধারণা হওয়া সম্ভব। কাজেই দেখা যাচ্ছে, এলিমেন্টদের শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন কতটা।

এলিমেন্টদের যে সারণী বা টেবলে সাজিয়ে এ কাজটি করা হয় তারই নাম পর্যায় সারণী বা পিরিয়ডিক টেবল। আমরা এখানে পর্যায় সারণীর বদলে পিরিয়ডিক টেবল কথাটিই ব্যবহার করব।

মৌলিক পদার্থ বা এলিমেন্টদের এমনিভাবে সাজানোর চেষ্টা বহু দিনের। আগেই বলেছি, এলিমেন্টদের কতগুলো ধাতু, আবার কত-গুলো অধাতু। ধাতু এবং অধাতুদের মধ্যে গুণ-ধর্মের পার্থক্য অনেকটা।



আজকের দিনে যে পিরিয়ডিক টেবলের সঙ্গে আমাদের পরিচয়. তার গোড়াপত্তন করেন মেণ্ডেলিফ।

কাজেই এলিমেন্টদের ধাতু এবং অধাতুতে ভাগ করে দেওয়া—এও একরকম শ্রেণীবিভাগ ছাড়া আর কিছু নয়। এরপর এক রসায়নবিদ এলিমেন্টদের মধ্যে আর-এক ধরনের সাদৃশ্য দেখলেন। তিনি দেখলেন,

একই ধরনের তিনটি এলিমেণ্টকে যদি তাদের পারমাণবিক ভার বা অ্যাটমিক ওয়েট অনুসারে সাজানো যায় তবে দেখা যায় যে, মধ্যের এলিমেণ্টটির অ্যাটমিক ওয়েট দু-ধারের দুটি এলিমেণ্টের অ্যাটমিক ওয়েটের গড়ের প্রায় সমান। যেমন, ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন একই ধর্মের তিনটি এলিমেণ্ট। ক্লোরিনের অ্যাটমিক ওয়েট ৩৫.৫, ব্রোমিনের ৮০.০ এবং আয়োডিনের ১২৭.০। ক্লোরিন এবং আয়োডিনের অ্যাটমিক ওয়েটের গড় হয় ৮১.২। দেখা যাচ্ছে, এটা ব্রোমিনের অ্যাটমিক ওয়েটের প্রায় সমান। যে বিজ্ঞানী এ নিয়মটি লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর নাম ডুবেরিনার।

সে যাক গে। এর পরে আরও অনেক বিজ্ঞানী এদিকে মাথা ঘামিয়েছেন। এঁদের মধ্যে নিউল্যাণ্ড, লোথার মেয়ার, মেণ্ডেলিফ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ করার মত। মেণ্ডেলিফের নামই অবশ্য পিরিয়ডিক টেবলের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত রয়েছে। তবে, আজকের দিনে যে পিরিয়ডিক টেবলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তার গোড়াপত্তন মেণ্ডেলিফ করে থাকলেও এর মধ্যে নতুন বহু ব্যাপার যুক্ত হয়েছে, হয়েছে নানা পরিবর্তন।

কিভাবে মৌলিক পদার্থ সাজানো হয়েছে

প্রতিটি এলিমেণ্টের পরমাণুর একটা ভার আছে যা প্রকাশ করা হয়েছে অ্যাটমিক ওয়েট দিয়ে। অ্যাটমিক ওয়েট কথাটি বলতে সত্যিকারের কী বুঝি আমরা, তা আগেই বলা হয়েছে। এও আমাদের জানা আছে যে সবচেয়ে হালকা পরমাণু হল হাইড্রোজেনের। এর অ্যাটমিক ওয়েট ধরা হয়েছে ১। ৯২টি এলিমেণ্টের মধ্যে সবচেয়ে ভারি হল ইউরেনিয়াম। এর অ্যাটমিক ওয়েট ২৩৮। গত কয়েক বছরে যে-কটি এলিমেণ্ট আবিষ্কার করা হয়েছে তা আমরা আমাদের আলোচনার বাইরে রাখছি। কারণ এ-সব এলিমেণ্ট তৈরি করা

হয়েছে কৃত্রিমভাবে; তাছাড়া এদের জীবনকালও অতি সামান্য। বিজ্ঞানীরা অবশ্য এদের আচার ব্যবহার রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক খোঁজ-খবর সংগ্রহ করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে।

সে যাই হোক, অ্যাটমিক ওয়েট অনুসারে এলিমেণ্টদের একটি টেবলে সাজানো হয়েছে এমনিভাবে: সবচেয়ে প্রথম বসানো হয়েছে সবচেয়ে হালকা এলিমেণ্ট হাইড্রোজেনকে, আর সবচেয়ে শেষে বসানো হয়েছে সবচেয়ে ভারি এলিমেণ্ট ইউরেনিয়ামকে। মাঝখানে বসানো হয়েছে অন্যান্য এলিমেণ্টদের তাদের অ্যাটমিক ওয়েট অনুসারে। যেমন, হাইড্রোজেনের পর ভারি এলিমেণ্ট হল হিলিয়াম; এর অ্যাটমিক ওয়েট ৪। কাজেই পিরিয়ডিক টেবলে এর স্থান হয়েছে দু-নম্বর জায়গায়। হিলিয়ামের পর ভারি এলিমেণ্ট লিথিয়াম; এর অ্যাটমিক ওয়েট ৭। কাজেই এ বসে গেছে তিন নম্বর জায়গায়। তারপর স্থান পেয়েছে বেরিলিয়াম নামে এলিমেণ্টটা। এর অ্যাটমিক ওয়েট ৯। এরপর এসেছে বোরোন অ্যাটমিক ওয়েণ্ট প্রায় এগারো নিয়ে। বোরোনের পর বসেছে কার্বন নামে এলিমেণ্টটি। এর অ্যাটমিক ওয়েট বারো। এমনি ধরনে সাজানো হয়েছে এলিমেণ্টগুলোকে। পিরিয়ডিক টেবলে এরা যেমন যেমন আসন পেয়েছে তেমনিভাবে যদি স্থান নির্দেশ করা হয় তবে আমরা দেখি বেরিলিয়াম বসেছে চার নম্বরে, বোরোন পাঁচ নম্বরে, কার্বন ছয় নম্বরে। ক্লাসে যেমন রোল নম্বর থাকে তেমনি এ নম্বরগুলোকে আমরা এলিমেণ্টেদের রোল নম্বর বলতে পারি। অবশ্য ক্লাসের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম যে ভর্তি হয়েছে তারই রোল নম্বর হয়েছে এক; তারপর যেমন-যেমন ছাত্র ভর্তি হয়েছে রোল নম্বরও পড়ে গেছে ঠিক তেমন-তেমন ভাবে। কোন ক্লাসে যে ছেলেটির ওজন সবচেয়ে কম তার রোল নম্বর এক হতে হবে এমন কোন কথা নেই, কিন্তু পিরিয়ডিক টেবলে আছে। রোল নম্বরের দিক দিয়ে বিচার করলে হাইড্রোজেনের রোল নম্বর দাঁড়ায় এক, হিলিয়ামের দুই, লিথিয়ামের তিন, বেরিলিয়ামের চার,

বোরোনের পাঁচ, কার্বনের ছয়, এমনি আর কি। এই রোল নম্বরকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়, অ্যাটমিক নম্বর। কথাটা আগেই উল্লেখ করেছি। পিরিয়াডিক টেবলের দিকে দৃষ্টি ফেরালে আমরা দেখি যে, দশ যার রোল নম্বর সে এলিমেন্টটি হল নিয়ন, উনত্রিশ নম্বরে আছে তামা বা কপার, লোহা রয়েছে ছাব্বিশ নম্বরে, রুপো রয়েছে সাতচল্লিশ নম্বরে এবং সোনার রোল নম্বর উনাশি। বলা বাহুল্য, ইউরেনিয়ামের রোল নম্বর বা অ্যাটমিক নম্বর বিরানব্বই। পরপর এভাবে এলিমেন্টদের সাজাতে গিয়ে দেখা গেল যে, প্রতি এলিমেন্ট থেকে তার পরের এলিমেন্টটির ধর্ম আলাদা, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট-সংখ্যক এলিমেন্ট সাজানো হয়ে গেলে তার পরের এলিমেন্টটির ধর্ম যেটি থেকে শুরু হয়েছে তার সঙ্গে বেশ মিলে যাচ্ছে।

শ্রেণী আর পর্যায়

একটা টেবলের প্রতি খোপে একটি করে এলিমেন্টের স্থান নির্দিষ্ট হল। খোপগুলোর কতক আড়াআড়ি, কতক আবার লম্বালম্বি। লম্বালম্বি অর্থাৎ উপর নিচ ঘরে বসানো হয়েছে একই গুণ এবং ধর্মের এলিমেন্টগুলো। যেমন, তিন নম্বর খোপে বসেছে লিথিয়াম। এর ঠিক নিচের ঘরের নম্বর এগারো। এখানে বসেছে সেডিয়াম। কারণ কী? না, লিথিয়াম আর সোডিয়াম উভয়ের মধ্যে ভারি মিল, উভয়েই ধাতু। সোডিয়ামের ঠিক নিচের ঘরে বসানো হয়েছে পটাসিয়ামকে। এর অ্যাটমিক নম্বর অর্থাৎ রোল নম্বর উনিশ। কারণ হল সোডিয়ামের সঙ্গে পটাসিয়ামের বিশেষ সাদৃশ্য। একই কারণে পটাসিয়ামের ঠিক নিচে বসেছে সাঁইত্রিশ নম্বরের এলিমেন্ট রুবিডিয়াম, তার নিচে পঞ্চান্ন নম্বরের সিজিয়াম। উপর নিচে এই যে এলিমেন্টের দল বসে গেছে যাদের মধ্যে ধর্ম ও অন্যান্য বহু বিষয়েই রয়েছে বেশ মিল, তাদের বলা হয়েছে গ্রুপ বা শ্রেণী। ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন,

আয়োডিনের মধ্যে অসম্ভব রকম সাদৃশ্য। এরা স্থান পেয়েছে সাত নম্বর গ্রুপে। পিরিয়ডিক টেবলে দেখা যায় যে, মোট নয়টি গ্রুপ আছে। শূন্য গ্রুপ, প্রথম গ্রুপ, দ্বিতীয় গ্রুপ ইত্যাদি করে অষ্টম গ্রুপ পর্যন্ত। অবশ্য প্রতি গ্রুপকে আবার সুবিধে-মত দুটি উপশ্রেণী বা সাব-গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে কাজের সুবিধের জন্যে।

আড়াআড়িভাবে যে খোপগুলো আছে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে পিরিয়ড বা পর্যায়। এলিমেন্টগুলোকে মোট সাতটি পিরিয়ডে ভাগ করা হয়েছে। এদের নাম হল ক্ষুদ্র পর্যায় বা শর্ট পিরিয়ড, বৃহৎ পর্যায় বা লং পিরিয়ড ইত্যাদি।

প্রথম পর্যায় অর্থাৎ ফাস্ট´ পিরিয়ডে আমরা দেখি দু-টি এলিমেন্ট—এরা হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। দ্বিতীয় পিরিয়ডে আছে আটটি এলিমেন্ট—লিথিয়াম, বেরিলিয়াম বোরোন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফ্লোরিন এবং নিয়ন। তৃতীয় পিরিয়ডেও দেখতে পাই আটটি এলিমেন্ট, নাম—সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, ফসফরাস, গন্ধক, ক্লোরিন এবং আর্গন। চতুর্থ পিরিয়ডটি আকারে বড়। এখানে আছে সবসমেত আঠারোটি এলিমেন্ট। এর শুরুতে আছে পটাসিয়াম, আর শেষে আছে ক্রিপটন। পঞ্চম পিরিয়ড চতুর্থেরই মত। এখানেও রয়েছে আঠারোটি এলিমেন্ট; প্রথমটি রুবিডিয়াম, আর শেষেরটি জেনন। ষষ্ঠ পিরিয়ড আকারে খুবই বড়। এখানে রয়েছে বত্রিশটি এলিমেন্ট। এ পিরিয়ডের একটি খোপেই স্থান দিতে হয়েছে চৌদ্দটি বিশেষ ধরনের এলিমেন্টকে। তাছাড়া স্বাভাবিক নিয়মে এখানে রয়েছে আরও দুটি এলিমেন্ট। ফলে এ খোপে মোট ষোলটি এলিমেন্টকেই বসিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় পেলেন না বিজ্ঞানীরা। সপ্তম পিরিয়ডে রয়েছে ছটি এলিমেন্ট। এরা সকলেই তেজস্ক্রিয় বা রেডিও-অ্যাকটিভ, অর্থাৎ এদের গা থেকে আপনা-আপনি আল্ফা, বিটা এবং গামা রশ্মি নামে তিন রকমের শক্তি বেরোয়। আধুনিক কালে যে-সব নতুন

নতুন এলিমেণ্ট আবিষ্কৃত হচ্ছে তাদেরও স্থান হয়েছে এ পিরিয়ডে।

পিরিয়ডিক টেবলের বাঁদিকে যে-সব এলিমেণ্ট আছে তাদের সকলেই ধাতু, কিন্তু একেবারে ডানদিকের এলিমেণ্টগুলো অধাতু। ধাতুর ধর্মটা বাঁদিক থেকে শুরু করে ক্রমে কমে আসতে দেখা যায়। প্রথম গ্রুপের একটি এলিমেণ্ট হল সোডিয়াম। এটি একটি ধাতু। যখন অক্সিজেনের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলন ঘটে তখন দেখা যায় সোডিয়ামের ভ্যালেন্সি হয় এক। অন্যান্য ধাতুজাতীয় এলিমেণ্টদের বেলাও একথা খাটে। সপ্তম গ্রুপের একটি এলিমেণ্ট হল ক্লোরিন। এটি একটি অধাতু। অক্সিজেনের সঙ্গে মিলনের সময় এর ভ্যালেন্সি হয় সাত।

পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে আগেই বলেছি। যে এলিমেণ্টটির অ্যাটমিক নম্বর যত তার কেন্দ্রীনের বাইরে ঠিক ততগুলো ইলেকট্রন ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্য কোন এলিমেণ্টের সঙ্গে মিলনের সময় ইলেকট্রনরা যেভাবে কার্যকরী হয় সে-কথাও আগে বলেছি। আরও নানা বিষয়ে রয়েছে এলিমেণ্টদের মধ্যে নানা সাদৃশ্য।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পিরিয়ডিক টেবলে কোন একটি মৌলিক পদার্থের স্থানটি দেখে তার ধর্ম, রীতিনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করে নিতে পারি। অবশ্য সব ব্যাপারেই একটা সীমা আছে। তাই দেখা যায়, পিরিয়ডিক টেবলের কিছু কিছু ত্রুটি রয়েছে বর্তমান। হাইড্রোজেন গ্যাসটিতে নিয়ে বিজ্ঞানীরা পড়েছেন ভারি মুস্কিলে। পিরিয়ডিক টেবলে এর স্থানটি যে কোন্‌খানে তা এখনো ঠিক হয় নি। এমনি ধরনের আরও দু-একটি ত্রুটি আর কি।

কয়েকটি প্রয়োজনীয় ধাতু

ধাতু এবং অধাতু এ কথার উল্লেখ করা হয়েছে কয়েকবার। কিন্তু ধাতু বা অধাতু বলতে আমরা কী বুঝি?

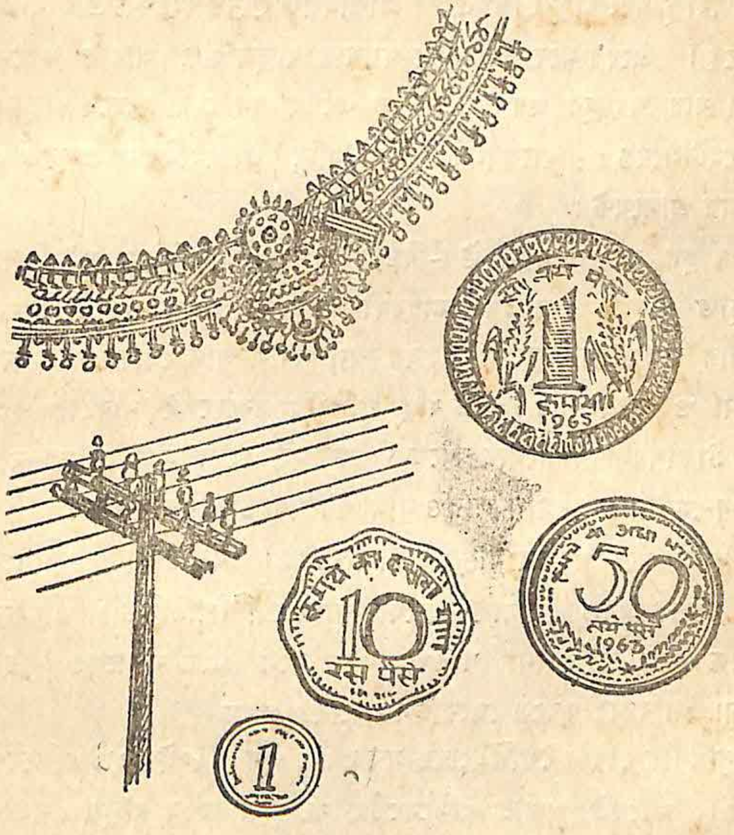
রাসায়নের ভাষায় ধাতু হল এমন সব এলিমেন্ট যার রয়েছে কতগুলো বিশেষ গুণ যাকে বলা হয় ধাতব গুণ বা মেটালিক প্রপার্টি। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, দুটি বা তার বেশি ধাতু মিশিয়ে যে জিনিস পাওয়া যায় তার নাম অ্যালয় বা সংকর ধাতু। অনেক সময় ধাতুর বদলে নানা কাজে অ্যালয় ব্যবহারই সুবিধেজনক। স্টীল বা ইস্পাতের সঙ্গে যে আমাদের এত পরিচয় তাও কিন্তু একটি অ্যালয়। খাঁটি ধাতু সে নয়। অবশ্য তার বেশির ভাগই লোহা, সঙ্গে মেশানো থাকে ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, মলিব্‌ডেনাম, ভ্যানেডিয়াম প্রভৃতি ধাতু। অবশ্য কিছু পরিমাণে কার্বনও মেশানো থাকে সবরকম ইস্পাতের সঙ্গেই।

বলছিলাম ধাতুর কথা। ধাতুর এমন কী বিশেষ গুণ আছে যাকে আমরা ধাতব গুণ বলতে পারি? শোন।

একমাত্র পারদ ছাড়া সব কটি ধাতুই সাধারণ উষ্ণতায় কঠিন অবস্থায় থাকে। ধাতুদের আছে এক বিশেষ ধরনের চাকচিক্য। তাছাড়া তাপ আর বিদ্যুতের ভাল পরিবাহক হল যে-কোন ধাতু। ধাতুদের পিটিয়ে পাত বানানো যায়, আবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে ধাতুকে তারে পরিণত করা যায়। কোন ধাতুর উপর চাপ প্রয়োগ করলে চাপকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আছে যে-কোন ধাতুর। বেশি চাপে যে-কোন ধাতুর বিকৃতি ঘটে, কিন্তু চাপ সরিয়ে নিলে ধাতু আবার তার নিজের চেহারা ফিরে পায়। এমনি ধরনের নানা গুণ আছে বলেই কতগুলো এলিমেন্টের নাম দেওয়া হয়েছে ধাতু।

অক্সিজেন বা ক্লোরিনও এক একটি এলিমেন্ট। ধাতুর যে সব গুণ আছে এদের তা নেই বলেই এদের বলা হয় অধাতু। ধাতু এবং অধাতুর মধ্যে আর একটি বিষয়েও বেশ অমিল দেখা যায়। একটি উদাহরণ নিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে তোমাদের কাছে। সোডিয়াম ক্লোরাইড হল আমরা যে নুন খাই তারই রাসায়নিক নাম। খানিকটা নুনের জল নিয়ে তার সঙ্গে একটুখানি সালফিউরিক অ্যাসিড

মিশিয়ে দিতে হবে। তারপর বিশেষ ব্যবস্থা করে নুনের জলের ভিতর দিয়ে একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাতে হবে। নুনের জলের মধ্যে যে ধাতব দণ্ডটি দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রবেশ করবে তাকে বলা হয় অ্যানোড, আর যে দণ্ডটি দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ বেরিয়ে আসবে



টাকাপয়সা, গয়নাগাঁটি বা ইলেক্‌ট্রিক তার—এ সবের জন্যে দরকার হয় সোনা, রুপো বা তামার।

তাকে বলে ক্যাথোড। নুনের জলের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালালে দেখা যায় যে, সোডিয়াম ক্লোরাইড ভেঙে তৈরি হচ্ছে সোডিয়াম আর ক্লোরিন। সোডিয়াম গিয়ে জমা হচ্ছে ক্যাথোডে, আর ক্লোরিন হচ্ছে অ্যানোডে। সোডিয়াম একটি ধাতু, আর ক্লোরিন

হল অধাতু। সোডিয়ামের মতই অন্য যে-কোন ধাতু এ রকম অবস্থায় জমা হবে ক্যাথোডে। আবার ক্লোরিনের মত যে-কোন অধাতু গিয়ে জমা হবে অ্যানোডে। ধাতু এবং অধাতু চিনে বের করবার এ একটি ভাল হাতিয়ার।

অধাতু এবং ধাতু ছাড়া এদের মাঝামাঝি গুণের কয়েকটি এলিমেণ্টও রয়েছে। এদের মধ্যে কখনো দেখা যায় ধাতুর গুণ, আবার কখনো দেখা যায় অধাতুর গুণ। এ-জন্যে এদের নাম দেয়া হয়েছে ধাতুকল্প বা মেটালয়েড। আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, জারমেনিয়াম প্রভৃতি এ ধরনের এলিমেণ্ট।

ধাতুর মধ্যেও নানা উপ-বিভাগ আছে। লিথিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি ধাতুকে বলা হয় ক্ষারধর্মী ধাতু বা অ্যালকালি মেটাল। আবার কতগুলো ধাতুকে বলা হয় অ্যালকালি-আর্থ মেটাল। তামা, সোনা ও রুপো—এ তিনটি ধাতু পৃথিবীর সবদেশেই ব্যবহার করা হয় টাকাপয়সা বানানোর কাজে। কাজেই এদের নাম দেওয়া যায় কয়েন-মেটাল। এমনি আরও নানা ধরনের উপ-বিভাগ রয়েছে।

ধাতুর সঙ্গে পরিচয় মানুষের দীর্ঘদিনের। যত রকম ধাতু রয়েছে তার মধ্যে সম্ভবত সোনাই মানুষের কাছে বেশি পরিচিত। তাছাড়া বিশুদ্ধ অবস্থায় সোনা পাওয়া যায় বলে প্রাচীনকালের মানুষ সোনা আবিষ্কার করতে পেরেছিল সবচেয়ে প্রথম।

পৃথিবীর দেহটা তৈরি হয়েছে সব রকম, অর্থাৎ সেই ৯২টি এলিমেণ্ট দিয়ে। কাজেই অন্যান্য এলিমেণ্টের সঙ্গে সব রকম ধাতুরও সন্ধান মেলে পৃথিবীর বুকে। কিন্তু এর মধ্যে কোনটিই বিশুদ্ধ অবস্থায় নেই। থাকে এরা নানারকম এলিমেণ্টের সঙ্গে রাসায়নিক উপায়ে মিলিত হয়ে। লোহার কথাই ধর না। লোহাও একটি এলিমেণ্ট বা মৌলিক পদার্থ। লোহা পাওয়া যায় খনি থেকে। কিন্তু কী আকারে? বেশ বিশুদ্ধ লোহা যদি পাওয়া যেত তবে কতই না সুবিধে হত। টাটানগর, দুর্গাপুর, রাউরকেল্লা, ভিলাই প্রভৃতি জায়গায়

বিরাট বিরাট লোহার কারখানা গড়ে ওঠার কোন প্রয়োজনই হত না। কিন্তু তা তো হবার নয়। রাসায়নিক উপায়ে অন্যান্য এলিমেণ্টের সঙ্গে মিশে থাকে লোহা। এই অবস্থাতেই এদের খনি থেকে কেটে তোলা হয়। এ অবস্থায় লোহার পাথরকে বলা হয় আকর বা ওর (ore)। লোহার আকরের মধ্যে রেড্‌-হিমাটাইট, ম্যাগনেটাইট, সিডেরাইট প্রভৃতি প্রধান। দেখা যায়, লোহার সঙ্গে অক্সিজেনের রাসায়নিক টানটা বড় বেশি। কাজেই লোহার আকর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লোহা এবং অক্সিজেনের মিলনে তৈরি নানা ধরনের কম্পাউণ্ড। বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়, লোহার অক্সাইড। অবশ্য গন্ধক বা কার্বনের সঙ্গে লোহার আকর্ষণও কম নয়। লোহার মত অন্যান্য ধাতুও এমনিভাবে কম্পাউণ্ড বা যৌগিক পদার্থের আকারেই মাটিতে থাকে। এদেরই বলা হয় বিভিন্ন ধাতুর আকর বা ওর। আকর থেকে ধাতুটি বের করে নেওয়ার কাজ সহজ নয়। এ কাজের জন্যে গড়ে উঠেছে একটি বিশেষ ধরনের রাসায়নিক শিল্প। একে বলা হয় ধাতুনিষ্কাশন শিল্প, ইংরেজিতে যার নাম মেটালার্জি।

তাহলে দেখা গেল, কোন ধাতুই প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকতে পারে না। একমাত্র ব্যতিক্রম অবশ্য সোনা। পৃথিবীর উপরিতলের বেশ কাছেই সোনা কখনো-কখনো বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। কাজেই প্রাচীন মানুষের কাছে সোনার পরিচয় লুকোনো থাকার কথা নয়। সত্যি কথা বলতে কি, সোনার এহেন কতগুলো বিশেষ গুণ আছে যার জন্যে সেদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সোনার কদর কমে নি। যে-কোন বিষয়ের উৎকর্ষের কথা বললেই আমরা সোনা কথাটির ব্যবহার করি।

সোনা কোন তরল পদার্থে গুলে যায় না। একমাত্র অ্যাকোয়া রেজিয়াই সোনাকে গুলে নিতে পারে। একভাগ নাইট্রিক অ্যাসিড আর তিনভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মিশ্রণকেই বলা হয় অ্যাকোয়া রেজিয়া। অ্যাকোয়া রেজিয়া কথাটির মানে কী জান?

মানে হল, রাজকীয় জল। রাজকীয় ধাতু সোনা গুলতে পারে বলেই এই নাম। অবশ্য সেলেনিক অ্যাসিড এবং আরও দু-একটি জিনিস সোনাকে গুলে দেবার ক্ষমতা রাখে। সোনা খুব ভারি ধাতু, তা জলের চেয়ে উনিশ গুণের বেশিই হবে। সোনা দিয়ে খুব সরু তার এবং পাত বানানো যায়। এক আউন্সের ৪৩৮ ভাগের এক ভাগ ওজনকে বলা হয় এক গ্রেন। এক গ্রেন সোনা নিয়ে তা দিয়ে প্রায় পাঁচশো ফুট লম্বা সুতো বানানো যায়। খাঁটি সোনার সুতো দিয়ে তৈরি শাড়ির এক সময় প্রচলন ছিল আমাদের দেশে। এখনো ও ধরনের দু-একখানা শাড়ি কলকাতার কোন-কোন মিউজিয়ামে দেখা যায়। সুতোর পর ধর সোনার পাত। খুব পাতলা সোনার পাতে তৈরি নানা অলঙ্কারের আমাদের দেশে আজও চলন আছে। এক ইঞ্চির এক লক্ষ ভাগের এক ভাগের মত পাতলা সোনার পাত ও বানানো সম্ভব।

খাঁটি সোনা তেমন শক্ত নয়। তাই সোনার সঙ্গে সামান্য পরিমাণে তামা বা রুপো ব্যবহার করার রেওয়াজ আছে। তামা-মেশানো সোনাকে বলা হয় গিনি সোনা। এতে খাঁটি সোনার রঙটা একটু লালচে হয়। কাজেই গয়নাগাটির রঙ খোলে।

ক্যারাট কথাটির সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে নিশ্চয়ই; সোনার বিশুদ্ধতা প্রকাশ করবার জন্যে ক্যারাট কথাটি ব্যবহার করা হয়। খাঁটি সোনা বলতে বুঝায় ২৪-ক্যারাট সোনা। কাজেই কোন সোনার বিশুদ্ধতা যদি হয় ১২-ক্যারাট তবে আমরা অনায়াসেই বুঝব যে, এ সোনার মধ্যে আধাআধি খাদ মেশানো আছে। আজকাল যে ১৪-ক্যারাট সোনার প্রচলন হয়েছে তার মধ্যে খাঁটি সোনা আছে শতকরা ৫৮·৩ ভাগ।

বহু প্রাচীন কালেই সোনার সঙ্গে পরিচয় ছিল মানুষের, সেকথা আগেই বলেছি। বাইবেলে আছে যে, স্বর্গ থেকে একটি নদী নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে। নদীটির ছিল চারটি ধারা। একটি ধারা

বয়ে গেছে হ্যাভিলা দেশের ভিতর দিয়ে। সে দেশটি ছিল সোনায় ভরা। মিডাসের গল্প অনেকের জানা আছে। দেবতাদের কাছ থেকে রাজা মিডাস এমন বর পেলেন যে, তিনি যা কিছু ছোঁবেন তাই হয়ে যাবে সোনা। খাবার স্পর্শ করলেন রাজা। তা পরিণত হয়ে গেল সোনায়। জল খেতে যাবেন, তাও হয়ে গেল সোনা। অবস্থাটা সহজেই অনুমান করতে পারছ। একমাত্র কন্যাকে স্পর্শ করলেন রাজা। মেয়েও তাঁর সোনার প্রতিমায় পরিণত হয়ে গেল। প্যাকটোলাস নদীর জলে স্নান করে রাজা রেহাই পেয়েছিলেন সেবারকার মত। তবে, এই স্নানের ফলে নদীর বালি সোনায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আর নদী থেকে এই সোনা সংগ্রহ করে কত লোকই যে ধনী হয়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

এ তো গল্প। কিন্তু এখন থেকে ছ-হাজার বছর আগে রোম্যানরা দক্ষিণ ইউরোপের নানা জায়গায় সোনার খনি থেকে যে সোনা আহরণ করত তার প্রমাণ আছে। মধ্যযুগে অ্যালকেমিস্টরা লোহা প্রভৃতি কম মূল্যবান ধাতুকে সোনায় পরিণত করতে চেষ্টা করত। অবশ্য সেকালের অ্যালকেমিস্টদের স্বপ্ন আজ সফল হতে চলেছে আধুনিক বিজ্ঞানীদের হাতে। প্ল্যাটিনাম বা পারদকে তো তাঁরা ইতিমধ্যে সোনায় পরিণত করে ফেলেছেন। তবে, কাজটি করতে যা খরচ পড়ছে তার চেয়ে খনির সোনার দাম অনেক কম। তার উপর প্ল্যাটিনাম আবার সোনার চেয়েও দামি ধাতু।

দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, আলাস্কা, ক্যানাডা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে সোনার খনি আছে।

গয়নাগাটি ছাড়া সোনার আরও অনেক ব্যবহার আছে। সোনার গয়নার কদর সব দেশে। কিন্তু ওষুধ হিসেবেও যে সোনার ব্যবহার আছে তা হয়ত অনেকের জানা নেই। সোনার কোন-কোন লবণ বিশেষ জাতের চর্মরোগ সারাতে ব্যবহৃত হয়। রেডিও গোল্ড

ক্যানসার রোগের ওষুধ, বিশেষভাবে ফুসফুসের ক্যানসারে। দাঁত বাঁধানোর কাজে সোনার ব্যবহার তোমরা হয়ত জান।

রুপোর কথা

ধাতুর মধ্যে সবচেয়ে সাদা ধাতু হল রুপো। রুপোর সঙ্গেও মানুষের পরিচয় বহুদিনের। সোনার মতই রুপোও বিশুদ্ধ আকারে প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। আবার অনেক সময় সোনা এবং রুপো উভয়ই একই সঙ্গে মিশে থাকে। সোনা এবং রুপোর মিশ্রিত ধাতু অর্থাৎ সংকর ধাতুর নাম ইলেকট্রাম। নানা কাজে ব্যবহার আছে এই ইলেকট্রামের।

টাকা পয়সা বানানোর কাজে রুপোর ব্যবহার সবদেশেই। অবশ্য আজকাল এ কাজে এর ব্যবহার ক্রমে ক্রমে কমে আসছে। নানা ধরনের শিল্প-কাজে সোনার চেয়েও রুপোর ব্যবহার বেশি বলে মনে হয়। রুপোর সুতোয় তৈরি সুন্দর সুন্দর গয়না (যার নাম ফিলিগ্রি), সূক্ষ্ম কারুকার্য-করা নানাধরনের পাত্র, রুপোর তৈরি বড় বড় সব শীল্ড প্রভৃতির আজও চলন আছে নানান দেশে। এ-সব ছাড়া, রুপোর নানারকমের লবণেরও ব্যবহার রয়েছে নানা কাজে। অ্যালকেমিস্টরা রুপোর নাম দিয়েছিল লুনা অর্থাৎ চাঁদ। রুপো চাঁদের মত চকচকে সাদা বলেই হয়ত এই নাম। রুপোর একটি লবণের নাম লুনার কস্টিক। রসায়নের ভাষায় এর নাম হল সিলভার নাইট্রেট। লুনার কস্টিকের ব্যবহার আছে বিভিন্ন কাজে। ঘা সারানো, রক্তক্ষরণ বন্ধ করা প্রভৃতি রোগে ওষুধের কাজ করে লুনার কস্টিক। ফোটোগ্রাফির কাজে প্রচুর পরিমাণে লুনার কস্টিক ব্যবহার করা হয়।

তামা

ঐতিহাসিকরা মানুষের সভ্যতাকে কতগুলি যুগে ভাগ করে থাকেন। সেই প্রাচীন কালে মানুষ দলবদ্ধভাবে বনে জঙ্গলে ঘুরে

বেড়াত, বন্য পশু শিকার করে তাদের কাঁচা মাংস খেত। না ছিল তাদের কোন ঘর বাড়ি, না লজ্জা নিবারণের জন্যে কোন পোশাক পরিচ্ছদ। তারপর ক্রমে তারা পাথর ঘসে শিকারের অস্ত্র বানালো, কাঁচা মাংসের বদলে আগুনে ঝলসে নিত সে সব মাংস। আরও পরে চাষবাস করতে শিখল মানুষ, বাড়িঘর বানাল, ধাতুর ব্যবহার শিখল। এমনিভাবে আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে মানব সভ্যতা। 'বিজ্ঞান চেতনা'র পরবর্তী কোন খণ্ডে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

মানব সভ্যতার এমনি একটি যুগের নাম দেওয়া হয়েছে পাথুরে যুগ বা প্রস্তর যুগ। ইংরেজিতে বলা হয় স্টোন এজ। সোনা এবং রুপোর মত তামার সঙ্গেও মানুষের পরিচয় সেই প্রস্তর যুগ থেকেই। তামার সঙ্গে টিন ধাতুটি মিশিয়ে যে অ্যালয় বা সংকর ধাতু বানানো যায় তার নাম ব্রোঞ্জ। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এখন থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগেকার মানুষ ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানত। নানারকম অস্ত্রশস্ত্র, বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার, শিল্পদ্রব্য প্রভৃতি তৈরি করতে ব্যবহার করা হত ব্রোঞ্জ। এ সবের জন্যে সে সময়টার নাম দেওয়া হয়েছে ব্রোঞ্জ যুগ বা ব্রোঞ্জ এজ।

যতরকম ধাতু বর্তমান কালে নানা কাজে ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে লোহার পরেই তামার স্থান। তামার ব্যবহার যে কত কাজে লাগে বলে শেষ করা যায় না। টেলিফোন বা টেলিগ্রাফের তার থেকে শুরু করে সব রকম বিদ্যুৎশিল্পই একরকম অচল হয়ে পড়ে তামার অভাবে। বাষ্প চলাচলের যে পাইপ তাও অনেক ক্ষেত্রে বানানো হয় তামা দিয়ে। তামার পয়সার প্রচলন পৃথিবীর সব দেশেই। ছবি ছাপাতে হলে ব্লক তৈরি করতে হয় তামা দিয়ে। গৃহস্থবাড়ির বাসনকোসনও যে তামায় তৈরি তা হয়ত অনেকের জানা আছে। পুরোপুরি তামার তৈরি বাসন-কোসন ছাড়া পেতল কাঁসার থালাবাটিও যে তামার তৈরি তা হয়ত

তোমাদের জানা নেই। একশো ভাগের মধ্যে সত্তর ভাগ তামা আর ত্রিশ ভাগ জিঙ্ক বা দস্তা মিশিয়ে যে অ্যালয় বানানো হয় তারই নাম পেতল। ব্রোঞ্জের কথা আগেই বলেছি। শতকরা নব্বই ভাগ তামার সঙ্গে দশ ভাগ টিন মেশালেই পাওয়া যাবে ব্রোঞ্জ। টিনের পরিমাণ বাড়িয়ে যদি শতকরা কুড়ি ভাগ করা যায় তবেই পাওয়া যাবে কাঁসা। জার্মান সিলভারের জিনিসপত্তরের সঙ্গে হয়ত পরিচয় আছে অনেকের। জার্মান সিলভারের মধ্যে রয়েছে তামা, দস্তা আর নিকেল ধাতু। ডাচ মেটাল হল তামা আর সামান্য পরিমাণ দস্তার মিশ্রণ। সোনার মত পাতলা পাত বানানো যায় ডাচ মেটাল দিয়ে। তামার সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম, বেরিলিয়াম প্রভৃতি ধাতু মিশিয়ে আজকাল এমন সব অ্যালয় বানানো সম্ভব হয়েছে যা অনায়াসে ইস্পাতের উপরও টেক্কা মারতে পারে। এ সব অ্যালয় ব্যবহার করা হয় উড়োজাহাজের প্রপেলার, যন্ত্রপাতির গিয়ার প্রভৃতি তৈরি করার কাজে। তামা, ম্যাংগানিজ আর নিকেল মিশিয়ে এমন এক অ্যালয় তৈরি হয়েছে যা যে-কোন উত্তাপই সহ্য করতে পারে।

তামার তৈরি জিনিস যখন খোলা পড়ে থাকে তখন তার উপর একটি মজার রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে। বায়ুর মধ্যে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন ছাড়া আছে কার্বন ডাই-অক্সাইড নামে একটি গ্যাস আর জলীয় বাষ্প। এদের সঙ্গে মিশে তামা পরিণত হয় কপার কার্বনেট নামে একটি লবণে। কপার কার্বনেটের রঙ সবুজ। তাছাড়া এ খুব শক্ত এবং জলে গুলে যায় না ফলে তামার তৈরি কোন মূর্তি কিছুদিন খোলা পড়ে থাকলে তার উপর চমৎকার একটি সবুজ রঙের আবরণ পড়ে। এর ফলে মূর্তিটি দেখতে হয় ভারি চমৎকার। এ সবুজ আবরণটি থাকার জন্যে মূর্তির ভিতরকার তামা ক্ষতিগ্রস্তও হতে পারে না।

তামার নানারকমের লবণ আছে। এ সবও নানা কাজে লাগে।

মানুষের রক্তের একটি অংশের নাম লোহিত কণিকা। এগুলো দেখতে গোল চাকতির মত। লোহিত কণিকার মধ্যে আধা-তরল যে পদার্থটি থাকে তার নাম হিমোগ্লোবিন। হিমোগ্লোবিনের মধ্যে থাকে সামান্য পরিমাণে লোহা। এই হিমোগ্লোবিনের সাহায্য নিয়েই লোহিত কণিকা দেহের সব জায়গায় অক্সিজেন বয়ে নিয়ে যায়। এর ফলে দেহে রক্ত-প্রবাহ চলে—আমরা বেঁচে থাকি। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেহের ভিতর লোহার একটা অতি প্রয়োজনীয় কাজ কাছে। অনেকটা এমনি ধরনের কাজ করে তামাও। অবশ্য তা মানুষ বা ঐ-জাতীয় প্রাণীর দেহে নয়। শামুক, শুক্তি প্রভৃতি খোলস-ঢাকা প্রাণীদের দেহের রক্তে তামাই লোহার মত কাজ করে চলে একই ধারায়। মানুষের দেহে লোহার অংশে ঘাটতি পড়লে রক্তে লোহিত কণিকা কমে যায়। শামুক বা শুক্তির দেহেও তামার অভাবে এই একই ব্যাপার ঘটে।

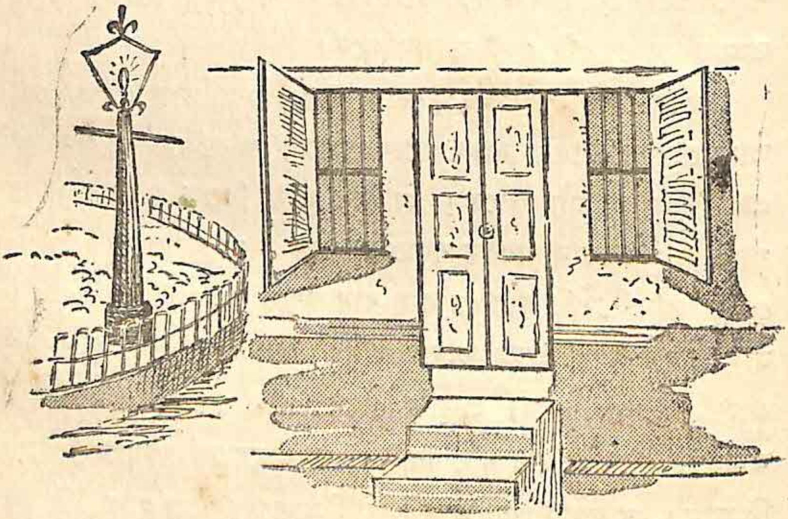
এহেন যে তামা, তা খনি থেকে উদ্ধার করা, তারপর তা থেকে তামা বের করে নিয়ে নানা কাজে লাগানো যে বর্তমান কালের একটি প্রধান শিল্প তা আর বলতে! খনিতে তামা বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকতে পারে না। থাকে নানারকম পদার্থের সঙ্গে মিশে। প্রধানত যে ওর থেকে তামা তৈরি করা হয় তার নাম কপার পাইরাইটস। পৃথিবীর নানা দেশে আছে প্রচুর তামার খনি। ক্যানাডা, জাপান, রাশিয়া, জার্মানি, স্পেন, কঙ্গো প্রভৃতি দেশে প্রচুর তামার খনি রয়েছে। আমাদের দেশে তামার খনি অল্পই। যা আছে তা একমাত্র বিহারের সিংভূমে। এখানকার ওর থেকে তামা নিষ্কাশনের কাজ হয় ঘাটশিলায়।

লোহার কথা

আজকের দুনিয়ায় যে একটিমাত্র ধাতু সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় নানা কাজে তা হল লোহা। অবশ্য লোহা বললে ঠিক বলা

হবে না। ঠিক করে বলতে গেলে বলতে হয়, স্টীল বা ইস্পাত। এক কথায় লোহা বলা হলেও খাঁটি লোহা এবং ইস্পাতের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। ইস্পাত হল লোহা, কার্বন এবং অন্য কোন ধাতুর মিশ্রণ। একে আমরা সংকর ধাতু বা অ্যালয় বলতে পারি। বিশুদ্ধ লোহার ব্যবহার নেই বললেই চলে। একমাত্র রাসায়নিক কৌতূহল মেটানোর কাজেই যা বিশুদ্ধ লোহার প্রয়োজন।

তিন রকমের লোহার সঙ্গে আমাদের নিত্য পরিচয়। এরা হল কাস্ট আয়রন বা ঢালাই লোহা, স্টীল বা ইস্পাত, এবং রট আয়রন বা পেটা লোহা। কার্বনের পরিমাণ দিয়েই বিচার করা হয় কোন্‌টা কোন্‌ জাতীয় লোহা। কাস্ট আয়রনের মধ্যে কার্বনের পরিমাণ থাকে শতকরা দু-ভাগ থেকে সাড়ে চার ভাগ। ইস্পাতের



রেলিং, জানালার শিক প্রভৃতি তৈরি করা হয় ঢালাই লোহা বা কাস্ট আয়রন দিয়ে।

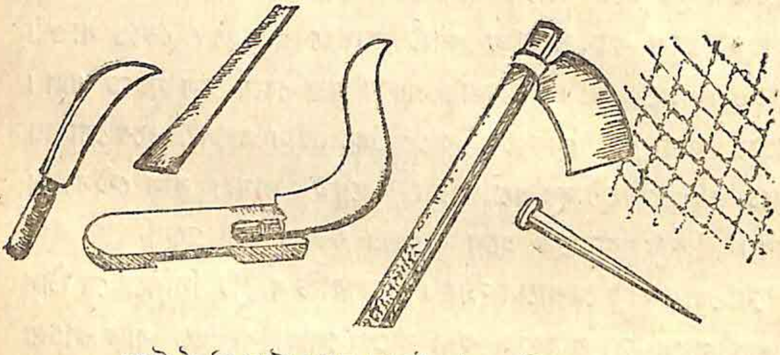
মধ্যে কার্বনের পরিমাণ অনেকটা কম—শতকরা ০·১৫ থেকে ১·৫০ ভাগ। রট আয়রনের মধ্যে কার্বনের পরিমাণ সবচেয়ে কম—শতকরা ০·১২ থেকে ০·২৫ ভাগ মাত্র।

এ তিন রকমের লোহার ধর্ম বিচার করলেই বুঝতে পারা যায় ইস্পাতের ব্যবহার এত বেশি কেন।

কাস্ট আয়রনে কার্বন ছাড়া সামান্য পরিমাণ সিলিকন, ম্যাংগানিজ, গন্ধক এবং ফসফরাস মেশানো থেকে। এ লোহা বেশ শক্ত, কিন্তু সহজেই ভেঙে যায়। এর ফলে পিটিয়ে কোন কিছু বানাতে গেলে এ লোহায় কাজ হয় না। তাছাড়া লোহায় লোহায় জোড়া লাগানোর কাজেও এ অচল। ফলে কাস্ট আয়রনের প্রায় সবটাই চলে যায় ইস্পাত এবং রট আয়রন তৈরির কাজে। কিছুটা অবশ্য রাস্তায় আলো জ্বালানোর খুঁটি, রেলিং, জানলা দরজার শিক, যন্ত্রপাতির কিছু-কিছু অংশ প্রভৃতি তৈরির কাজে লাগে।

স্টীলের মধ্যে অন্যান্য ধাতুও থাকে মেশানো। এক একটি বিশেষ ধাতুর জন্যে স্টীলের ধর্ম হয় আলাদা। মাংগানিজ থাকলে স্টীল হয় বেশ শক্ত, তাছাড়া কাস্ট আয়রনের সহজে ভেঙে যাওয়া দোষটিও থাকে না। লোহার একটা মস্ত দোষ হল মরচে ধরা। স্টীলের মধ্যে যদি মেশানো থাকে ক্রোমিয়াম ধাতুটি, তবে লোহার মরচে ধরা দোষটি দূর হয়ে যায়। একেই আমরা বলি স্টেনলেস স্টীল। স্প্রিং বানাতে হলে ব্যবহার করতে হবে ক্রোমিয়াম আর ভ্যানেডিয়াম ধাতু মেশানো স্টীল। কোবাল্ট ধাতুটি মিশিয়ে যে স্টীল পাওয়া যাবে তা ব্যবহার করা যাবে লোহা বা অন্য ধাতু কাটার কাজে। তাছাড়া এ দিয়ে স্থায়ী চুম্বকও বানানো যায়। খানিকটা তামা মিশিয়ে নিলেও লোহার মরচে ধরা কমে যায়। আবার যদি তামার বদলে লেড বা সীসা মেশানো যায় তবে সে স্টীল ব্যবহার করা যাবে যন্ত্রপাতির অংশ, মোটর গাড়ির কোন কোন অংশ প্রভৃতি বানাবার কাজে। টিনের নানাধরনের কৌটোর সঙ্গে আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে। কিন্তু এগুলো যে টিনের নয় তা সকলের জানা নেই। এ-সব কৌটো আসলে শস্তা দামের স্টীলের তৈরি, উপরে লাগানো আছে খুব পাতলা একটুখানি টিনের প্রলেপ। কার-

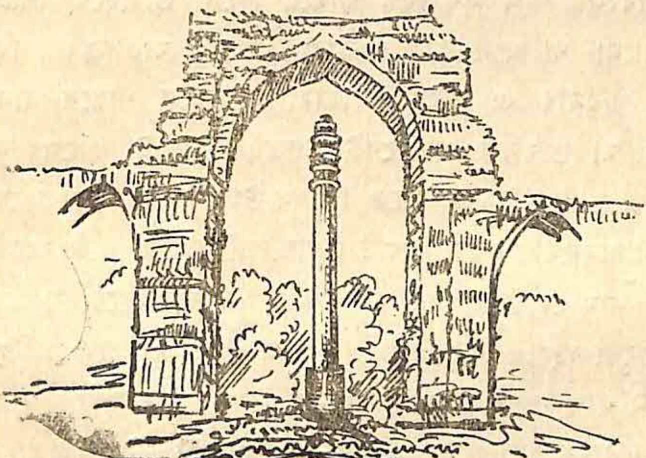
খানায় দেখা যায় কোন ধাতুর প্লেট প্রভৃতি কাটা হচ্ছে বা ছেঁদা করা হচ্ছে। এ কাজে যে হাতিয়ারটি ব্যবহার করা হয় তা তৈরি হয়েছে টাংস্টেন স্টীল দিয়ে। মোলিবডেনাম ধাতুটি মিশিয়ে সে স্টীল মিলবে তা উড়োজাহাজের নানা অংশ বানানোর কাজে লাগে। এখানে জেনে রাখা ভাল, স্টীলের সঙ্গে যে ধাতুটি মেশানো হয় তা থেকেই ঐ স্টীলের নাম। যেমন, নিকেল-স্টীল, ক্রোম-স্টীল ইত্যাদি। স্টীলের ব্যবহার কোন্ কাজে যে নেই তা বলা মুস্কিল। অট্টালিকা, জাহাজ, রেলগাড়ি, রেললাইন, কামান, বন্দুক প্রভৃতি থেকে শুরু করে ছোট্ট একটা স্থূচ বা ঘড়ির অতি ছোট্ট একটি অংশ—এর সব জায়গায়ই দরকার হচ্ছে স্টীলের। পুরোপুরি এ-সব বলতে গেলে বিরাট একখানা বই-ই হয়ে পড়বে।



সবই তৈরি পেটা লোহা বা রট আয়রন দিয়ে।

রট আয়রনেরও ব্যবহার প্রচুর। অন্য দু-জাতের লোহার চেয়ে রট আয়রন অনেকটা নরম। তাই রট আয়রনকে অনেক সময় নরম লোহাও বলা হয়ে থাকে। এর সহজে ভেঙে যাওয়ার দোষটি নেই। দৈনন্দিন কাজে আমরা যে সব লোহার জিনিস ব্যবহার করি তা নরম লোহা দিয়েই তৈরি। দা, বঁটি, কোদাল, পেরেক, তার বা তারের জাল—সবই তৈরি রট আয়রন বা পেটা লোহায়। টেলিগ্রাফ, ডায়নামো, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা প্রভৃতি যন্ত্রেও নরম লোহারই দরকার।

এহেন যে লোহা তার সঙ্গে মানুষের পরিচয় কিন্তু দীর্ঘদিনের। ব্রোঞ্জ যুগের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। পণ্ডিতেরা বলেন, ব্রোঞ্জ যুগের শেষ ভাগেই লোহার সঙ্গে মানুষের পরিচয়। ভারতবর্ষ প্রভৃতি কয়েকটি দেশে বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে স্টীলের ব্যবহার। যীশুখ্রীস্টের জন্মেরও প্রায় তিন-চারশো বছর আগের লেখা একখানা চিকিৎসা-বিদ্যার বই থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন কালের হিন্দুরা এত উঁচু স্তরের স্টীল বানাতেন যা দিয়ে একশো রকমের বিভিন্ন ডাক্তারি যন্ত্রপাতি বানানো হয়েছিল। প্রাচীন সিরিয়া দেশের দামাস্কাস সোর্ড বা তরবারির বিশেষ নাম



দিল্লীর লৌহস্তম্ভের গায়ে আজও কিন্তু মরচে ধরে নি একটুও

ছিল। সেকালের বীরদের হাতে একখানা দামাস্কাস সোর্ড না থাকলে সে তো বীর নামেরই অযোগ্য। এই দামাস্কাস সোর্ড তৈরি হত ভারতে তৈরি ইস্পাত দিয়ে। দিল্লীর কুতুব মিনারের কাছে যে লৌহ-স্তম্ভটি আছে তা এখন থেকে বহু শত বছর আগে তৈরি হলেও গায়ে কিন্তু একটুও মরচে ধরে নি। এ থেকেই প্রমাণ হয়, ভারতবর্ষ সেকালে কত উন্নত ছিল বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে।

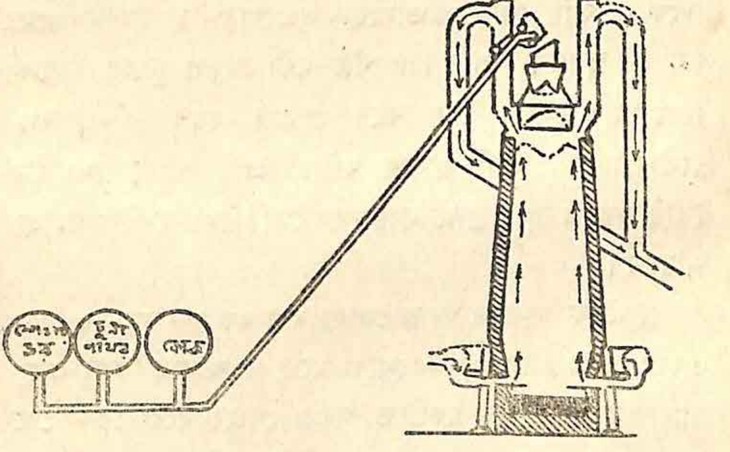
যীশুখ্রীস্টের জন্মের প্রায় তেরশো বছর আগেকার মিশরীয়

সৈন্যদের হাতে শোভা পেত লোহার তৈরি অস্ত্রশস্ত্র। তবে মধ্যযুগের গ্রীস এবং রোম দেশে রট আয়রনেরই ছিল বেশি ব্যবহার। কাস্ট আয়রনের ব্যবহারও কিছু ছিল। কিন্তু স্টীল জিনিসটা যে কী, কেন স্টীলের যন্ত্রপাতি বা অস্ত্রশস্ত্র বেশি টেকে এবং মরচে ধরে কম, এ সব খবর তাদের জানা ছিল না তখনকার দিনে। স্টীল, কাস্ট আয়রন এবং রট আয়রনের মধ্যে পার্থক্য যা আমরা আগেই বলেছি তা প্রথম বলেন সুইডেনের এক রাসায়নিক। নাম ওডল্ফ্ বার্জম্যান। সে ১৭৮১ সালের কথা। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, কার্বনের পরিমাণ বেশি থাকার জন্যে কাস্ট আয়রন সহজে ভেঙে যায়। আবার কার্বনের অংশ খুব করে কমিয়ে দিলে তা দিয়ে পিটিয়ে পাত বানানো বা অন্য কোন চেহারা দেওয়া যায় না। কিন্তু কার্বনের পরিমাণ এ দুইয়ের মাঝামাঝি রাখতে পারলে আমরা পাই স্টীল, যা গুণে ধর্মে সবদিকেই উন্নত। কাজেই সকলের দৃষ্টি পড়ল এদিকে। আর এ কাজে বিশেষ উৎসাহ এবং উন্নতি দেখা দিল স্টীল বানানোর সহজ একটি উপায় আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই। উপায়টির নাম বেসিমার পদ্ধতি। এটি আবিষ্কার হয়েছিল এখন থেকে একশো বছরের কিছু আগে। বেসিমার পদ্ধতির পরে আবিষ্কৃত হল ওপেন হার্থ পদ্ধতি। নানা ধরনের নানা উন্নতি ঘটতে লাগল স্টীল বানানোর উপায়ের মধ্যে। সর্বশেষ যে উপায়টি চালু হয়েছে এ কাজে তার নাম এল. ডি. পদ্ধতি। এ সব সম্বন্ধে বিজ্ঞান চেতনার অন্য কোন খণ্ডে ভালভাবে বলা হবে।

পৃথিবীর মাটিতে যে কটি মৌলিক পদার্থ সবচেয়ে বেশি আছে তার মধ্যে লোহার স্থান চতুর্থ। প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করে অক্সিজেন, সিলিকন এবং অ্যালুমিনিয়াম। অন্যান্য বহু ধাতুর মতই লোহা কখনো একক অবস্থায় থাকে না। থাকে অক্সিজেন, কার্বন, গন্ধক প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিক উপায়ে মিশ্রিত অবস্থায়। লোহার বিভিন্ন রকমের ওরের মধ্যে রেড হিমাটাইট, ব্রাউন হিমাটাইট,

ম্যাগনেটাইট প্রভৃতি প্রধান। এ সব থেকেই প্রথমে লোহা নিষ্কাশণ করা হয় বিশেষ ধরনের চুল্লিতে। যে লোহা বেরিয়ে আসে তারই নাম কাস্ট আয়রন। কাস্ট আয়রন থেকে বানানো হয় স্টীল। হিমাটাইটের মধ্যে লোহার পরিমাণ থাকে শতকরা ৭০ ভাগ। ম্যাগনেটাইটের ভিতরে লোহা থাকে শতকরা ৭২ ভাগের উপর। লিমোনাইট নামে যে ওরটি পাওয়া যায় তার মধ্যে লোহা আছে শতকরা ৬০ ভাগ।

লোহার যে-সব ওর থেকে লোহা বানানো হবে তা প্রথমে একটুখানি গরম করে নিতে হয়। তারপর তা মেশাতে হয় দুটি জিনিসের সঙ্গে। একটি হল বিশেষ ধরনের একরকমের কয়লা যার নাম হল কোক। অন্যটি হল লাইমস্টোন বা চুনাপাথর।



যে চুল্লিতে কাস্ট-আয়রন বানানো হয় তার নাম ব্লাস্ট-ফারনেস

হিসেবমত মিশিয়ে নিয়ে এ তিনটি জিনিস অর্থাৎ লোহার ওর, কোক এবং লাইমস্টোন একটি বিশেষ ধরনের চুল্লিতে বেশ করে উত্তপ্ত করে নিতে হয়। চুল্লিটির নাম ব্লাস্ট-ফারনেস।

ব্লাস্ট-ফারনেস উঁচুতে হয় ৫০ থেকে ১০০ ফুটের মত—দেখতে গোলাকার; ব্যাস পনের থেকে কুড়ি ফুট। বানানো হয়েছে

স্টীলপ্লেট দিয়ে। খাড়াভাবে বসানো এ চুল্লির উপর এবং নিচের দিকটা কিছুটা সরু। নিচের দিকে কতগুলো পাইপ দিয়ে গরম হাওয়া পাম্প করে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। গরম হাওয়ার ঝাপটা দেওয়া হয় বলেই এ চুল্লির নাম ব্লাস্ট-ফারনেস। গরম হাওয়ার ঝাপটার বেগ হল ঘণ্টায় প্রায় আড়াইশো মাইল। লোহা তৈরি হয়ে গেলে তা গলন্ত অবস্থায় জমা হয় ফারনেসের একেবারে নিচে। তারপর সেখান থেকে তা বের করে নেওয়া হয় স্টীল বানানো বা অন্য কোন কাজের জন্যে।

পাঁচ-ভাগ ওরের সঙ্গে দু-ভাগ কোক এবং এক ভাগ চুনাপাথর মিশিয়ে চুল্লির উপর দিক থেকে তা ভরে দিতে হয় ফারনেসের মধ্যে। গরম হাওয়ার ঝাপটা চলতে লাগল। ঘটল নানা রকম রাসায়নিক ক্রিয়া। শেষ পর্যন্ত গলন্ত লোহা এসে জমা পড়ল চুল্লির তলার দিকে। তার উপরে ভাসছে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো, যাকে বলা হয় স্ল্যাগ। প্রতি চার পাঁচ ঘণ্টা অন্তর চুল্লির নিচেকার ছিদ্র দিয়ে গলন্ত লোহা বের করে দেওয়া হয়। একটি বড় ধরনের ব্লাস্ট-ফারনেসে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় পনেরোশো টন লোহা তৈরি করা যায়। ব্লাস্ট-ফারনেসে তৈরি লোহাকেই বলা হয় কাস্ট-আয়রন।

ব্লাস্ট-ফারনেসের গলন্ত লোহা ধরা হয় বড় বড় সব পাত্রে। এক-একটা পাত্রে প্রায় ৪৫ টন লোহা ধরে। আবার আর-এক ধরনের পাত্র আছে যার এক-একটিতে গলন্ত লোহা ধরে ১৬০ থেকে ২০০ টনের মত। এখান থেকে এ পাত্রগুলো সরাসরি স্টীল বানানোর যন্ত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গলন্ত লোহা নিয়ে কারবার; বুঝতেই তো পারছ এ কাজে কত সাবধানতা, আর কত বিশেষ ব্যবস্থার দরকার।

কখনো কখনো বড় পাত্র থেকে গলন্ত লোহা ঢেলে দেওয়া হয় ছোট ছোট পাত্রে। এর এক-একটিতে পঞ্চাশ থেকে একশো পাউণ্ড

লোহা ধরে। এখানে এ লোহা ঠাণ্ডা হয়ে এক একটি লোহার চাঁইয়ে পরিণত হয়। লোহার এ চাঁইগুলোকে বলা হয় পিগ। এজন্যে কাস্ট-আয়রনের আর-এক নাম পিগ আয়রন। যে-সব স্টীল কোম্পানির নিজস্ব লোহা বানানোর ব্যবস্থা নেই বা থাকলেও যার পরিমাণ অল্প তারা এ-সব পিগ কিনে নেয়। তারপর তা দিয়ে স্টীল বানায়। ব্লাস্ট-ফারনেসে তৈরি কাস্ট-আয়রনের শতকরা ৯০ ভাগই স্টীল বানানোর কাজে লাগানো হয়।

আমরা আগেই বলেছি, কাস্ট আয়রন বানাতে দরকার হয় লোহার ওর ছাড়া আরও ছুটি জিনিস—কোক আর লাইমস্টোন। সাধারণ যে কয়লা খনিতে পাওয়া যায় তা থেকে কোক বানানোর জন্যেও নানা আয়োজনের দরকার। কয়লার মধ্যে কার্বন ছাড়াও অন্যান্য পদার্থ থাকে। এর কতগুলো সহজেই কয়লা থেকে বেরিয়ে যায় কয়লা পোড়ালে, অর্থাৎ এ-সব হল ভোলাটাইল। বিশেষ যন্ত্রে কয়লা নিয়ে তা বিশেষ ব্যবস্থায় গরম করলে তা কোকে পরিণত হয়। কোকের মধ্যে কার্বনের পরিমাণ থাকে শতকরা ৯০ ভাগের মত। এ উপায়টিকে বলা হয় কোকিং। আর যে বিরাট বিরাট সব চুল্লিতে এ কাজটি করা হয় তার নাম কোক-ওভেন। কয়লাকে কোকে পরিণত করতে সময় লাগে প্রায় ১৯ ঘণ্টা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, একটি লোহা বা ইস্পাতের কারখানা চালাতে গেলে তার সঙ্গে কোক-ওভেনেরও কত দরকার।

ব্লাস্ট-ফারনেসে যে চুনাপাথর দরকার তা সরাসরি খনি থেকেই মেলে।

স্টীল তৈরি

কাস্ট-আয়রন থেকে স্টীল বানানো হয় সাধারণত তিনটি উপায়ে—বিসিমারের উপায়, ওপেন-হার্থ উপায় এবং বৈদ্যুতিক উপায়। বর্তমানকালে অবশ্য বিসিমারের উপায়ের সাহায্যে তেমন পরিমাণে

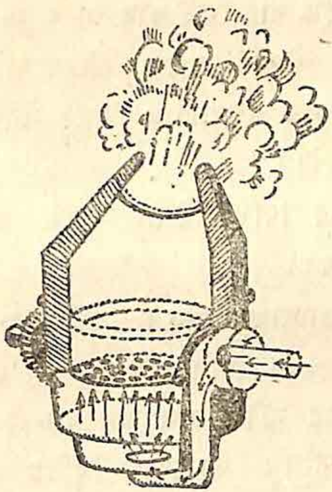
স্টীল বানানো হয় না। ওপেন-হার্থ উপায়েরই সাহায্য নেওয়া হয় বেশির ভাগ স্টীল বানানোর কাজে। বিশেষ-বিশেষ ধরনের যে স্টীলের কথা আগেই বলা হয়েছে সে-সব অবশ্য তৈরি হয় বৈদ্যুতিক উপায়ের সাহায্য নিয়েই।

আগেই বলেছি, আমাদের দেশের প্রাচীন কালের লোকের স্টীল এবং লোহা বানানোর উপায় জানা ছিল। বিশেষভাবে বিহার এবং পশ্চিম বাংলার একটা বিরাট এলাকার এক বিশেষ শ্রেণীর লোক লোহা নিষ্কাশনের উপায় জানত। পুরোনো কাগজপত্তর থেকে দেখা যায় যে, লোহার ওর থেকে যারা লোহা নিষ্কাশন করত তারা হল আগারিয়া শ্রেণীর লোক। আর সে লোহাকে যারা স্টীলে পরিণত করত তাদের বলা হত লোহারিয়া। বিহার এবং পশ্চিম বাংলা ছাড়া মাদ্রাজ এবং মহীশূরের কোন-কোন অঞ্চলেও লোহা এবং স্টীল বানানোর উপায় জানা ছিল। এখন থেকে একশো বছরের কিছু আগে ইংল্যাণ্ডের এক ভদ্রলোক মাদ্রাজের লোহার কারিগরদের নিকট থেকে স্টীল বানানোর উপায়টি শিখে নেন। তারপর দেশে গিয়ে নিজের নামে স্টীল তৈরির উপায় প্রচার করেন। ভদ্রলোকের নাম হেনরি বেসিমার, আর তিনি যে উপায়ে স্টীল বানাতে শুরু করেন তার নাম বেসিমার উপায়।

এরই কাছাকাছি সময়ে আমেরিকায় অন্য এক ভদ্রলোক (নাম উইলিয়াম কেলি) চেষ্টা করছিলেন স্টীল বানাতে। ভদ্রলোকের মাথার ভিতরে স্টীল বানাবার নানা ফন্দি খেলতে লাগল। ভদ্রলোকের শ্বশুর মশায় তো ওঁর মাথার ঠিক আছে কি না তাতেই সন্দেহ করে বসলেন। সত্যি সত্যি তিনি এক ডাক্তার ডেকে ওঁকে পরীক্ষা পর্যন্ত করিয়েছিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কেলি সাহেব স্টীল বানানোর উপায় আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছিলেন।

বেসিমার উপায়ে যে যন্ত্রটি স্টীল বানানোর কাজে লাগানো হয় তার নাম বেসিমার কনর্ভাটার। যন্ত্রটি দেখতে অনেকটা ডিমের মত।

যন্ত্রটি কাত করে তাতে গলন্ত লোহা ভরে দেওয়া হয়। তারপর বিশেষ ব্যবস্থায় গরম হাওয়া খুব জোরে পাম্প করে দেওয়া হয় গলন্ত লোহার ভিতর দিয়ে। কাস্ট আয়রনের ভিতরকার অপ্রয়োজনীয় পদার্থ পুড়ে



বেসিমার কনভার্টার

গিয়ে কনর্ভাটারে পড়ে থাকে গলন্ত স্টীল। এ স্টীলই নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। কনভার্টারে স্টীল বানাতে সময় লাগে দশ মিনিটের মত।

বেশির ভাগ স্টীল বানানোর কাজে সাহায্য নেওয়া হয় ওপেন হার্থ পদ্ধতির। এখানে যে চুল্লিটি ব্যবহার করা হয় তা চারকোণা। উপরে থাকে একটি নিচু ছাদ। ছাদে ধাক্কা খেয়ে আগুনের শিখা মেঝেতে রাখা গলন্ত লোহার উপর এসে পড়ে। নানা ধরনের পরিবর্তনের পর স্টীল পাওয়া যায়। এ-জাতীয় একটি চুল্লির ভিতরকার উত্তাপ হয় প্রায় তিন হাজার ডিগ্রি ফারেনহিট। স্টীল বানাতে সময় লাগে আট থেকে দশ ঘণ্টার মত।

বিশেষ ধরনের স্টীল বানানো হয় বৈদ্যুতিক চুল্লিতে। এ চুল্লি দেখতে একটা বিরাট আকারের কেটলির মত। একটা চুল্লির মধ্যে একসঙ্গে স্টীল বানানো যায় পাঁচ থেকে একশো টন পর্যন্ত। কেটলির

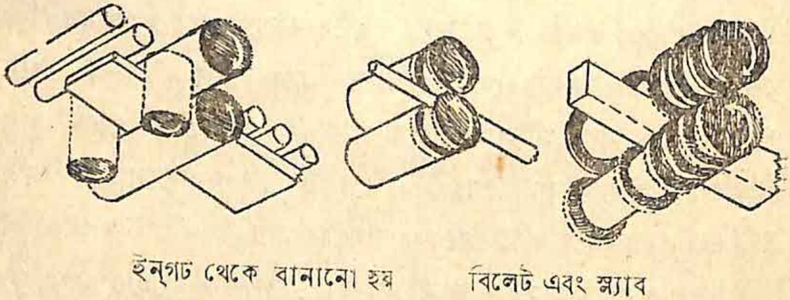
এক পাশে থাকে একটা দরজা। এখান দিয়েই লোহা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় চুল্লির মধ্যে। অন্য ধারে থাকে অনেকটা কেটলির নলের মত দেখতে একটা নল। এখান থেকেই গলন্ত স্টীল বের করে নেওয়া হয়। বিদ্যুৎ-সাহায্যেই ভীষণভাবে গরম করার কাজ হয়। চুল্লির ভিতরকার উত্তাপ থাকে বত্রিশশো ডিগ্রি ফারেনহিটের মত। চুল্লির আকার অনুযায়ী এ উপায়ে স্টীল বানাতে সময় লাগে চার থেকে বারো ঘণ্টা।

স্টীল বানানোর বিভিন্ন উপায় সম্বন্ধে বিজ্ঞান চেতনার অন্যত্র ভালভাবে বলা হবে।

গলন্ত স্টীল তো পাওয়া গেল। কিন্তু তারপর? শোন।

যে কোন চুল্লি—তা বেসিমারই হোক বা ওপেন হার্থই হোক—থেকে তরল আকারে স্টীল ঢালা হয় বড়-বড় পাত্রে। ক্রেন দিয়ে তা তোলা হয় উপরে। তা থেকে বিভিন্ন আকারের পাত্রে ঢালা হয় তরল স্টীল। এ-সব পাত্রকে বলা ইন্‌গট মোল্ড। এখানেই স্টীল ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হয়ে যায়। এ ধরনের শক্ত স্টীলের খণ্ডকে বলা হয় ইন্‌গট। যে কাজে স্টীল লাগানো হবে সে-অনুযায়ীই ইন্‌গটের চেহারা হয় আলাদা আলাদা।

ইন্‌গটকে নির্দিষ্ট চেহারার মত করবার জন্যে এরপর এগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হয় রোলিং কারখানায়। রোলিং কারখানায় চলে



ইন্‌গট থেকে বানানো হয় বিলেট এবং স্ল্যাব

নানারকমের কাজ। আমরা পাই নানা আকারের স্টীলের রড, প্লেট, বীম, রেল, পাইপ, তার, আরও কত কী!

অবশ্য ইন্‌গট থেকে সরাসরিই এ-সব জিনিস পাওয়া যায় না। ইন্‌গটকে প্রথমেই পরিবর্তিত করা হয় ব্লুম, বিলেট বা স্ল্যাবে। ব্লুম হল চারকোণাওয়ালা স্টীলের বার। ধারের দিকের ক্ষেত্রফল ছত্রিশ বর্গ-ইঞ্চির চেয়ে বেশি। বিলেটও চৌকো দেখতে, তবে ধারের ক্ষেত্রফল ব্লুমের চেয়ে কম। স্ল্যাবের চেহারা বিলেটের চেয়ে চওড়া।

বুঝতেই পারছ একটা রোলিং কারখানায় কত বিভিন্ন ধরনের লোহা বা স্টীলের জিনিস তৈরি হয়। দেখা গেল, লোহার ওর থেকে লোহা নিষ্কাশন করা হল ব্লাস্ট ফারনেসে। তারপর সে লোহা দিয়ে স্টীল বানানো হল বেসিমার কনভার্টার বা ওপেন হার্থ চুল্লিতে। তরল স্টীলকে শক্ত করে তা থেকে নানা ধরনের জিনিস বানানো হয় রোলিং কারখানায়। বর্তমান কালের লৌহশিল্পের এ তিনটিই প্রধান অংশ।

অ্যালুমিনিয়াম

মানব সভ্যতার ইতিহাস খুবই দীর্ঘদিনের পুরোনো। আর ঠিক সে রকমই পুরোনো সোনা, রুপো আর লোহার ইতিহাস। কিন্তু আধুনিক কালের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ধাতু হল অ্যালুমিনিয়াম। এ ধাতুটি খুবই হালকা। ফলে কতগুলো বিশেষ ধরনের কাজের পক্ষে এ ধাতুটির জুড়ি মেলা ভার। তাছাড়া দৃঢ়তাও অ্যালুমিনিয়ামের খুবই বেশি। তাপ এবং বিদ্যুতের পরিবাহক হিসেবেও এর খুব নাম। অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে আবার সরু তার এবং পাতলা পাতও বানানো যায়।

অ্যালুমিনিয়াম ধাতুটির এত সব গুণ থাকার জন্যে উড়োজাহাজ, মোটর গাড়ি প্রভৃতির অংশ তৈরির কাজে এর খুবই ব্যবহার। রুপোর মত চকচকে সাদা রঙটিও নানা দিক দিয়ে সুবিধের। বিদ্যুতের তার বানানোর কাজেও অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার রয়েছে। নানা

ধরনের বাসন কোসন তৈরি করতেও অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার হয়। সিগারেট, চকোলেট প্রভৃতি মুড়ে রাখার জন্যে যে খুব পাতলা এবং চকচকে কাগজ ব্যবহার হয় তাও যে অ্যালুমিনিয়ামের পাত ছাড়া আর কিছুই নয় এ খবর হয়ত তোমাদের অনেকের জানা আছে। অ্যালুমিনিয়ামের কয়েকটি সংকর ধাতুরও বেশ ব্যবহার আছে। যেমন ধর, অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে তামা, ম্যাগনেসিয়াম এবং ম্যাংগানীজ মিশিয়ে যে সংকর ধাতু বা অ্যালয় পাওয়া যায় তার নাম ডিউর‍্যালুমিন। গুণে এ জিনিসটি প্রায় স্টীলেরই সমান, অথচ স্টীলের চেয়ে হালকা। কাজেই উড়োজাহাজের বিভিন্ন অংশ তৈরির কাজে এর ব্যবহার প্রচুর। এ ধরনের কাজে অ্যালুমিনিয়ামের আর একটি সংকর ধাতুও ব্যবহার হয়। এটির নাম ম্যাগনালিয়াম। শতকরা আটানব্বই ভাগ অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে দু-ভাগ ম্যগনেসিয়াম মিশিয়েই এটি পাওয়া যায়। তামা আর অ্যালুমিনিয়াম মিশিয়ে পাওয়া যায় অ্যালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জ। এরও ব্যবহার আছে নানা কাজে।

পরিমাণের দিক দিয়ে বিচার করলে পৃথিবীর মাটিতে অ্যালুমিনিয়ামের স্থান তৃতীয়। মাটিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় অ্যালুমিনিয়াম থাকতে পারে না। অ্যালুমিনিয়াম আর অক্সিজেনের মিলনে তৈরি হয় অ্যালুমিনা। ভূত্বকের শতকরা পনের ভাগই হল অ্যালুমিনা। অ্যালুমিনিয়ামের দু-একটি যৌগিক পদার্থ আমাদের খুবই পরিচিত। চীনামাটি এবং অভ্রের কথাই আমি বলছি। চীনামাটির মধ্যে থাকে অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন।

নানা রকম দামি পাথর বসানো আংটি বা অন্যান্য অলঙ্কার তোমরা সকলেই দেখেছ। চুনি, পান্না, নীলা, পোখরাজ ইত্যাদি অ্যালুমিনা বা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ছাড়া অন্য কিছুই নয়। অ্যালুমিনার সঙ্গে অবশ্য সামান্য পরিমাণে অন্য ধাতুর অক্সাইড মেশানো থাকে বলে ওসব পাথরের হয় ভিন্ন-ভিন্ন সব রঙ।

অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করা হয় বক্সাইট নামে ওর থেকে। সবচেয়ে বেশি অ্যালুমিনিয়ামের ওর আছে ফরাসী, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউনাটেড স্টেট্‌স্ প্রভৃতি দেশে। আমাদের দেশের নানা জায়গায়ও অ্যালুমিনিয়াম ওর পাওয়া যায়। আমাদের দেশে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনের কারখানা আছে আসানসোল ও ত্রিবাঙ্কুরে।

অন্যান্য কয়েকটি ধাতু

নরম তিনটি ধাতুর মধ্যে আমরা নাম করতে পারি দস্তা, টিন আর সীসার। লোহার জিনিসে মরচে ধরে সে-কথা আমরা আগেই বলেছি। মরচে ধরা বন্ধ করার জন্যে লোহার জিনিসের উপর টিন বা দস্তার প্রলেপ দেওয়া হয়। দস্তার প্রলেপ লাগানো লোহার পাত দিয়েই তৈরি হয় ঘরের টিন, জলের বালতি প্রভৃতি। একে বলে গ্যালভানাইজ করা। নানা ধরনের টিনের কৌটো আমরা ব্যবহার করি। এ-সব আসলে লোহার পাতের উপর টিনের প্রলেপ লাগানো জিনিস। টুথপেস্টের নল বানানো হয় টিনের পাতলা পাত দিয়ে। জলের পাইপে ব্যবহারের জন্যেই বোধহয় সীসার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এ ছাড়াও নানা কাজে ব্যবহার আছে। সীসার সঙ্গে টিন মিশিয়ে যে সংকর ধাতু পাওয়া যায় তার নাম পয়টার। থালা গ্লাস বাসন বানানোর কাজে ব্যবহার হয় পয়টার। এক্স-রে, সাইক্লোট্রন প্রভৃতি যন্ত্রেও ব্যবহার হয় সীসার। বন্দুকের গুলি সীসারই তৈরি।

নিকেল ধাতুটির ব্যবহারও নানা কাজে। তামার সঙ্গে নিকেল মিশিয়ে যে সংকর ধাতু পাওয়া যায় তা দিয়ে টাকা পয়সা বানানোর প্রথা চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। স্থায়ী চুম্বক বানাতে ব্যবহার হয় অ্যালনিকো নামে একটি অ্যালয়ের। তামার সঙ্গে নিকেলের আর একটি মূল্যবান অ্যালয় হল মোনেল। বাসন-কোসন তৈরির কাজে এর ব্যবহার প্রচুর।

ধাতুর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে অদ্ভুত হল পারদ বা মার্কারি। ধাতুর

মধ্যে পারদই হল তরল ধাতু। প্রাচীন কালের মানুষেরও পারদের সঙ্গে পরিচয় ছিল। পারদের ব্যবহার নানা কাজে। থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার প্রভৃতি তৈরির কাজে লাগে পারদ। এ ছাড়া বহু আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতেও পারদের ব্যবহার আছে।

প্ল্যাটিনাম ধাতু কত মূল্যবান তা তোমাদের অজানা নয়। প্ল্যাটিনাম ধাতুর মত আরও কয়েকটি ধাতু আছে। এরা হল রুথেনিয়াম, রেডিয়াম, প্যালাডিয়াম, অস্‌মিয়াম ও ইরিডিয়াম। অস্‌মিয়ামের আপেক্ষিক গুরুত্ব সবরকম ধাতুর মধ্যে বেশি। এ ধাতুটিরও ব্যবহার আছে নানা কাজে।

ধাতুর মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ় ধাতু হল টাংস্টেন। ইলেক্‌ট্রিক বাতির ফিলামেণ্ট বানাতে এবং অন্যান্য কাজে টাংস্টেনের ব্যবহার আছে।

জির্‌কোনিয়াম, টিটানিয়াম এবং জার্মানিয়াম ধাতুর কয়েকটির ব্যবহার সম্প্রতিকালে খুব বেড়ে গিয়েছে। শল্য চিকিৎসায়, ফ্ল্যাশ-বাল্‌বে এবং আরও নানা কাজে ব্যবহার রয়েছে জির্‌কোনিয়ামের। কয়েক বছর আগেও জার্মানিয়াম ধাতুটির ব্যবহার ছিল না। রেডিওর ভ্যাকুয়াম টিউবে, টেলিভিশন যন্ত্রে এবং অন্যান্য কাজে আজকাল জার্মানিয়াম ব্যবহার হচ্ছে।

সোনা, রুপো, তামা প্রভৃতি ধাতুদের সম্বন্ধে কিছু জানার পর এবারে আমরা আলাদা ধরনের কয়েকটি ধাতু সম্বন্ধে আলোচনা করছি। প্রয়োজনের দিক দিয়ে বিচার করলে এ সব ধাতুরও প্রয়োজন সোনারুপোর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আমি সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি ধাতুদের কথাই বলছি। সোনা, রুপো, তামার মত ধাতু থেকে এ ধাতুগুলোকে আলাদাভাবে বিচার করার একটি প্রধান কারণ হল জলের সঙ্গে এ-সব ধাতুর রাসায়নিক ক্রিয়া। একটি পাত্রে জল নিয়ে তার মধ্যে সোনা, রুপো বা লোহার একটি টুকরো রাখলে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে না। কিন্তু ও-রকম অবস্থায় একটুকরো পটাসিয়াম

পাত্রের জলে রেখে দিলে সঙ্গে সঙ্গেই একটি রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটবে। ফলে পটাসিয়াম জ্বলতে থাকবে একটি বেগুনি রঙের আলো দিয়ে। সেইসঙ্গে আরো একটি মজার ব্যাপার দেখা যাবে। পটাসিয়ামের টুকরোটি জলের উপরে ভীষণভাবে ছুটোছুটি করতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত ছোটখাটো একটি বিস্ফোরণ ঘটবে।

এখানে আমরা যে-সব ধাতুর কথা বলব বিজ্ঞানের ভাষায় তাদের দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। এক, অ্যালকালি ধাতু, দুই, অ্যালকালাইন আর্থ ধাতু। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পড়ে লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, রুবিডিয়াম ও সিজিয়াম। এদের প্রতিটি ধাতুই জলের সঙ্গে সরাসরি রাসায়নিক ক্রিয়া করে থাকে। তৈরি হয় তীব্র ক্ষার বা অ্যালকালি। অ্যালকালি কাকে বলে সে-কথা আমরা আগেই বলেছি। তীব্র ক্ষার উৎপন্ন করে বলেই এ ধাতুদের নাম হয়েছে অ্যালকালি মেটাল বা ক্ষার তৈরি-কারক ধাতু। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়ে বেরিলিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, স্ট্রনসিয়াম, বেরিয়াম এবং রেডিয়াম। আগুনে যে-সব পদার্থের তেমন পরিবর্তন হয় না প্রাচীনকালের রাসায়নিকরা তাদেরই নাম দিতেন মাটি বা আর্থ। চুনা পাথর বা লাইমের মধ্যে আছে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়ার মধ্যে রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম, স্ট্রনসিয়ার মধ্যে রয়েছে স্ট্রনসিয়াম ধাতুটি। লাইম, ম্যাগনেসিয়া, স্ট্রনসিয়া প্রভৃতিকে বলা হত মাটি বা আর্থ। তাছাড়া এগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্ষারের ধর্ম। এ সব কারণের জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর এ ছটি ধাতুর নাম রাখা হয়েছে অ্যালকালাইন-আর্থ ধাতু। বাংলায় আমরা মৃৎ-ক্ষার ধাতুও বলতে পারি।

অ্যালকালি ধাতু

অ্যালকালি ধাতুগুলি জলের সঙ্গে তীব্র ক্ষার বা অ্যালকালি তৈরি করে, এ-কথা আগেই বলেছি। কিন্তু এদের এ-হেন অদ্ভুত গুণটির কারণ কী!

আমাদের জানা আছে যে, কোন মৌলিক পদার্থ তৈরি হয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে। পদার্থ পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে প্রোটন আর নিউট্রন, আর বিভিন্ন বৃত্তাকার পথে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইলেকট্রন। সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি অ্যালকালি ধাতুদের পরমাণু কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াসের চারিদিকের সবচেয়ে বাইরের পথটিতে আছে একটি মাত্র ইলেকট্রন। এই ধরনের ইলেকট্রনের ধর্মই হচ্ছে যে, সে সব সময়েই পরমাণুর বাইরে চলে যেতে চায়। তাই যদি যায়, তবে পরমাণুটির মধ্যে একটি ইলেকট্রনের ঘাটতি পড়ল। অর্থাৎ পরমাণুটি হল পজিটিভ বিদ্যুৎ-ভাবাপন্ন। এ অবস্থায় সে চাইবে অন্য কোন পরমাণুর সঙ্গে দ্রুত রাসায়নিক মিলন ঘটাতে। আমরা বলতে পারি যে, অ্যালকালি ধাতুদের রাসায়নিক মিলন-ক্ষমতা খুবই বেশি।

পরমাণুর গঠনের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, অ্যালকালাইন আর্থ ধাতুদের পরমাণুর কেন্দ্রীনের সবচেয়ে বাইরের পথটিতে রয়েছে দুটি মাত্র ইলেকট্রন। মৌলিক পদার্থের গঠনবিধি সম্বন্ধে আমরা আগেই বলেছি।

অ্যালকালি ধাতুদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় লিথিয়ামের। যত রকম ধাতু আছে লিথিয়ামই হল তার মধ্যে সবচেয়ে হালকা। গ্রীক শব্দ লিথোস-এর মানে হল পাথর। লিথিয়াম সর্বপ্রথম পাওয়া গিয়েছিল একরকম পাথরের মধ্যে। তাই লিথোস বা পাথর থেকেই লিথিয়ামের নাম। ধাতুটি আবিষ্কার করেছিলেন সুইডেনের এক রাসায়নিক, নাম আর্ফভেডসন।

লিথিয়াম ধাতুটি দেখতে সাদা। যে সব পাথরে লিথিয়াম পাওয়া যায় তার পরিমাণ ভূত্বকে বেশি নেই। ক্যালিফোর্নিয়া, কানেক্টিকাট ও দক্ষিণ ডাকোটা অঞ্চলে প্রচুর লিথিয়ামের ওর পাওয়া যায়। খুব সামান্য পরিমাণে লিথিয়াম রয়েছে কাঠ-পোড়ানো ছাই, সামুদ্রিক ঘাস, দুধ, রক্ত প্রভৃতিতে।

অ্যালয় বা সংকর ধাতুর কথা আগেই কিছু বলা হয়েছে। কোন-কোন অ্যালয়তে লিথিয়াম ধাতুটিরও ব্যবহার আছে। তামা বা তামার অ্যালয় থেকে অক্সিজেন তাড়িয়ে দেওয়ার কাজে লিথিয়াম ব্যবহার করা হয়। লিথিয়ামের নানা যৌগিক পদার্থের ব্যবহার রয়েছে নানা কাজে। তাপ-নিয়ন্ত্রণ বা এয়ার-কণ্ডিশন করবার কাজে লিথিয়াম ক্লোরাইড ও ব্রোমাইডের ব্যবহার আছে। বিশেষ ধরনের লেন্স্ তৈরির কাজে লাগে লিথিয়াম ফ্লোরাইড।

আইসোটোপ কাকে বলে

সম্প্রতিকালে হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি বানানোর কাজে দরকার পড়ে লিথিয়ামের। লিথিয়াম না বলে লিথিয়ামের একটি আইসোটোপ, যার নাম লিথিয়াম-৬, বললেই ভাল হয়। লিথিয়ামের এই আইসোটোপটি প্রকৃতিতেই পাওয়া যায়।

আইসোটোপ জিনিসটি কী? পিরিয়ডিক টেবল সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অ্যাটমিক ওয়েট এবং অ্যাটমিক নাম্বার কথাদুটির সঙ্গে আমরা পরিচয় লাভ করেছি। পরমাণুর কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াসের বাইরে বিভিন্ন পথে যত ইলেকট্রন ঘুরে বেড়ায় সে সংখ্যাটিই হল পদার্থটির অ্যাটমিক নাম্বার। এ সংখ্যাটি আবার নিউক্লিয়াসের ভিতরকার প্রোটনের সংখ্যারই সমান। অ্যাটমিক নাম্বারই কোন মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম বলে দেয়। অ্যাটমিক ওয়েট দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, পদার্থটি হাইড্রোজেনের চেয়ে কী পরিমাণ ভারি বা হালকা।

একই মৌলিক পদার্থের পরমাণু একই ওজনের এবং একই গুণ-সম্পন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। ড্যালটনও সে কথাই বলেছেন। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু সে-রকমটি হয় না। রাসায়নিক গুণে একই অথচ অ্যাটমিক ওয়েটে আলাদা একই মৌলিক পদার্থের এ-রকম

পরমাণুর সঙ্গে সাক্ষাৎ আমাদের হরদমই মেলে। এদেরই নাম দেওয়া হয়েছে আইসোটোপ।

ক্লোরিন গ্যাসটির কথাই ধরা যাক না। ক্লোরিনের আটমিক নাম্বার ১৭ এবং অ্যাটমিক ওয়েট ৩৫·৫। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, ক্লোরিনের রয়েছে দুটি আইসোটোপ। একটির নাম ক্লোরিন ৩৫। এর পরমাণুর কেন্দ্রীনে রয়েছে ১৭টি প্রোটন আর ১৮টি নিউট্রন। দ্বিতীয়টির নাম ক্লোরিন ৩৭। এর পরমাণু-কেন্দ্রীনে আছে ১৭টি প্রোটন আর ২০টি নিউট্রন। উভয় ক্ষেত্রেই অ্যাটমিক নাম্বার একই, অর্থাৎ ১৭। সাধারণ অবস্থায় আমরা যে ক্লোরিন পাই তার মধ্যে দু-রকম আইসোটোপ এমনভাবে থাকে যাতে করে গড়ে অ্যাটমিক ওয়েট দাঁড়ায় ৩৫·৪৫৭। কাজের সুবিধের জন্যে আমরা বলি, ক্লোরিনের অ্যাটমিক ওয়েট ৩৫·৫। প্রায় সব মৌলিক পদার্থেরই দুই বা দুইয়ের বেশি আইসোটোপ বর্তমান।

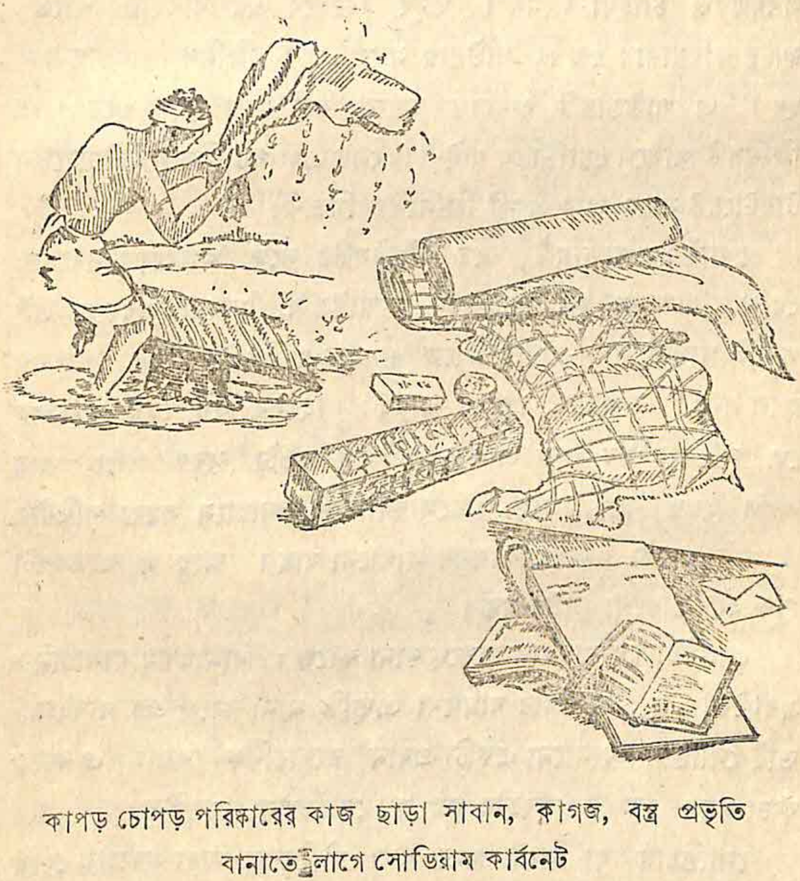
সোডিয়াম ও পটাসিয়াম

অ্যালকালি ধাতুদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল সোডিয়াম আর পটাসিয়াম। ইংরেজ বিজ্ঞানী হামফ্রে ডেভী এ দুটি ধাতু আবিষ্কার করেছেন। সে ১৮০৭ সালের কথা।

বিশুদ্ধ সোডিয়াম ধাতুটি দেখতে সাদা, তাছাড়া এটি খুব নরমও বটে। জলের চেয়ে হালকা বলে জলের উপর ভেসে থাকে ধাতুটি। অবশ্য সোডিয়াম ও পটাসিয়াম—দুটি ধাতুই জলের সঙ্গে যে তীব্রভাবে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটায় সে-কথা তো আগেই বলেছি। সোডিয়ামকে খুব বেশিরকম গরম করলে তা থেকে একরকম নীল ও বেগুনি মেশানো রঙের গ্যাস বেরোয়। এ গ্যাসের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালালে উজ্জ্বল হলদে রঙ পাওয়া যায়। কুয়াশার ভিতর দিয়ে এ রঙটি দেখা যায় বলে আলোর সিগন্যাল হিসেবে সোডিয়ামের ব্যবহার আছে। বায়ু এবং জলের সঙ্গে সহজেই তীব্র

রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটায় বলে সোডিয়াম রাখতে হয় কেরোসিন-ভরা বোতলে।

পরিমাণের দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায়. সোডিয়াম ধাতুটি পৃথিবীর মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করে। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি অঞ্চলে প্রচুর সোডিয়াম রয়েছে সোডিয়াম নাইট্রেট হিসেবে।



কাপড় চোপড় পরিষ্কারের কাজ ছাড়া সাবান, কাগজ, বস্ত্র প্রভৃতি বানাতে লাগে সোডিয়াম কার্বনেট

তাই সোডিয়াম নাইট্রেটের এক নাম চিলি সল্ট-পিটার। জমির সার হিসেবে এর ব্যবহার আছে প্রচুর। সোডিয়ামের আর-একটি যৌগিক পদার্থের নাম সোডিয়াম কার্বনেট। সোডিয়াম কার্বনেটের সঙ্গে

মানুষের পরিচয় দীর্ঘদিনের। রোমদেশের অধিবাসীরা এর নাম দিয়েছিল ন্যাট্রিয়াম।

সোডিয়াম কার্বনেটের ব্যবহার নানা কাজে। কাপড়-চোপড় পরিষ্কারের কাজ ছাড়া কাচ, সাবান, কাগজ, বস্ত্র প্রভৃতি শিল্পে নানা-ভাবে ব্যবহার হয় সোডিয়াম কার্বনেটের। সোডিয়াম বাই-কার্বনেট লবণটিরও চাহিদা অনেক। ওষুধ হিসেবে এর ব্যবহার আছে। রুটির কারখানায় বেকিং পাউডার নামে একটি জিনিস ব্যবহার করা হয়। এ পাউডারটি ব্যবহার করলে রুটি বেশ ফুলে ওঠে। এ জিনিসটি আসলে সোডিয়াম বাই-কার্বনেট এবং পটাসিয়াম হাইড্রোজেন টারটারেট নামে আর-একটি জিনিসের মিশ্রণ।

সোডিয়াম ধাতু-ঘটিত যে জিনিসটির সঙ্গে আমাদের সবচেয়ে বেশি পরিচয় সে হল সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সাধারণ লবণ। এই লবণই আমরা রান্না-বান্নার কাজে ব্যবহার করি। মাটিতে, সমুদ্রের জলে সর্বত্রই এ লবণের রয়েছে প্রাচুর্য। হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে, পৃথিবীর সব সমুদ্র এবং হ্রদের জলে যতটা লবণ আছে তার সবটা বের করে নিতে পারলে তা দিয়ে অনায়াসে সমস্ত পৃথিবীর উপরেই একটা লবণের আস্তরণ লাগানো যায়। আর এ আস্তরণটা পুরু হবে চারশো ফুটের মত।

সোডিয়ামের ব্যবহার রয়েছে নানা কাজে। নানারকম রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি, কৃত্রিম রবার বানানো প্রভৃতি নানা কাজে এর ব্যবহার। তাই সোডিয়াম বানানো একটি প্রধান রাসায়নিক শিল্প। এ কাজে কাঁচা মাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড।

সোডিয়াম বা সোডিয়ামের নানা যৌগিকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় জিনিসটি হল সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড বা কস্টিক সোডা। কস্টিক সোডার আর-এক নাম সোডা লাইম। কত কাজেই যে এর ব্যবহার তা বলে শেষ করা যায় না। কৃত্রিম রেশম, সাবান, রঙ, কাগজ এবং অন্যান্য বহু রাসায়নিক শিল্পে কস্টিক সোডার ব্যবহার

রয়েছে প্রচুর। সোডিয়ামের আর একটি যৌগিক, নাম সোডিয়াম সালফেটও কাগজ এবং কাচশিল্পে ব্যবহার হয়।

সোডিয়ামের চেয়েও কার্যকরী ধাতু হল পটাসিয়াম। পটাসিয়াম বায়ুতে খোলা রাখলে তাতে আপনা-আপনিই আগুন ধরে যায়। যত ধাতু আছে, হালকার দিক দিয়ে পটাসিয়ামের স্থান দ্বিতীয়। পটাসিয়াম ধাতুটিও বেশ নরম, রঙ সাদাটে। পৃথিবীতে সোডিয়ামের মত পটাসিয়ামের পরিমাণও যথেষ্ট। প্রাণীদেহের রক্ত এবং কোষে পটাসিয়াম দেখা যায়। সমুদ্রের জলে এবং মৃত সাগরে প্রচুর পটাসিয়াম আছে পটাসিয়াম ক্লোরাইড হিসেবে। পটাসিয়ামের একটি লবণ হল পটাসিয়াম কার্বনেট। গাছপালার প্রধান একটি খাদ্য এটি। পটাসিয়ামের আর-একটি লবণ হল পটাসিয়াম নাইট্রেট। এর আরও কয়েকটি নাম আছে—যেমন, নাইটার, সল্টপিটার, সোরা। আমাদের দেশেও সোরা পাওয়া যায় নানাস্থানে। জমির সার হিসেবে এবং আতস বাজি তৈরি করতে নাইটারের ব্যবহার আছে।

কস্টিক পটাস বা পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড যৌগিকটিও একটি প্রয়োজনীয় জিনিস। সাবান বানাতে প্রচুর কস্টিক পটাস ব্যবহৃত হয়।

অ্যালকালি ধাতুদের মধ্যে রুবিডিয়াম এবং সিজিয়াম আবিষ্কার খুব বেশি দিনের কথা নয়। শ-খানেক বছর আগেকারই কথা। 'সিজিয়াস' মানে নীলাভ ধূসর রঙ, আর 'রুবিডাস' মানে লাল। ল্যাটিন কথা সিজিয়াস আর রুবিডাস থেকেই ধাতু দু-টির নামকরণ করা হয়েছে। এ দুটি ধাতুর পরিমাণ পৃথিবীতে খুবই কম। কফি, চা এবং তামাক গাছে সামান্য পরিমাণ রুবিডিয়াম রয়েছে।

সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায় বলে সিজিয়াম এবং রুবিডিয়াম এদের কারোরই তেমন ব্যবহার নেই। ফোটো-ইলেকট্রিক সেলে এদের কিছু ব্যবহার আছে।

অ্যালকালাইন আর্থ ধাতু

অ্যালকালাইন আর্থ ধাতুদের মধ্যে বেরিলিয়াম ধাতুটি অনেকটা অ্যালুমিনিয়ামেরই মত। দেখতে ধাতুটি সাদাটে ধূসর রঙের। তাছাড়া এ-দলের অন্যান্য ধাতুদের মত বেরিলিয়াম বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি রাসায়নিক ক্রিয়া করে না। ব্র্যাজিল, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকার নানা জায়গায় বেরিলিয়াম ধাতুর ওর পাওয়া যায়। অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে বেরিলিয়াম মিশিয়ে যে-সব অ্যালয় বানানো যায় তার ব্যবহার আছে নানা কাজে। এক্স-রে যন্ত্রেও বেরিলিয়ামের ব্যবহার আছে।

প্রাচীন গ্রীস দেশের একটি জায়গার নাম ম্যাগনেসিয়া। এখানে এক রকমের মাটি পাওয়া যেত। জায়গার নাম অনুসারে এ মাটিরও নাম দেওয়া হল ম্যাগনেসিয়া। এই ম্যাগনেসিয়া থেকেই ম্যাগনেসিয়াম ধাতুটি বানানো হয়। বলা বাহুল্য, ম্যাগনেসিয়াম নামও এসেছে ম্যাগনেসিয়া কথা থেকেই। অ্যালকালাইন আর্থ ধাতুদের মধ্যে একমাত্র ম্যাগনেসিয়ামেরই ব্যবহার আছে ইঞ্জিনীয়ারিং কাজ-কর্মে।

গাছপালার সবুজ অংশের নাম ক্লোরোফিল। ক্লোরোফিলের মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম ধাতুটির খোঁজ মেলে। পৃথিবীর মাটিতেও ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। প্রধানত দু-রকম ওর থেকেই ম্যাগনেসিয়াম মেলে। এরা হল ম্যাগনেসাইট এবং ডোলোমাইট। সোপস্টোন, টাল্‌ক্‌, অ্যাসবেসটস—এ সবের মধ্যে রয়েছে ম্যাগনেসাইট। তাছাড়া সমুদ্রের জলে রয়েছে প্রচুর ম্যাগনেসিয়াম। সত্যি কথা বলতে কী, আজকের দিনে যে পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম নানাভাবে তৈরি করা হয় তার অধিকাংশই তৈরি করা হয় সমুদ্রের জল থেকে। সমুদ্রের জলের মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম থাকে নানা লবণ হিসেবে।

নানা কাজে ব্যবহার আছে ম্যাগনেসিয়ামের। ফোটোগ্রাফি,

ফ্ল্যাশ লাইট প্রভৃতিতে ম্যাগনেসিয়াম ব্যবহার করা হয়। ধাতুটি খুবই হালকা। দেখতে বেশ সাদা চকচকে। আগুন লাগলে উজ্জ্বল আলো দিয়ে জ্বলতে থাকে ম্যাগনেসিয়াম। শুধু ম্যাগনেসিয়াম ছাড়া ম্যাগনেসিয়ামের বিভিন্ন অ্যালয় বা সংকর ধাতুর ব্যবহারই অবশ্য বেশি। ডিউরালুমিন এ-রকমেরই একটি অ্যালয়। এর শতকরা ৯৫·৫ ভাগ অ্যালুমিনিয়াম, ৩ ভাগ তামা, ১ ভাগ ম্যাংগানিজ, আর বাকি ০·৫ ভাগ ম্যাগনেসিয়াম। স্টীলের মতই শক্ত এ অ্যালয়টি, অথচ খুবই হালকা। ফলে উড়োজাহাজের নানা অংশ তৈরির কাজে এর ব্যবহার প্রচুর। ম্যাগনেসিয়ামের নানারকম ব্যবহার ছাড়াও এর যৌগিক পদার্থ অর্থাৎ ম্যাগনেসিয়াম কম্পাউণ্ডেরও নানা ব্যবহার আছে।

টুথ পাউডার ব্যবহার তোমাদের অনেকেই কর। কিন্তু এটা হয়ত তোমাদের অনেকেরই জানা নেই যে, টুথ পাউডারের মধ্যে থাকে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, যা কিনা ম্যাগনেসিয়ামের সঙ্গে অক্সিজেনের মিলনেই তৈরি। মিল্ক অব্ ম্যাগনেসিয়া, ম্যাগ সাল্ফ্ প্রভৃতি ওষুধগুলোর নামও তোমাদের হয়ত অজানা নয়। এগুলো আসলে যে ম্যাগনেসিয়ামেরই কম্পাউণ্ড তা আশা করি আর বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

পৃথিবীর মাটিতে অ্যালকালাইন আর্থ শ্রেণীর ধাতুর মধ্যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণই সবচেয়ে বেশি। পরিমাণের দিক দিয়ে বিচার করলে প্রকৃতিতে ক্যালসিয়ামের স্থান পঞ্চম। চুন কথাটির ল্যাটিন নাম হল 'ক্যালক্স'। চুন আসলে ক্যালসিয়াম ও অক্সিজেনের মিলনে তৈরি একটি কম্পাউণ্ড। রসায়নের ভাষায় বলা যায়, ক্যালসিয়াম অক্সাইড। ক্যালক্স বা চুন থেকে পাওয়া যায় বলে ধাতুটির নাম দেওয়া হয়েছে ক্যালসিয়াম। পাকা বাড়ি বানানোর কাজে চুনের ব্যবহার সেই অতি প্রাচীন কালের লোকেরাও জানত।

ক্যালসিয়াম দেখতে সামান্য হলদেটে। দাঁত এবং হাড়ের একটি প্রধান উপাদানই হল ক্যালসিয়াম। চক, চুনাপাথর, মার্বেলপাথর, মুক্তো, ডিমের খোলস, শামুকের খোলস—এ সবই তৈরি হয়েছে প্রধানত ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে। এই যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট, এ আবার তৈরি হয়েছে তিনটি এলিমেণ্ট, অর্থাৎ ক্যালসিয়াম, কার্বন এবং অক্সিজেন দিয়ে। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, প্রকৃতিতে ক্যালসিয়াম রয়েছে প্রচুর চুনাপাথর, মার্বেল পাথর, খোলস প্রভৃতির আকারে। ক্যালসিয়ামের আর একটি কম্পাউণ্ড, নাম ক্যালসিয়াম ফসফেট হল জমির খুব ভাল সার। নানা ধরনের ওর থেকে ধাতু নিষ্কাশনের কাজে ক্যালসিয়ামের ব্যবহার আছে প্রচুর। ব্লাস্ট ফারনেসে লোহা বানাতে যে প্রচুর চুনাপাথরের দরকার সে-কথা আমরা আগেই বলেছি। কার্বনের সঙ্গে চুনাপাথরের রাসায়নিক ক্রিয়ায় তৈরি হয় ক্যালসিয়াম কারবাইড নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ। ক্যালসিয়াম কারবাইডের সঙ্গে জল মেশালে পাওয়া যায় অ্যাসিটিলিন নামে একটি গ্যাস। এ গ্যাসটি আগুনে জ্বলে। কলকাতার ফুটপাথের দোকানে যে কারবাইড বাতি ব্যবহার করতে দেখা যায় তা যে কী দিয়ে তৈরি তা আশা করি তোমরা এবারে বুঝে নিয়েছ। এ ছাড়া চুনাপাথর থেকে বানানো চুনেরও ব্যবহার রয়েছে নানা কাজে।

আমাদের শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব দেখা দিলে নানারকম দাঁত ও হাড়ের রোগ দেখা যায়। এ-সব ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুরা যে ক্যালসিয়াম-গঠিত ওষুধ দিয়ে কৃত্রিমভাবে ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণ করার ব্যবস্থা করেন তা হয়ত অনেকেরই জানা।

ক্যালসিয়ামের একই শ্রেণীভুক্ত আর একটি ধাতু হল বেরিয়াম। এ নামটি এসেছে গ্রীক শব্দ বেরিস থেকে। বেরিস কথাটির মানে হল ভারি। রুপোর মত দেখতে সাদা এ ধাতুটি। এ ধাতুটির একটি প্রধান গুণ হল যে, এর সঙ্গে অক্সিজেনের মিলন ঘটে অতি

সহজেই। তাছাড়া বেরিয়ামকে গরম করলে তা থেকে ইলেকট্রনরা বেরিয়ে আসতে দেরী হয় না। এ গুণের জন্যে বেরিয়াম এবং নিকেলের অ্যালয় দিয়ে ইলেকট্রন টিউবের ফিলামেণ্ট বানানো হয়ে থাকে। এ-জাতীয় টিউবের ব্যবহার আছে অনেক রকম কাজে। বেরিয়ামের নানা ধরনের কম্পাউণ্ডও নানা কাজে লাগে। বেরিয়াম কার্বনেট একটি বিষাক্ত পদার্থ। ইঁদুরের ওষুধ বানাতে এর ব্যবহার আছে। পেটের নাড়িভুঁড়ির এক্স-রে ছবি তুলতে হলে রোগীকে চিনি, কোকো, আটা প্রভৃতির সঙ্গে মিশিয়ে বেরিয়াম সালফেট খেতে দেওয়ায় রীতি আছে। এ জিনিসটি জলে গুলে যায় না বলে শরীরের কোন ক্ষতি করতে পারে না। অথচ এক্স-রে ছবি তোলার অনেক সুবিধে হয়। রঙ করার কাজে বেরিয়াম সালফেট এবং বেরিয়াম সালফাইডের ব্যবহার আছে। আতসবাজি বানানোর কাজেও বেরিয়ামের ব্যবহার হয়ে থাকে।

ক্যানাডা, জার্মানি এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকেই বেরিয়ামের চাহিদা মেটানো হয়।

স্কটল্যাণ্ডে স্ট্রনসিয়ান নামে একটি শহর আছে। এ শহরটির নাম থেকে যে ধাতুটির নামকরণ হয়েছে তার নাম স্ট্রনসিয়াম। এ ধাতুটিও ক্যালসিয়াম-ম্যাগনেসিয়াম দলভুক্ত। আতসবাজি বানাতে স্ট্রনসিয়াম ব্যবহার হয়। এতে আতসবাজির রঙ হয় লাল। স্ট্রনসিয়ামের কয়েকটি কম্পাউণ্ড—যেমন, স্ট্রনসিয়াম ল্যাকটেট, স্ট্রনসিয়াম ব্রোমাইড প্রভৃতি ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে।

রেডিয়াম ও মাদাম কুরি

অ্যালকালাইন আর্থ শ্রেণীর ধাতুর মধ্যে সবচেয়ে নাম-করা হল রেডিয়াম। রেডিয়াম আবিষ্কার যে বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক চমকপ্রদ অধ্যায় তা তোমাদের অজানা থাকবার কথা নয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানী মাদাম কুরী আর তাঁর স্বামী পিয়ের কুরি আবিষ্কার

করেছিলেন রেডিয়াম। রেডিয়াম আবিষ্কারের গল্প শোনার আগে কয়েকটা দরকারি তথ্য জেনে নেওয়া ভাল।

এমন কতগুলো এলিমেণ্টর খবর আমরা জানি যা থেকে আপনা-আপনি তিন রকমের রশ্মি বেরিয়ে যায়। এ তিন রকমের রশ্মির নাম, আল্‌ফা-রে, বিটা-রে ও গামা-রে। আল্‌ফা-রে পজিটিভ বিদ্যুৎ কণিকা-পূর্ণ, বিটা-রে নেগেটিভ বিদ্যুতে ভরা (অর্থাৎ ইলেকট্রনে ভরা) আর গামা-রে হল আলো বা এক্স-রের মত ইথারের ঢেউ। বিজ্ঞানীরা বলেন, এ সব এলিমেণ্ট আল্‌ফা-রে, বিটা-রে এবং গামা-রে ছেড়ে দিয়ে দিয়ে হাজার হাজার বছর পরে সাধারণ সীসায় পরিণত হয়। এ ব্যাপারটাকে বলা হয় রেডিও অ্যাক্‌টিভিটি। যে সব এলিমেণ্ট থেকে আল্‌ফা, বিটা এবং গামা-রে বেরিয়ে যায় তাদের বলা হয় রেডিও-অ্যাকটিভ এলিমেণ্ট। বাংলা করে আমরা তেজস্ক্রিয় কথাটি ব্যবহার করতে পারি। তেজস্ক্রিয় ধাতু বা রেডিও-অ্যাকটিভ মেটালের মধ্যে পড়ে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, রেডিয়াম, পোলোনিয়াম প্রভৃতি। রেডিও-অ্যাকটিভিটির ব্যাপারটা আবিষ্কার করেছিলেন হেনরি বেকেরেল অনেকটা আকস্মিকভাবেই।

বেকেরেলের আগে রন্‌ট্‌জেন তাঁর রঞ্জন-রশ্মি বা এক্স-রে আবিষ্কার করেছেন। বেকেরেল ইউরেনিয়াম ধাতুর একটি লবণ নিয়ে তা খুব জোরালো আলোতে রেখে দিলেন খানিকক্ষণ। তার পর অন্ধকারে নিয়ে গেলে তা থেকে যে আলো বেরোতে থাকে অর্থাৎ যাকে আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় বলি লুমিনেসেন্স (Luminescence) এ-সব নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। এ করতে গিয়েই দৈবাৎ আবিষ্কৃত হল রেডিও-অ্যাকটিভিটি।

এর কিছুদিন পরের ঘটনা। মাদাম কুরি লক্ষ্য করলেন, পিচব্লেণ্ড নামে একটি ওরের রেডিও-অ্যাকটিভ ক্ষমতা বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামের চেয়ে বেশি। তিনি মনে করলেন, এই ওরটির ভিতরে এমন কোন এলিমেণ্ট রয়েছে যার রেডিও-অ্যাকটিভ ক্ষমতা

ইউরেনিয়ামের চেয়ে বেশি। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে কাজ শুরু হল। আবিষ্কৃত হল একটি নতুন এলিমেণ্ট। এর রেডিও-অ্যাকটিভ ক্ষমতা ইউরেনিয়ামের চেয়ে চারশো গুণ বেশি। মাদাম কুরির মাতৃভূমি পোল্যাণ্ডের নাম অনুসারে নতুন এলিমেণ্টটির নাম দেওয়া হল পোলোনিয়াম।

দিন যায়। কুরি দম্পতি দেখলেন পিচব্লেণ্ডের মধ্যে আরও একটি এলিমেণ্ট আছে, যার রেডিও-অ্যাকটিভ ক্ষমতা পোলোনিয়ামের চেয়েও বেশি। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। অসীম পরিশ্রমের পর পাওয়া গেল আর একটি নতুন এলিমেণ্ট। এর রেডিও-অ্যাকটিভ ক্ষমতা ইউরেনিয়ামের চেয়ে ন-শো গুণ বেশি। এ নতুন ধাতুটির নাম দেওয়া হল রেডিয়াম। ল্যাটিন শব্দ 'রেডিয়াস' মানে 'রে' বা রশ্মি। নতুন ধাতুটির নাম এসেছে রেডিয়াস থেকেই।

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে কুরি দম্পতি নোবেল পুরস্কার পান। পিয়ের কুরির অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়ার পর মাদাম কুরি দীর্ঘদিন গবেষণা-কার্য করেছেন। তাঁর মূল্যবান গবেষণার জন্যে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে দ্বিতীয় বার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মাদাম কুরির মেয়ে আইরিন কুরিও পরবর্তীকালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

এই হল রেডিয়াম আবিষ্কারের গল্প। দেখা গেছে, যে ওরের ভিতরে ইউরেনিয়াম থাকে তার সঙ্গেই থাকে রেডিয়াম। তবে পরিমাণে থাকে খুবই কম। হিসেবে দেখা গেছে, সাত টন ইউরোনিয়ামের সঙ্গে এক গ্রামের মত রেডিয়াম থাকে মেশানো। কাজেই রেডিয়াম তৈরি করা যে কী কষ্টসাধ্য ব্যাপার তা সহজেই তোমরা বুঝতে পারবে। রেডিয়ামের দামও যে অসম্ভব রকমের বেশি তার কারণও এখানে।

ক্যানাডা, বেলজিয়াম কঙ্গো, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রচুর ইউরেনিয়াম ওর পাওয়া

যায়। ক্যানসার রোগের চিকিৎসার কাজে রেডিয়ামের খুবই ব্যবহার আছে। তোমরা ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালের কথা শুনে থাকবে। এ রকম ডায়ালের গুণ হল যে, অন্ধকারের ভিতরেও ঘড়ি দেখতে অসুবিধে হয় না। জিঙ্ক সালফাইডের সঙ্গে সামান্য একটুখানি রেডিয়াম মিশিয়ে তা দিয়ে ঘড়ির কাঁটা এবং ডায়াল রঙ করা হয়। ফলে এ-জাতীয় ঘড়ি অন্ধকারের মধ্যে দেখতে কোন অসুবিধে হয় না। কারণ রেডিয়াম থেকে তো রেডিও অ্যাকটিভিটির কাজ সব সময়েই চলতে থাকে। অবশ্য এভাবে ডায়াল বা ঘড়ির কাঁটায় রঙ করতে প্রচুর খরচ পড়া স্বাভাবিক। সেজন্যে আজকাল এ কাজে স্বতঃ আলো দেয় (অর্থাৎ লুমিনাস) এরকম একটা রঙই ব্যবহার করা হয়।

অক্সিজেন থেকে কার্বন

আমরা এতক্ষণ বিভিন্ন রকমের ধাতু নিয়ে আলোচনা করেছি। এবারে নানারকম অধাতু নিয়ে তাদের গুণধর্ম এবং এ সব কিভাবে কোথায় পাওয়া যায়, কোন্ কাজেই বা এসব আমাদের লাগে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। অবশ্য ধাতুর তুলনায় অধাতুর সংখ্যা কম, কিন্তু প্রয়োজনের দিক দিয়ে বিচার করলে এদের কথা আমরা কোনক্রমেই বাদ দিতে পারি না। কার্বন একটি অধাতু। কিন্তু এক কার্বন এবং তার নানা যৌগিক নিয়ে রসায়ন শাস্ত্রের একটি আলাদা বিভাগই গড়ে উঠেছে। এ বিভাগটির নাম জৈব রসায়ন বা অরগ্যানিক কেমিস্ট্রি। তাই কার্বনের কথা আমরা আলাদাভাবে বলব। এখানে অধাতুদের মধ্যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, ক্লোরিন, গন্ধক, সিলিকন এবং ফসফরাস সম্বন্ধে বলা হচ্ছে।

অক্সিজেন

পৃথিবীতে যত মৌলিক পদার্থ বা এলিমেণ্ট আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আছে অক্সিজেন গ্যাসটি। এ গ্যাসটির না আছে কোন রঙ, না গন্ধ বা আস্বাদ। পৃথিবীর চারদিককার বায়ুমণ্ডলের শতকরা ২১ ভাগই অক্সিজেন। যত জল আছে পৃথিবীর সমুদ্র, নদনদী এবং হ্রদে তার নয় ভাগের আট ভাগই হল গিয়ে অক্সিজেন। ভূত্বকের ভিতরে যত মাটি এবং পাথর আছে তার আধাআধিই অক্সিজেন। আবার প্রাণীজগতের শতকরা কুড়ি ভাগ,

আর উদ্ভিদ জগতের শতকরা চল্লিশ ভাগই হল গিয়ে অক্সিজেন দিয়ে তৈরি।

উনুনে কয়লা পুড়ছে, মোমবাতি জ্বলছে, কেরোসিন স্টোভে আগুন জ্বলছে—এ সবই হল এক ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়া। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় দহন ক্রিয়া বা কম্‌বাস্‌শন। অক্সিজেন ছাড়া দহন ক্রিয়া অচল। যে-কোন দহন-ক্রিয়ায়ই অন্য কোন মৌলিকের সঙ্গে অক্সিজেনের দ্রুত রাসয়ানিক মিলন ঘটে। শ্বাসক্রিয়াও একটি দহন, অক্সিজেন ছাড়া যে কাজটিও সম্ভব নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, অক্সিজেন ছাড়া আমাদের এক মুহূর্তও চলে না।

যে-কোন দহন ক্রিয়ার সময় তাপ বেরোয়, কোন-কোন সময় তাপের সঙ্গে আলোও। হাইড্রোজেন গ্যাসটির সঙ্গে যখন অক্সিজেনের মিলন ঘটে তখন তৈরি হয় প্রচুর উত্তাপ। এ উত্তাপ আমরা নানা কাজে ব্যবহার করে থাকি। লোহা বা ইস্পাত গলানোর জন্যে প্রচুর তাপের প্রয়োজন হয়। এ তাপও পাওয়া যায় এমনি ধরনের দহন-ক্রিয়া থেকে।

আগেই বলেছি, জল এবং বায়ুর মধ্যে রয়েছে প্রচুর অক্সিজেন। নানা কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন তৈরি করা হয় সাধারণত জল অথবা বায়ু থেকে। জল যে তাপমাত্রায় ফোটে তা হল ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, আর যে তাপমাত্রায় জমে বরফ হয় তা হল ০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বরফের চেয়ে ১২৮ ডিগ্রি উত্তাপ কমিয়ে দিলে যে তাপমাত্রা পাওয়া যাবে সে তাপমাত্রায় অক্সিজেন গ্যাসটিকে তরল আকারে নিয়ে যাওয়া যায়। আরও তাপ কমিয়ে বরফের চেয়ে ২১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কঠিন আকারের অক্সিজেন মিলবে।

নাইট্রোজেন

যে বায়ুর স্তর পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে তাকে আমরা বলি বায়ুমণ্ডল বা অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ার। বায়ুর মধ্যে রয়েছে প্রধানত দুটি গ্যাস, একটি অক্সিজেন, অন্যটি নাইট্রোজেন। আগেই বলেছি, বায়ুর শতকরা ২১ ভাগ আয়তনই অক্সিজেন। বাকিটা অর্থাৎ প্রায় ৭৮ ভাগই নাইট্রোজেন। এ ছাড়া অবশ্য আরগন, কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস এবং জলীয় বাষ্পও একটু-আধটু রয়েছে বায়ুর মধ্যে। সে যাই হোক, বায়ুর প্রধান অংশই দেখা যাচ্ছে নাইট্রোজেন।

অক্সিজেনের মতই নাইট্রোজেন গ্যাসটিও স্বাদহীন, বর্ণহীন এবং গন্ধহীন। তাছাড়া এ গ্যাসটি আবার সহজে অন্য কোন মৌলিক পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিক মিলন ঘটায় না। তবে, বায়ুমণ্ডলের ভিতর যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন বায়ুর ভিতরকার নাইট্রোজেন আর অক্সিজেনের মধ্যে মিলন ঘটে। তৈরি হয় নাইট্রোজেন আর অক্সিজেনের কম্পাউণ্ড যাকে আমরা বলি অক্সাইড। এই অক্সাইড বৃষ্টির জলের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড আকারে নেমে আসে মাটিতে। সেখানে নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি করে নাইট্রেট। নাইট্রেট গাছপালার একটি প্রধান খাদ্য। গাছপালা নাইট্রেট টেনে নিয়ে নিজেদের ভিতরেই তাকে বদলে দেয় প্রোটিনে। প্রোটিন-জাতীয় খাবার মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুর অবশ্য-প্রয়োজনীয় বস্তু। কাজেই মানুষ বা অন্য প্রাণীরা প্রোটিন সংগ্রহ করে গাছপালা থেকে।

মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর খাবার জোগান দিয়ে দিয়ে বায়ুর ভিতরকার নাইট্রোজেনের ঘাটতি পড়া সম্ভব কি না? এ প্রশ্ন তোমরা করতে পার। আসলে কিন্তু বায়ুর ভিতরে নাইট্রোজেনের ঘাটতি কোনকালেই পড়ে না। কারণ হল এই যে, প্রাণী এবং গাছপালার মৃত্যু হলে তাদের দেহাবশেষ থেকেই আবার নাইট্রোজেন বেরিয়ে গিয়ে বায়ুমণ্ডলে মেশে। ফলে বায়ুর ভিতরে নাইট্রোজেনের পরিমাণ চিরদিন একই রয়ে গেছে।

শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্যে অক্সিজেনের প্রয়োজন। তাছাড়া সবরকম দহন ক্রিয়ার জন্যেও দরকার অক্সিজেনের। এ-সব কথা আমরা আগেই বলেছি। তবে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন আছে বলে দহন ক্রিয়ার তীব্রতা অনেক কমে গেছে। তা না হলে যে তীব্র দহন ঘটত তার পরিণাম হত ভয়াবহ।

নাইট্রোজেনের ব্যবহার আছে নানা কাজে। অ্যামোনিয়া, নাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতি জিনিসগুলো নানা শিল্পে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এ সবই হল নাইট্রোজেন-গঠিত জিনিস। নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেনের মিলনে তৈরি হয় অ্যামোনিয়া। নাইট্রিক অ্যাসিডের মধ্যে রয়েছে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। নানা রকম রঙ, ওষুধপত্তর এবং বিস্ফোরক দ্রব্য বানাতে প্রয়োজন নাইট্রিক অ্যাসিডের।

হাইড্রোজেন

যতগুলো মৌলিক পদার্থের সন্ধান এ যাবৎ পাওয়া গেছে তার মধ্যে সবচেয়ে হালকা পদার্থ হল হাইড্রোজেন। এ গ্যাসটিও স্বাদহীন, বর্ণহীন এবং গন্ধহীন। বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন একরকম নেই বললেই চলে। তবে জল, মাটি এবং জীবজগতে হাইড্রোজেন রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। পৃথিবীর সমুদ্র, নদনদী এবং সব হ্রদে যে পরিমাণ জল আছে তার ওজনের দিক দিয়ে বিচার করলে শতকরা ১১·১ ভাগই হল গিয়ে হাইড্রোজেন। সূর্য এবং অন্যান্য তারা নক্ষত্রে হাইড্রোজেনের পরিমাণ পৃথিবীর চেয়ে বেশি। সূর্য সব সময়েই আলো ও উত্তাপরূপে প্রচুর শক্তি ক্ষয় করে। কিন্তু সে এত শক্তি পায় কোত্থেকে? বিজ্ঞানীদের অনুমান, সূর্যের মধ্যে যে হাইড্রোজেন রয়েছে তার পরমাণুদের মধ্যে চলে একটা গঠন ক্রিয়া। এর ফলে তৈরি হয় হিলিয়াম নামে একটু ভারি জাতের একটি মৌলিক

পদার্থের। উপরি পাওয়া যায় শক্তিই। এই শক্তি আমরা পাই আলো ও উত্তাপরূপে।

হাইড্রোজেন গ্যাসটির ব্যবহারও রয়েছে নানা কাজে। সবচেয়ে হালকা পদার্থ বলে বেলুন-ভর্তির কাজে এ গ্যাসটিই ব্যবহার করা হয়। তবে এ কাজে হাইড্রোজেন ব্যবহারে একটু অসুবিধে আছে। হাইড্রোজেন গ্যাসটি নিজে জ্বলে বলে নানাভাবে বিপদ ঘটা অসম্ভব নয়। তাই আজকাল হিলিয়াম গ্যাসটি বেলুন ভরার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাদাম তেল, নারকেল তেল প্রভৃতির মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস চালিয়ে দিলে তেলের সঙ্গে হাইড্রোজেনের একটি রাসায়নিক যোগাযোগ ঘটে। অবশ্য এ কাজটি ভালভাবে ঘটানোর জন্যে নিকেল ধাতু বা অন্য কোন জিনিস ক্যাটালিস্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। রাসায়নবিভায় এমন অনেক পদার্থের সন্ধান মেলে যাদের উপস্থিতিতে অন্য কোন রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে। কিন্তু এ-জিনিসগুলো ক্রিয়াশেষে আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনিই থেকে যায়। এদেরই বলা হয় ক্যাটালিস্ট বা অণুঘটক। সে যাই হোক, তেলের সঙ্গে হাইড্রোজেনের রাসায়নিক সংযোগে যা তৈরি হয় তা আমাদের বিশেষ পরিচিত ভেজিটেবল ঘি বা বনস্পতি।

আইসোটোপের কথা আগেই বলেছি। হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক নাম্বার এক এবং পারমাণবিক ওজন বা অ্যাটমিক ওয়েটও এক। কিন্তু পারমাণবিক ওজন দুই এবং তিন—এরকম হাইড্রোজেনও রয়েছে বর্তমান। যে হাইড্রোজেন পরমাণুর পারমাণবিক ওজন দুই তার নাম ডিউটেরিয়াম, আর যার পারমাণবিক ওয়েট তিন তার নাম ট্রাইটিয়াম। পরমাণুর ভিতরে যে অসীম শক্তি রয়েছে লুকিয়ে সে সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার ব্যাপারে হাইড্রোজেনের আইসোটোপ দুটির ব্যবহার রয়েছে। এ আইসোটোপদের অনেক সময় হেভি বা ভারি হাইড্রোজেন নামেও অভিহিত করা হয়।

ক্লোরিন

এতক্ষণ আমরা স্বাদ গন্ধ এবং রঙহীন কয়েকটি গ্যাসের আলোচনা করেছি। এবারে একটি রঙিন গ্যাসের কথা বলি। গ্যাসটি হল ক্লোরিন। রঙ হলদে মেশানো সবুজ, আর গন্ধও বেশ ঝাঁঝালো। তছাড়া গ্যাসটি আবার বিষাক্ত। শ্বাসের সঙ্গে টেনে নিলে গ্যাসটি প্রাণে মারতেও ছাড়ে না। সত্যি কথা বলতে কি, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মারণাস্ত্র হিসেবে ক্লোরিন গ্যাসটির ব্যবহার হয়েছে প্রচুর।

প্রাণে মারতে পারে বলে যে গ্যাসটির অন্য কোন সৎগুণ নেই তা কিন্তু নয়। কোন স্বাভাবিক রঙ নষ্ট করে তাকে সাদা করে দেওয়ার নাম ব্লীচিং। ব্লীচিং করবার কাজে এ গ্যাসটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া রোগ-জীবাণু নষ্ট করার কাজেও ক্লোরিন একটি অতি চমৎকার জিনিস। এ কাজে যে জিনিসটি আমরা হরদম ব্যবহার করি তা হল ব্লীচিং পাউডার। চুনের গুঁড়োর মধ্যে ক্লোরিন গ্যাসটি চালিয়ে দিয়েই তৈরি করা হয় ব্লীচিং পাউডার। পানীয় জলের সঙ্গে খুব সামান্য পরিমাণে ক্লোরিন মিশিয়ে দিলে সে জল রোগজীবাণু-মুক্ত হয়ে যায়। তোমাদের মধ্যে যারা কলকাতার লোক তাদের জানা আছে যে, কলেরা প্রভৃতি রোগ লাগলে কর্পোরেশনের জলে কেমন ক্লোরিনের গন্ধ পাওয়া যায়। সাঁতার কাটার পুকুরের জলেও সামান্য ব্লীচিং পাউডার মিশিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ আছে।

ক্লোরিন গ্যাস থেকেই পাওয়া যায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। এ অ্যাসিডটির ব্যবহার রয়েছে নানা কাজে। হাইড্রোক্লোরিক আর নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণকে বলা হয় অ্যাকোয়া রেজিয়া বা রাজকীয় জল। ধাতুদের মধ্যে রাজা সোনা এবং প্ল্যাটিনাম— কোন অ্যাসিডই এদের গলাতে পারে না। কিন্তু অ্যাকোয়া রেজিয়ার মধ্যে সোনা বা প্ল্যাটিনাম দিলে তা দ্রবীভূত হয়ে যায়। সোনা এবং প্ল্যাটিনামকে ডিজল্ভ্ করতে পারে বলেই এ মিশ্রণটির নাম

রাজকীয় জল বা অ্যাকোয়া রেজিয়া। নানারকম ওষুধ হিসেবেও ক্লোরিন এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ব্যবহার আছে। কার্বনের সঙ্গে ক্লোরিন গ্যাসটির রাসায়নিক মিলনে তৈরি হয় কার্বন টেট্রা-ক্লোরাইড। আগুন নেভানোর কাজে কার্বন টেট্রা-ক্লোরাইডের ব্যবহার হয়ে থাকে। অবশ্য এ কাজে কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড (যাকে বলা হয় ড্রাই আইস বা শুকনো বরফ) এবং অন্যান্য বহু জিনিসের ব্যবহারও রয়েছে। সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সাধারণ নুনের সঙ্গে তোমাদের সকলেরই পরিচয় আছে। এটি যে ক্লোরিনেরই একটি যৌগিক পদার্থ তা-ও তোমাদের অজানা নয়। আগেই বলেছি, সোডিয়াম এবং ক্লোরিনের মিলনেই তৈরি হয় আমাদের নিত্যব্যবহার্য খাবার লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড।

যে ক্লোরিনের এত ব্যবহার তা কিন্তু বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রকৃতিতে পাওয়াই যায় না। সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সঙ্গে মিলিত অবস্থায়ই ক্লোরিন রয়েছে সমুদ্রের জলে এবং নানা পাহাড়ে। ক্লোরিন এবং ক্লোরিনের অন্যান্য যৌগিক পদার্থ বা কম্পাউণ্ড তৈরি করা হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড থেকেই। বহু জায়গায় পুরোনোকালের সমুদ্র বা হ্রদ শুকিয়ে গিয়ে পড়ে রয়েছে প্রচুর সোডিয়াম ক্লোরাইড অনেকটা বিশুদ্ধ অবস্থায়ই।

ক্লোরিনের সমগোত্রীয় আরও তিনটি মৌলিক পদার্থ আছে। এরা হল ফ্লোরিন, ব্রোমিন এবং আয়োডিন। হাইড্রোজেন আর ক্লোরিনের রাসায়নিক সংযোগে তৈরি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডটির খুবই ব্যবহার রয়েছে। কাচের জিনিস পত্তরের উপর নানারকম নক্সা খোদাই করার কাজেই এর সবচেয়ে বেশি ব্যবহার। ব্রোমিন ব্যবহার করা হয় টিয়ার গ্যাস এবং নানা রঙ তৈরির কাজে। তাছাড়া ফোটোগ্রাফিতে এবং নানা ওষুধ তৈরির কাজেও ব্রোমিনের ব্যবহার রয়েছে। টিনচার আয়োডিনের নাম তোমাদের জানা। কোন জায়গা কেটে গেলে সেখানে টিনচার আয়োডিন লাগানো

তো একটা অতি প্রয়োজনীয় কাজ। কিন্তু টিনচার আয়োডিন কী দিয়ে তৈরি তা হয়ত তোমাদের জানা নেই। পটাসিয়াম আয়োডাইড, আয়োডিন এবং রেকটিফাইড স্পিরিট—এই তিনটি জিনিস মিশিয়েই তৈরি করা হয় টিনচার আয়োডিন। এ ছাড়া আরও নানা ওষুধ হিসেবে এবং ফোটোগ্রাফি প্রভৃতির কাজে আয়োডিনের ব্যবহার রয়েছে।

গন্ধক আর ফস্‌ফরাস

গন্ধক আর ফস্‌ফরাস এ দুটি মৌলিকও অধাতু, তবে কঠিন আকারের; গন্ধক প্রকৃতিতে কখনো বিশুদ্ধ অবস্থায়, আবার কখনো অন্য মৌলিক পদার্থের সঙ্গে মিলিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

এমনও অনেক সময় দেখা যায় যে, একই মৌলিক পদার্থ বিভিন্ন আকারে রয়েছে বর্তমান। এই বিভিন্ন আকারের মধ্যে ভৌতিক ধর্মের বেশ অমিল থাকে। কোন কোন সময় রাসায়নিক ধর্মেরও পার্থক্য দেখা যায়। অথচ প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই একই মৌলিক থাকে। একই পদার্থের এমনিভাবে বিভিন্ন আকারে থাকার নাম দেওয়া হয়েছে অ্যালোট্রপি। অক্সিজেন কার্বন, গন্ধক, ফসফরাস প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের বহু অ্যালোট্রপি দেখা যায়।

গন্ধকের অ্যালোট্রপি আছে অনেকগুলো। ৯৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার নিচে গন্ধক যে আকারে থাকে তার নাম রম্‌বিক গন্ধক। এর বেশি উষ্ণতায় গন্ধক যে অবস্থায় থাকে তার নাম মোনোক্লিনিক গন্ধক। এ ছাড়া আছে লাম্‌ডা গন্ধক, মিউ গন্ধক প্রভৃতি।

গন্ধক এবং গন্ধকের বহু যৌগিক মিশ্রণ নানা কাজে লাগে। গন্ধক পোড়ালে বায়ুর অক্সিজেনের মিলন ঘটে। আমরা পাই সালফার ডাই-অক্সাইড নামে গন্ধকের একটি অক্সাইড। জীবাণু নষ্ট করবার কাজে এ গ্যাসটির ব্যবহার আছে। শুকনো ফল সংরক্ষণে এবং কাগজের কারখানায় সালফার ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করা হয়।

সালফার ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে আরও অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলনে তৈরি হয় সালফার ট্রাই-অক্সাইড। এও একটি গ্যাস, এর সঙ্গে জলের মিলন ঘটলে আমরা পাই সালফিউরিক অ্যাসিড নামে একটি অ্যাসিড। এ অ্যাসিডটির যে কত কাজে ব্যবহার আছে তা বলে শেষ করা যায় না। নানা রঙ, বিস্ফোরক দ্রব্য, ফিটকিরি এবং আরও বহু জিনিস তৈরির কাজে সালফিউরিক অ্যাসিড দরকার। পেট্রোলিয়াম-শিল্প, বস্ত্র-শিল্প, বিদ্যুৎ-শিল্প, সার-শিল্প প্রভৃতিতেও এর প্রয়োজন রয়েছে।

ফস্‌ফরাস মৌলিকটিরও অ্যালোট্রপি আছে। এরা হল সাদা ফস্‌ফরাস আর লাল ফসফরাস। সাদা ফস্‌ফরাসে সাধারণ উষ্ণতায়ই আপনা আপনি আগুন ধরে ওঠে। তাছাড়া ফস্‌ফরাস বাষ্প বিষাক্তও বটে। এ জন্যে সাদা ফস্‌ফরাস সব সময় জলের নিচে রাখার বিধি আছে। অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতায় ঠাণ্ডা এবং স্নিগ্ধ আলো দিয়ে ফস্‌ফরাস জ্বলে থাকে।

দেশলাই বানাতে ব্যবহার ফস্‌ফরাসের। তাছাড়া জমির সার হিসেবে ফস্‌ফেট-সার একান্তই প্রয়োজনীয় একটি জিনিস। দাঁত এবং হাড়ের মধ্যে ফস্‌ফরাস রয়েছে বেশ কিছু। আমাদের শরীরের মাংসপেশী, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুর মধ্যেও ফস্‌ফরাস আছে। অবশ্য এ সব ফস্‌ফরাস রয়েছে যৌগিক অবস্থায়।

সিলিকন এবং কার্বন

অতি প্রয়োজনীয় দুটি মৌলিক পদার্থ হল কার্বন আর সিলিকন। অক্সিজেনের পর সিলিকনই আছে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি। পাথর, বালি, কাদা—সর্বত্রই আছে সিলিকন। বিশুদ্ধ সিলিকন দেখতে ধূসর রঙের। তৈরি করা খুবই কঠিন। সিলিকন প্রকৃতিতে থাকে সিলিকন ডাই-অক্সাইড হিসেবে। সিলিকন ডাই-অক্সাইডের সহজ নাম সিলিকা। কোয়ার্টজ, বালি, অ্যাগেট পাথর, ফ্লিন্ট, গ্র্যাভেল—সবই হল সিলিকা বা সিলিকন ডাই-অক্সাইড।

কোয়ার্টজ পাথরের একটা অদ্ভুত গুণ আছে। কোয়ার্টজ প্রথমে গলিয়ে নিয়ে তারপর তা যদি খুব ঠাণ্ডা করে নেওয়া যায় তবে কাচের মত একটি জিনিস মেলে। কাচের মতই নানা আকার এবং আকৃতি দিয়ে এই জিনিসটি থেকে বহু গ্লাস, বাটি, বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জাম বানানো যায়। কাচের সাজ-সরঞ্জাম এবং বাসন-পত্তর থেকে এ-সব জিনিস নানাদিক দিয়েই ভাল, টেকেও বেশিদিন।

সিলিকন এবং সিলিকার কথা বলতে গিয়ে কাচের কথাও আপনা-আপনিই এসে পড়ে। কাচ তৈরির প্রধান কাঁচা মালই হল সিলিকা। এ ছাড়া আরও যে দুটি কাঁচা মাল এ কাজে ব্যবহার করা হয় তা হল সোডা-অ্যাশ ও লাইম বা চুনাপাথর। হিসেবমত এ তিনটি কাঁচা মাল মিশিয়ে যা পাওয়া গেল তার নাম হল ব্যাচ। এবারে বিশেষ ধরনের চুল্লিতে ব্যাচ নিয়ে তা প্রায় ১,৪০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় গরম করতে হয়। পাওয়া যায় গলন্ত অবস্থায় কাচ। এ দিয়েই বাসনপত্তর প্রভৃতি বানানো হয়। রঙিন কাচ বানাতে হলে ব্যাচের সঙ্গে অন্য কোন ধাতুর অক্সাইড মেশাতে হয়।

এনামেলের বাসন-পত্তরের সঙ্গেও তোমাদের পরিচয় আছে। এনামেল জিনিসটি আসলে কাচই। ব্যাচের সঙ্গে টিন ডাই-অক্সাইড, অ্যান্টিমনি অক্সাইড প্রভৃতি মিশিয়ে দিলেই পাওয়া যায় এনামেল।

প্রকৃতিতে সিলিকনের যেমন প্রাচুর্য রয়েছে কার্বনেরও রয়েছে তেমনি। তাছাড়া আবার কার্বনের উপরি একটু আলাদা মাহাত্ম্য আছে। প্রাণ বা জীব-জগতের সঙ্গে কার্বনের রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কার্বনের কম্পাউণ্ডের সংখ্যাও প্রচুর। প্রায় পাঁচ লক্ষের মত কার্বন-কম্পাউণ্ডের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ সব কারণের জন্যে রসায়ন বিজ্ঞানে কার্বন এবং তার যৌগিকদের নিয়ে একটি আলাদা বিভাগই সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম জৈব রসায়ন বা অরগ্যানিক কেমিস্ট্রি।

কার্বনেরও কয়েকটি অ্যালোট্রপি রয়েছে। গ্রাফাইট এবং হিরে কার্বনেরই ভিন্ন আকারের জিনিস অর্থাৎ অ্যালোট্রপি। গ্রাফাইটেরও

ব্যবহার প্রচুর। নানা বৈজ্ঞানিক কাজে গ্রাফাইট দরকার হয়। নামে লেড-পেনসিল হলেও লেড-পেনসিলে যে লেড নেই, এ যে আসলে গ্রাফাইট পেন্সিল, তা হয়ত তোমাদের অনেকের জানা। হিরের কথা আর কী বলব! পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান পদার্থ বোধহয় হিরে।

হিরের পরিমাণ সমস্ত পৃথিবীতে খুবই কম। তার উপর এক-টুকরো হিরে জোগাড় করা তোমার আমার কর্ম নয়। কালো হিরের সঙ্গে কিন্তু আমাদের সব সময়েই দেখা সাক্ষাৎ মেলে। তাছাড়া এর গুরুত্বও আসল হিরের চেয়ে কম নয় কোন অংশে। সভ্যতার প্রথম যুগ থেকেই হয়ত মানুষ কালো হিরের সাহায্য নিয়েছে নানাভাবে। এবং আজও তার অন্যথা ঘটে নি। আমি কয়লার কথাই এখানে বলছি। কয়লাই হল মানব-সভ্যতার কালো হিরে।

কয়লার মধ্যে কার্বন আছে শতকরা ৬৭ ভাগ থেকে ৯০ ভাগ পর্যন্ত। কার্বনের পরিমাণ যত বেশি হবে সে কয়লাও হবে তত উঁচু জাতের। কয়লা না হলে বর্তমান সভ্যতার অগ্রগতি যে অনেকাংশে ব্যাহত হত তা বলাই বাহুল্য। বর্তমান কালে আবার কয়লা থেকে পাওয়া আলকাতরাও যে কত কাজে লাগছে তা বলে শেষ করা যায় না। একরকম কয়লার নাম বিটুমিনাস কয়লা। এ-জাতীয় কয়লা থেকে যে আলকাতরা পাওয়া যায় তা থেকে নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পর পাওয়া যায় নানা রকমের রঙ, এসেন্স প্রভৃতি জিনিস।

পণ্ডিতেরা বলেন যে, প্রাচীন কালে পৃথিবীতে ছিল বিরাট বিরাট সব গাছপালা। এখন থেকে প্রায় ২৫ কোটি বছর আগে সে সব গাছপালা মাটির নিচে চাপা পড়ে। তারপর এই দীর্ঘদিনে সে সব গাছপালার মধ্যে ঘটেছে নানা পরিবর্তন। কালক্রমে সে-সবই পরিবর্তিত হয়েছে কয়লায়।

কার্বনের আও দুটি অ্যালোট্রপি আছে। নাম কার্বন ব্ল্যাক আর ভুষো কালি। কার্বন ব্ল্যাকের ব্যবহার রয়েছে রবার তৈরিতে। ছাপাখানার কালি হিসেবে ব্যবহার হয় ভুষো কালির।

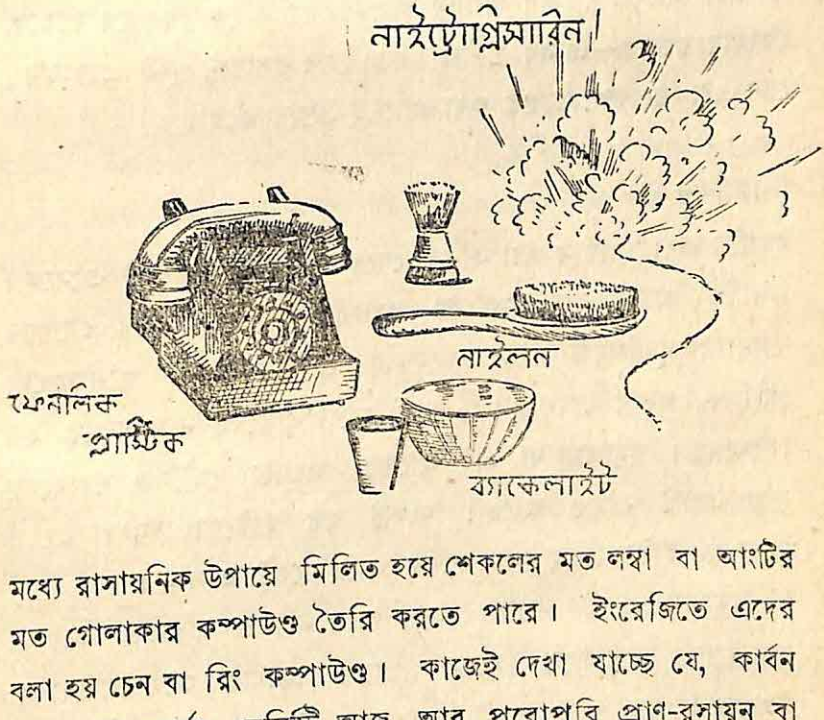
কার্বন ও তার যৌগিক পদার্থ

রসায়নবিদ্যায় কার্বনের আলাদা মর্যাদা আছে সে-কথা আগেই বলেছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রাণী এবং গাছপালা থেকে কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করা হল। এ-সব কম্পাউণ্ডের নাম দেওয়া হল জৈব পদার্থ। এদের কম্পাউণ্ড সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার জন্যে যে বিভাগটি গড়ে উঠল তার নামই দেওয়া হল জৈব রসায়ন। পরীক্ষায় এও দেখা গেল যে, এ সব কম্পাউণ্ডের প্রতিটির মধ্যে কার্বন রয়েছে বর্তমান। কাজেই ধারণা করা হল যে, প্রাণ বা জীবনের সঙ্গে কার্বনের আছে অতি নিকট সম্পর্ক। তাই জৈব রসায়ন বা অরগ্যানিক কেমিস্ট্রির আর এক নাম হল, কার্বন-কম্পাউণ্ডের রসায়নবিদ্যা।

জৈব কম্পাউণ্ড এবং অজৈব কম্পাউণ্ডের মধ্যে বেশ কিছুটা পার্থক্য দেখা যায় নানা দিক দিয়ে। অজৈব পদার্থ যে-সব রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়া করে তাদের সঙ্গে জৈব পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া হয় না, হলেও হয় সামান্য। অজৈব পদার্থ তৈরি করতে উত্তাপ একটি বিশেষ কাজ করে, কিন্তু উত্তাপ দিলে অধিকাংশ জৈব-পদার্থ একেবারে ভেঙে যায়। তার উপর অজৈব পদার্থ তৈরি করা যায় রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে, কিন্তু জৈব পদার্থ তেমনভাবে তৈরি করা যায় না। এ দেখে প্রশ্ন করা স্বাভাবিক, প্রাণী বা গাছপালার দেহে এ-সব জৈব পদার্থ তৈরি হল কিভাবে। নিশ্চয়ই কোন প্রাণশক্তির সাহায্যে আর এ প্রাণশক্তি কোন বিজ্ঞানীর পরাক্ষাগারে তৈরিকরা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। ফলে পরীক্ষাগারে জৈব রাসায়নিক পদার্থ বানানো অসম্ভব। ঊনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে নামকরা রাসায়নিক বার্জিলিয়াস পর্যন্ত এ-হেন মত পোষণ করতেন।

জার্মানির এক নামকরা রাসায়নিক ছিলেন ওয়েলার। তিনি ১৮২৮ সালে পরীক্ষাগারে তৈরি করে বসলেন ইউরিয়া।

ইউরিয়া একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ। প্রাণীর মূত্রে এর সন্ধান মেলে। ওয়েলারের এ পরীক্ষাকার্য রসায়নবিদ্যায় যুগান্তর আনল। একে-একে তৈরি হল আরও অনেক জৈব পদার্থ। ফলে প্রাণশক্তির ধারণাটা পুরোপুরি বদলে গেল। আজ আমরা জানি, রসায়ন শাস্ত্রের যে সব নিয়মকানুন অজৈব রসায়নে চলে, জৈব রসায়নও তা থেকে আলাদা নয়। জৈব রসায়নও এ-সব নিয়ম মেনে চলতে কসুর করে না। তবে, কার্বন পরমাণুর একটা বিশেষ গুণ হল যে, এরা নিজেদের



মধ্যে রাসায়নিক উপায়ে মিলিত হয়ে শেকলের মত লম্বা বা আংটির মত গোলাকার কম্পাউণ্ড তৈরি করতে পারে। ইংরেজিতে এদের বলা হয় চেন বা রিং কম্পাউণ্ড। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কার্বন রসায়ন বা কার্বন কেমিস্ট্রি আজ আর পুরোপুরি প্রাণ-রসায়ন বা জৈব রসায়ন নেই, যদিও জৈব রসায়ন নামটিই চালু রয়ে গেছে।

আগেই বলেছি, জৈব রসায়ন আজ কার্বন এবং কার্বনের যত কম্পাউণ্ড আছে তাদেরই রসায়ন। এ-সব যৌগিক পদার্থ প্রাণী বা গাছপালা থেকে পাওয়া যেতে পারে, আবার পরীক্ষাগারেও তৈরি করা যেতে পারে। আমাদের খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, এ-সবের

রাসায়নিক দিকটা জৈব রসায়নেরই আওতায় পড়ে। কৃত্রিম রেশম, নাইলন, ডেক্রন, টেরিলিন, প্লাস্টিক—এ-সবই আধুনিক জৈব রসায়নের দান। চিনি, প্রোটিন, কাগজ, কাঠ, পেট্রোলিয়াম—এসব জৈব পদার্থ। নানারকমের ওষুধ, গন্ধদ্রব্য,—এদের পরীক্ষা নিরীক্ষার ভারও জৈব রাসায়নিকের হাতে। জৈব রসায়নের পরিধি আজ ব্যাপক।

জৈব রসায়নে পদার্থের গঠনবিধি পরীক্ষা করা বিজ্ঞানীদের একটা বিশেষ কাজ। কোন কম্পাউণ্ডের একটি মলিকিউলের মধ্যে আলাদা জাতের যে সব অ্যাটম আছে সেগুলি কে কিভাবে রয়েছে, কোথায় রয়েছে—এ সব পরীক্ষা করা জৈব রসায়নে খুবই প্রয়োজন। চেন এবং রিং কম্পাউণ্ডের কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

প্যারাফিন

ল্যাটিন কথা 'প্যারাম অ্যাফিনিস' থেকে প্যারাফিন কথাটি এসেছে। কথাটির মানে হল, 'সামান্য আকর্ষণ আছে'। জৈব রসায়নে প্যারাফিন্‌স্ শব্দটি দিয়ে অনেকটা একই ধরনের অনেকগুলো যৌগিক পদার্থ বোঝায়। এদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় মিথেনের। মিথেন বা এই জাতের অন্যান্য যৌগিক পদার্থদের অন্য একটি নামও আছে। নামটি হল 'হাইড্রোকার্বন'। এদের মধ্যে শুধু হাইড্রোজেন আর কার্বন আছে বলেই এ নাম।

মিথেন একটি গ্যাস। মার্শ গ্যাস নামেও পরিচিত মিথেন। পচা ডোবা প্রভৃতিতে মিথেন জন্মায়। ডোবার জলে শেওলা বা অন্যান্য গাছের পাতা পচেই মিথেনের সৃষ্টি হয়। বায়ুর ভিতরকার অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলেই মার্শ গ্যাস জ্বলে ওঠে। বর্ষাকালে বিলের জলে মেছো-ভূতের আগুন যে আসলে মার্শ গ্যাস, তা হয়ত তোমাদের কারো-কারো জানা আছে। কয়লাখনির দুর্ঘটনার কারণ অনেক সময় মার্শ গ্যাস। মিথেনের নানা ব্যবহারের মধ্যে মিথাইল অ্যালকোহল এবং ফরমালডিহাইড তৈরি অন্যতম।

প্যারাফিন দলের দ্বিতীয় যৌগিকটির নাম ইথেন ; তৃতীয়টির নাম প্রোপেন ; তার পরেরটি হল বিউটেন। এমনি আরও অনেক যৌগিক পদার্থ রয়েছে এ দলে।

প্যারাফিন শ্রেণীর হাইড্রোকার্বনদের পাওয়া যায় প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পেট্রোলিয়ামে। বিশুদ্ধ অবস্থায় যে-কোন হাইড্রোকার্বন গন্ধহীন এবং রঙহীন। সহজেই এতে আগুন ধরে যায়। মোটর গাড়িতে গ্যাসোলিন ব্যবহার করা হয়। গ্যাসোলিনও বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ ছাড়া আর কিছু নয়।

আর কয়েক শ্রেণীর হাইড্রোকার্বন আছে যাদের নাম আনস্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন। এদের মধ্যে ইথিলিন এবং অ্যাসিটিলিনের নাম করা যেতে পারে। ইথিলিনের ব্যবহার রয়েছে অচেতন করা এবং কৃত্রিম উপায়ে ফল পাকানোর কাজে। তাছাড়া এক ধরনের প্ল্যাস্টিক তৈরি করতেও ইথিলিন লাগে। পলিথিন কাগজের নাম তোমরা শুনে থাকবে। এ বানানো হয় পলিথিন দিয়েই।

রাস্তার ছোট-ছোট দোকানে গ্যাসের বাতি জ্বালানো তোমরা দেখে থাকবে। একটা পাত্র, পাত্রের উপরে একটা নল, নলের মাথায় একটা চাবি—এই-ই হল বাতির সাজসরঞ্জাম। পাত্রটির ঢাকনা খুলে কিছু রাসায়নিক মশলা রেখে তার উপর জল ঢেলে দিতে হয়। ঢাকনা বন্ধ করে নলের উপরদিককার চাবিটি খুলে দেশলাই দিয়ে ধরিয়ে দিলেই নলের মাথায় আসা গ্যাসটি জ্বলতে থাকে। এই গ্যাসটি হল অ্যাসিটিলিন। পাত্রের মধ্যে যে রাসায়নিক মশলাটি দেওয়া হয় তার নাম ক্যালসিয়াম কারবাইড। ক্যালসিয়াম কারবাইডের উপর জল মেশালেই অ্যাসিটিলিন তৈরি হয়। এ ছাড়া ঝালাই-এর কাজেও অ্যাসিটিলিনের ব্যবহার প্রচুর।

প্যারাফিনের সঙ্গে ক্লোরিন, ব্রোমিন প্রভৃতির রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটলে আমরা পাই মিথাইল ক্লোরাইড, মিথাইল ব্রোমাইড, ইথাইল ক্লোরাইড, ইথাইল ব্রোমাইড প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ।

এদেরও ব্যবহার আছে নানা কাজে। মিথাইল ক্লোরাইড ব্যবহার করা হয় রিফ্রিজারেটরে। ইথাইল ক্লোরাইড এবং ইথাইল ব্রোমাইড ব্যবহার করা হয় অস্ত্রোপচারের আগে রোগীদের অচেতন করার কাজে।

অ্যাল্‌কোহল, এস্টার প্রভৃতি

নানা ধরনের অ্যাল্‌কোহলের নাম তোমাদের অজানা থাকবার কথা নয়। স্পিরিট, নানা জাতের মদ, গ্লিসারিন প্রভৃতির নাম তোমরা জান। এগুলো আসলে নানা জাতের অ্যাল্‌কোহল ছাড়া আর কিছুই নয়। স্পিরিট হল বেশির ভাগ ইথাইল অ্যাল্‌কোহল, সঙ্গে সামান্য মিথাইল অ্যাল্‌কোহল মেশানো। মিথাইল অ্যাল্‌কোহল বিষাক্ত জিনিস। মদ জিনিসটা হল ইথাইল অ্যাল্‌কোহল। ইথাইল অ্যাল্‌কোহলের সঙ্গে অল্প পরিমাণে বিষাক্ত জিনিস মিথাইল অ্যাল্‌কোহল মিশিয়ে দিয়েই তৈরি হয় স্পিরিট বা মিথিলেটেড স্পিরিট। ইথাইল এবং মিথাইল অ্যাল্‌কোহলের ব্যবহার যে কত কাজে রয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না।

ইথাইল বা মিথাইল অ্যাল্‌কোহলকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় মোনো-হাইড্রিক অ্যাল্‌কোহল। আর-এক জাতের অ্যাল্‌কোহল আছে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে ডাই-হাইড্রিক অ্যাল্‌কোহল। এ দলের মধ্যে ইথিলিন গ্লাইকলের ব্যবহার আছে নানা কাজে। তৃতীয় আর-এক জাতের অ্যাল্‌কোহলের নাম ট্রাই-হাইড্রিক অ্যাল্‌কোহল। এ জাতের একটি বিশিষ্ট সদস্য হল গ্লিসারিন। শীতের দিনে ঠোঁট ফেটেছে, তোমরা লাগাও গ্লিসারিন। এ ছাড়া নাইট্রো-গ্লিসারিন এবং ডিনামাইট বানাতে গ্লিসারিনের ব্যবহার রয়েছে প্রচুর।

অন্য-এক শ্রেণীর জৈব কম্পাউণ্ডের নাম অ্যাল্‌ডিহাইড, অন্য আর এক শ্রেণীর নাম কিটোন। এদের ব্যবহার আছে নানা কাজে।

জৈব অ্যাসিডের সঙ্গে অ্যাল্‌কোহলের রাসায়নিক মিলন ঘটলে

যে-সব পদার্থ পাওয়া যায় তাদের নাম এস্টার। নানা ধরনের এস্টার নানা কাজে লাগে।

গন্ধযুক্ত হাইড্রোকার্বন

এবারে আমরা আর-এক শ্রেণীর জৈব যৌগিক বা অরগ্যানিক কম্পাউণ্ডের কথা বলব যাদের রাসায়নিক নাম অ্যারোম্যাটিক হাইড্রো-কার্বন। কয়লা পোড়াতে গেলে যে আলকাতরা পাওয়া যায় তা থেকেই এ সব তৈরি হয়। তাছাড়া এদের রয়েছে নানা ধরনের গন্ধ বা অ্যারোমা। বিশেষ বিশেষ গন্ধ থেকেই এ-জাতীয় হাইড্রো-কার্বনের নাম দেওয়া হয়েছে অ্যারোম্যাটিক। আগে আমরা যে-সব হাইড্রো-কার্বনের কথা বলেছি তাদের অধিকাংশেরই কোন গন্ধ নেই।

আমরা আগেই বলেছি যে, জৈব যৌগিকদের সম্বন্ধে জানতে হলে তাদের গঠনবিধি সম্বন্ধেও জানা বিশেষ দরকার। তাছাড়া চেন এবং রিং কম্পাউণ্ডের কথাও আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কার্বন পরমাণুর সঙ্গে কার্বন বা অন্য কোন পরমাণু যুক্ত হয়ে শেকলের চেহারার যে সব কম্পাউণ্ড তাদেরই বলা হয় চেন কম্পাউণ্ড। আর পরমাণুতে পরমাণুতে মিলন ঘটে তা যদি আংটির আকার পায় তবে তা হয় রিং কম্পাউণ্ড। আমরা প্যারাফিন বা অন্যান্য যে-সব যৌগিকের কথা বলেছি তার অধিকাংশই চেন কম্পাউণ্ড। কিন্তু অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বনরা সবই রিং কম্পাউণ্ড।

অ্যারোম্যাটিক কম্পাউণ্ডদের মধ্যে সবচেয়ে প্রথমে বলতে হয় বেন্‌জিনের কথা। বেন্‌জিনের একটি অণুর মধ্যে ছটি হাইড্রোজেন এবং ছটি কার্বন পরমাণু রয়েছে। বেন্‌জিনের গঠনবিধি পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল যে, বেন্‌জিনকে ঠিক চেন কম্পাউণ্ডের মত সাজানো যায় না কোনক্রমেই। এর চেহারার গঠন নিয়ে নানা

গবেষণার পর আবিষ্কৃত হল আংটির চেহারা। এটি আবিষ্কার করেছেন ফেডরিক কেকুলে। এ সম্বন্ধে ভারি মজার একটি গল্প আছে।

১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের কথা। তখন শরৎকাল। জার্মান রসায়নবিদ



কেকুলে ক-দিন ধরেই বেন্‌জিনের গঠনরীতি নিয়ে ভেবে চলেছেন। কিন্তু ব্যাপারটার কোন কূল কিনারা করতে পারছেন না।

সেদিন সন্ধেবেলা বাড়ি বসে বিশ্রাম করছেন কেকুলে। সমস্ত দিন গবেষণাগারে অসম্ভব খাটুনি গেছে, বড় ক্লান্ত। বসে থেকে থেকে একটুখানি ঘুমের মত যেন এসেছে তাঁর চোখে। আধা ঘুমের মধ্যে তিনি এক স্বপ্ন দেখলেন। ভারি অদ্ভুত স্বপ্ন।

মনে হল, অনেকগুলো পরমাণু তাঁর সামনে হাজির হয়েছে। তারা যেমন খুশি ছুটোছুটি করছে, ধাক্কাধাক্কি করছে। কখনো বা বেঁকে যাচ্ছে, কখনো বা একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। তার পর আবার সাপের মত বেঁকে-বেঁকে নাচতে শুরু করছে। হঠাৎ পরমাণুগুলো একের সঙ্গে অন্যে একত্রিত হয়ে বেশ লম্বা একটা

সাপের মত তৈরি হল। তারপর সেটা নাচতে নাচতে গোলাকার হল। একসময় সেটা নিজের লেজ নিজেই গিলতে শুরু করল।

কেকুলের ঘুম ভেঙে গেল। শত চেষ্টা করেও যা মাথায় আসে নি এতদিন, মুহূর্তমধ্যে তার কিনারা করতে সমর্থ হলেন কেকুলে। আবিষ্কৃত হল বেন্‌জিনের চেহারার গঠনরীতি। আজ আমরা জানি, ষড়্‌ভুজ ক্ষেত্রের বাহুগুলির সংযোগ-বিন্দুতে ছটি কার্বন পরমাণু অবস্থিত থেকেই বেন্‌জিনের গঠন হয়েছে। কিন্তু একটি শরৎ-সন্ধ্যার একটি স্বপ্ন থেকেই যে এর সৃষ্টি, তা হয়ত তোমাদের অনেকের জানা নেই।

বেন্‌জিন শ্রেণীর বহু হাইড্রোকার্বনই নানা কাজে লাগে। বেন্‌জিনের ঠিক পরবর্তী যৌগিকটির নাম টলুইন। এর সাহায্যেই তৈরি হয় ট্রাই-নাইট্রো-টলুইন। এক কথায় একে বলা হয় টি. এন. টি.। এটি একটি নাম-করা বিস্ফোরক।

আমাদের খাবার-দাবারের মধ্যে থাকে প্রোটিন, চর্বি আর শর্করা। এ সবই হল জৈব রাসায়নিক পদার্থ। বলতে কি, এ তিনটি বিষয় দিয়ে রসায়নবিদ্যার তিনটি আলাদা বিভাগই গড়ে উঠেছে। এর যে-কোন একটি বিষয় নিয়ে বলতে গেলে তা এক আলাদা মহাভারত হয়ে উঠবে। শুনলে অবাক হবে যে, যে চিনি আমরা নিত্য খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি আর তুলোর যে কাপড়-জামা ব্যবহার করি প্রতিদিন তা একই জাতের রাসায়নিক পদার্থ, অর্থাৎ কিনা কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা-জাতীয় পদার্থ।

রসায়নবিদ্যার বহু বিস্ময়ই আমাদের মুগ্ধ করে। এক কথায় আমরা বলতে পারি, রসায়ন ছাড়া বর্তমান মানব-সভ্যতা অচল!

বিজ্ঞানসাধকের অতন্দ্র সাধনা, তাঁদের
সত্যসন্ধিৎসা যেমন অনবচ্ছিন্ন, মহাবিশ্বের
দিকে দিকে তাঁদের নিত্য নতুন
অভিযান তেমনি রোমাঞ্চকর, তেমনি
চমকপ্রদ। কৃষ্ণবিহারী পাল-সম্পাদিত
এই-গ্রন্থে বিজ্ঞানের
সেই সব অভিযানের বিস্ময়াবহ
কাহিনী, আবিষ্কারের কৌতূহল-ভরা
কথা তুলে ধরা হয়েছে
অতি সহজ সরলভাবে। বিষয়ের
বর্ণনায়, ভাষার সুকুমার
উপস্থাপনে এবং ব্যাপ্তিশীল
রস-রীতির পরিচয়ে এ-গ্রন্থ এক
উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকার্য। কিশোর পাঠকদের
কাছে এ এক আদরণীয় সম্পদ।